বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর।

ওড়িশা প্রাথমিক শিক্ষা কার্য্যক্রম প্রাধিকরণ
ভুবনেশ্বর

বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণী

সম্পাদকমণ্ডলী:

ডঃ বসন্ত কুমার চৌধুরী
ডঃ সুসন্ধ্যা মহান্তি
শ্রী নীলমাধব পরিছা
শ্রী ফকির চরণ স্বাইঁ
শ্রী কিশোর চন্দ্র মাহান্তি
ডঃ আশুতোষ বল

অনুবাদক মণ্ডলী:

প্রফেসর দীপাস্য কুণ্ডু
শ্রীমতী সুচিত্রা দাস (অনুবাদক)
শ্রীমতী মধুমিতা ব্যানার্জ্জী (সমীক্ষক)

সংযোজনা:

ডঃ সবিতা সাহু

সমীক্ষকমণ্ডলী:

প্রফেসর জীবনকৃষ্ণ মহাপাত্র
ডঃ হরিহর ত্রিপাঠী
প্রফেসর বিজয় কুমার পরিডা
ডঃ অনিমেষ মহাপাত্র
শ্রীমতী রীনা মহাপাত্র
ডঃ বালকৃষ্ণ প্রহরাজ

সংযোজনা:

ডঃ প্রীতিলতা জেনা
ডঃ তিলোত্তমা সেনাপতি
ডঃ সবিতা সাহু

প্রকাশক: বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা

মুদ্রণ বছর: ২০২২

প্রস্তুতি: শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর
ও
ওড়িশা রাজ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন সংস্থা, ভুবনেশ্বর

মুদ্রণ: পাঠ্যপুস্তক উৎপাদক ও সরকার বিক্রয়, ভুবনেশ্বর

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমারা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মত্‌প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতার; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহন করে, আমাদের গণপরিষদ। আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্‌দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

সূচিপত্র

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	পদার্থ	০১
দ্বিতীয়	ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন	১৯
তৃতীয়	অম্ল, ক্ষার ও লবণ	৩০
চতুর্থ	তন্তু থেকে বস্ত্র	৩৯
পঞ্চম	পোষণ	৪৯
ষষ্ঠ	তাপ ও তাপ সঞ্চারণ	৬৯
সপ্তম	আবহাওয়া, জলবায়ু ও উপযোজন	৯০
অষ্টম	মাটি (মৃত্তিকা)	১০৫
নবম	জীবনের জন্য শ্বাসক্রিয়া, প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বসন	১১৭
দশম	উদ্ভিদের বংশ বিস্তার	১২৮
একাদশ	গতি ও সময়	১৩৮
দ্বাদশ	বিদ্যুৎ স্রোত	১৫৬
ত্রয়োদশ	কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী	১৬৮
চতুর্দশ	আলোক	১৭৮
পঞ্চদশ	জল - অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ	১৯১
ষোড়শ	জঙ্গল সম্পদ	২০৪
সপ্তদশ	আবর্জনা পরিচালনা	২১২

প্রথম অধ্যায়

পদার্থ

১.১ প্রাকৃতিক পদার্থ ও মনুষ্যকৃত পদার্থ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চতুর্পার্শ্বে আমরা অনেক পদার্থ দেখি। সেগুলির উপাদেয়তা তথা আবশ্যকতা অনুযায়ী আমরা তার মধ্যে থেকে কতকগুলো ব্যবহার করি। জল, কাঠ, কয়লা, খনিজ পদার্থ, মৃত্তিকা ইত্যাদি। উপাদেয় প্রাকৃতিক পদার্থের উদাহরণ এক অদৃশ্য কিন্তু অতি উপাদেয় আবশ্যকীয় প্রাকৃতিক হচ্ছে বায়ু। আমরা সবসময়ে বায়ুর সংস্পর্শে আসি। বায়ু বিনা জীবন অসম্ভব। এসব ছাড়া অনেক পদার্থ আছে যা মনুষ্যকৃত। আমরা ব্যবহার করা কাপড়, আসবাবপত্র, বাসনকোসন, খাদ্য ও পানীয়, জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া সার ও কীটনাশক, প্লাস্টিক নির্মিত পদার্থ, বিভিন্ন যানবাহন ইত্যাদি মনুষ্যকৃত পদার্থ।

মনে রেখো:

যে বায়ু আমরা সেবন করি, যে খাদ্য আমরা খাই, যে গৃহে বাস করি, এসবের সঙ্গে আমাদের চতুর্পার্শ্বস্থ বস্তুকে পদার্থ বলা হয়। সেগুলির মধ্যে কতক প্রাকৃতিক ও অন্য কতক মনুষ্যকৃত।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.১

তোমরা ব্যবহার করা ও ঘরের বাইরে দেখা দশটি পদার্থের তালিকা করো। সেগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি প্রাকৃতিক ও কোন্‌গুলি মনুষ্যকৃত কাজ? নিম্ন সারণীটি তোমার খাতায় তৈরি করে পূরণ করো। শ্রেণীশিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে আবশ্যক স্থলে সংশোধন করো।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত পদার্থ	
প্রাকৃতিক পদার্থ	মনুষ্যকৃত পদার্থ
কাঠ	টেবিল
মাটি	ইট
______	______
______	______
______	______
______	______
______	______

১.২ পদার্থের গুণ

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.২

(ক) একটা পাথরখণ্ড নিয়ে দেখো, তা ভারী লাগছে কি? একটা কাচের গ্লাসে জল নিয়ে, গ্লাসের বাইরের দিকে একটা দাগ দিয়ে ভেতরের থাকা জলের উপরের স্তর চিহ্নিত করো। পাথরখণ্ডটি ধীরে ধীরে গ্লাসের ভেতরে থাকা জলে ডুবিয়ে দাও। গ্লাসের ভেতরে থাকা জলের স্তর পরিবর্তন হল কি? জল স্তরের যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে কেন এমন হল চিন্তা করো।

(খ) বিভিন্ন আকৃতির তিন-চারটি কাচের বোতল সংগ্রহ করো। প্রত্যেক বোতলে এক গ্লাস জল ভর্তি করো। বিভিন্ন বোতলের জলের আকৃতি লক্ষ করো। একই পরিমাণ জল বিভিন্ন বোতলে থাকার বেলায় সেই জলের আকৃতি এক রকম কি?

মনে রাখো:
ক-তে ব্যবহৃত পাথরখণ্ডের একটা নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। কিন্তু খ-তে ব্যবহৃত জলের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই।

প্রশ্ন ১:
ধূপকাঠি থেকে বের হওয়া ধোঁয়া, বায়ু, জেট প্লেন থেকে বেরোনো ধোঁয়ার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আছে কি? এর থেকে তোমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?

(গ) ওপরে খ-তে ব্যবহৃত হয়ে থাকা যে কোনো একটা খালি বোতলের ওজন নির্ণয় করো। এর জন্যে তোমরা স্কুলে থাকা স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করতে পারো। তারপর সেই বোতলে জল ঢুকিয়ে ওজন করো। এই দুটি ওজনের মধ্যে থাকা পার্থক্য বের করো। এর দ্বারা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?

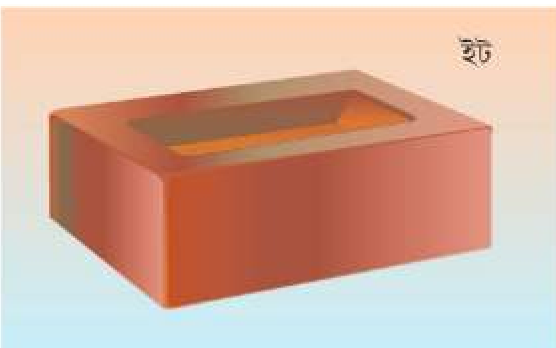

চিত্র ১.১

ইট একটি কঠিন পদার্থ। এর নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন আছে।

চিত্র ১.২

ফলের রস একটা তরল পদার্থ। এর নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কিন্তু আকৃতি নেই।

চিত্র ১.৩

বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এর নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন থাকে না।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.৩

একটা বেলুন ও একটা সরুসুতো নিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করো বায়ুর যে ওজন আছে। আবশ্যক হলে শিক্ষকের সাহায্য নাও। বেলুনের আকৃতি অনুযায়ী বায়ুর বিভিন্ন আকৃতি হয়ে থাকে।

ওপরের পরীক্ষণগুলিতে ব্যবহৃত হওয়া পাথরখণ্ড, জল ও গ্লাস, বেলুন ও বেলুনের ভেতরে থাকা বায়ু প্রত্যেকটি পদার্থ। কারণ এগুলির ওজন, আয়তন ও আকার আছে। বায়ুকে আমরা দেখতে না পেলেও ইহা একটি পদার্থ। বায়ুর সংস্পর্শে এসে আমরা এর উপস্থিতি জানতে পারি।

প্রশ্ন ২:

তাপ, আলো, অঙ্গার, মোবাইল ফোন ও শব্দ পদার্থ কী? এদের মধ্যে পদার্থগুলিকে বাছো। তোমার উত্তরের সপক্ষে যথাযথ কারণ দর্শাও।

প্রশ্ন ৩:

কাছ থেকেও দেখা যায় না, ধরতে গেলে ধরা দেয় না, রাগলে সে সব ভেঙে দেয়। বলো তো বাচ্চারা, সে কে?

১.৩ পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.৪

একটা কাচের গ্লাসে একটুকরো বরফ রাখো। কিছু সময় পর বরফখণ্ডর কী পরিবর্তন হল দেখো।

গ্লাসে এখন জমা হওয়া তরল পদার্থ কী হতে পারে? সেই তরল পদার্থকে একটা অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিলের বাটিতে নিয়ে গরম করে দেখো কী হচ্ছে? কিছু সময় পর ওই বাটিটার ওপরে একটা থালা দিয়ে ঢেকে রাখো ও গরম করা বন্ধ করে দাও। বাটি ও থালা ঠান্ডা হওয়ার পর থালাটি বের করে দেখো,তার তলার দিকে কী সব লেগে আছে। এভাবে ঢাকনার তলার দিকে জলবিন্দু জমে যাওয়া অন্য কোথাও দেখেছ? তা তোমার খাতায় লেখো।

বরফখণ্ডের যে পরিবর্তন হল তা তোমরা দেখলে। কঠিন বরফ তরল হয়ে যে পদার্থ উৎপন্ন হল, তা নিশ্চয় জল, কারণ জলের থেকেই বরফ তৈরি হয়ে থাকে। বরফ, জলের কঠিন অবস্থা ও জল বরফের তরল অবস্থা। বাষ্প যখন থালার তলার দিকে লেগে ঠান্ডা হল, তখন আবার জলে পরিণত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে লেগে ছিল। দেখা গেল যে কঠিন বরফ গলে তরল জল হয়, তরল জলকে উত্তপ্ত করলে ইহার গ্যাসীয় অবস্থা, বাষ্পে পরিণত হয়।

বাষ্পকে ঠান্ডা করলে আবার জল পাওয়া যায়, সেই জলকে অধিক ঠান্ডা করলে (ফ্রিজের ভেতর রেখে) কী হয় দেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.৫

একটা মোমের খণ্ডকে নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিলের বাটিতে নিয়ে গরম করে দেখো। এই প্রক্রিয়ায় ঘটতে থাকা পরিবর্তনকে লিখে রাখো। তোমাদের শ্রেণীর অন্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সঙ্গে পদার্থের এই গুণ বিষয়ে আলোচনা করো।

চিত্র ১.৪

বরফখণ্ড জলের কঠিন অবস্থা

চিত্র ১.৫

গ্লাসে থাকা জল জলের তরল অবস্থা

চিত্র ১.৬

কেটলির থেকে বেরোনো বাষ্প জলের গ্যাসীয় অবস্থা

প্রত্যেক পদার্থের তিনটি অবস্থা আছে। যথা: (ক) কঠিন অবস্থা, (খ) তরল অবস্থা এবং (গ) গ্যাসীয় অবস্থা। পদার্থের একটা অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া, ইহার ভৌতিক পরিবর্তন। এই সময়ে পদার্থের কতক ভৌতিক গুণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। পদার্থের কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ গুণ থাকে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(ক) **পদার্থের কঠিন অবস্থা:** এই অবস্থায় পদার্থের নিজস্ব আকার, আয়তন ও বস্তুত্ব থাকে। একে কোথাও রাখলে কিছু স্থান অধিকার করে রাখে। নিজের মন থেকে কয়েকটি উদাহরণ দাও।

(খ) **পদার্থের তরল অবস্থা:** এই অবস্থায় পদার্থের নিজস্ব আয়তন ও বস্তুত্ব থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে না। যেমন আধলিটার দুধ পলিথিন পাউচে আনার সময়ে এটা সেই পাউচের আকৃতি হয়ে থাকে। আবার ফোটানোর সময় যে পাত্রে ঢালা হয় তখন সেই পাত্রের আকৃতি নেয়। নিজের অনুভূতির থেকে আর কয়েকটা তরল পদার্থের উদাহরণ দাও।

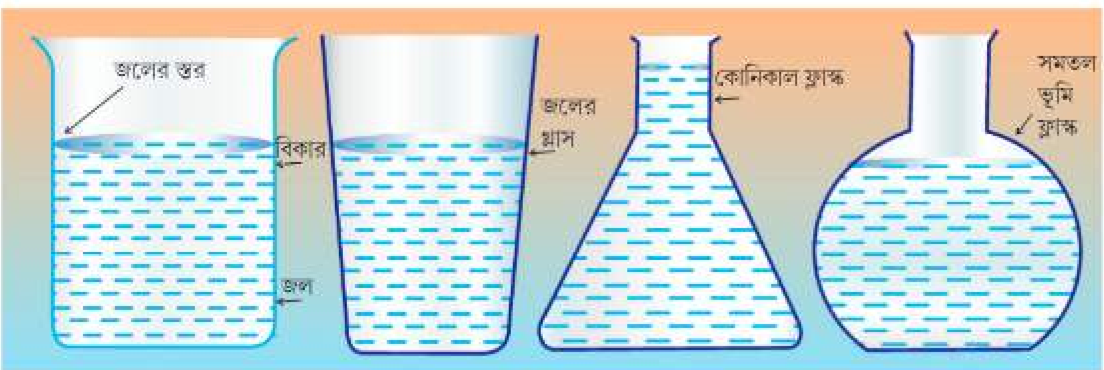

চিত্র ১.৭

এখানে লক্ষ করার কথা যে, তরল পদার্থকে সর্বদা পাত্রের মধ্যে রাখতে হয় এবং সেই তরল পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয়ে থাকে সেই আকৃতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

তোমরা দেখে থাকবে যে ঝরনা পাহাড়ের ওপর থেকে তলায় বয়ে আসে। সেরকম নদীর জলে ওপর স্তর থেকে তলার স্তরে বয়ে আসে। শহরে ছাতের ওপরে থাকা ট্যাঙ্ক থেকে জল তলায় বয়ে এসে কল থেকে জল বের হয়। কারণ পদার্থ তরল অবস্থায় সর্বদা নিম্নগামী। ঘরে বা দোকানের তেল, দুধ, জল ইত্যাদি তরল পদার্থ কীভাবে রাখা হয় লক্ষ করো।

(গ) **পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা:** এই অবস্থায় পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে না। কিন্তু বস্তুত্ব থাকে। সামান্য তাপ চাপের তারতম্য হলে ইহার আয়তনের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে। অম্লযান উদ্‌যান, যবক্ষরযান ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ। তোমরা আর কয়েকটি উদাহরণ মন থেকে লেখো। গ্যাসীয় পদার্থগুলিকে সর্বদা আবদ্ধ পাত্রে রাখা হয়। গ্যাসীয় পদার্থকে যে আবদ্ধ পাত্রে রাখা হয়, তা সেই পাত্রের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। গ্যাসের পরিমাণ কমবেশি বা আবদ্ধ পাত্র ছোট বড় হলেও এই ব্যাপ্তির প্রক্রিয়ায় কোনো পার্থক্য হয় না। একটা খোলা বোতলে জ্বলন্ত ধূপকাঠি ঢুকিয়ে বের করে আনো, বোতলে ছিপি দিয়ে বন্ধ করো। লক্ষ করলে দেখবে, ধূপকাঠির ধোঁয়া অল্প সময়ের মধ্যে পুরো বোতলটিতে ছড়িয়ে যাবে। এখন বলো দেখি ছিপিটিকে খুলে দিলে কী হবে?

জানা দরকার:

ডাক্তারখানায় ইস্পাত ট্যাঙ্কের মধ্যে থাকা গ্যাস যখন উচ্চ চাপযুক্ত হয়ে থাকে, তখন তা তরল অবস্থায় থাকে। রেগুলেটরের সাহায্যে যখন ট্যাঙ্কির মুখ খোলা হয়, তা বায়ুমণ্ডলের চাপ পেয়ে আবার গ্যাসীয় অবস্থায় এসে যায়।

বায়ুমণ্ডলে থাকা অম্লজান গ্যাসীয় অবস্থাতেই থাকে। কারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ও চাপে ইহা একটি গ্যাসীয় পদার্থ।

তোমাদের জন্যে কাজ:

বিভিন্ন আকৃতির তিনটে ছোটবড় কাচের বোতল নাও এবং ছোট কাপে জল নিয়ে সেই বোতলগুলিতে ঢালো। জলের পরিমাণ সমান হলেও বোতলের আকৃতি ও অবস্থা অনুযায়ী, তিনটি বোতলের জলের আকৃতি তিনরকম দেখা যাবে। এটা বড় বোতলে কম অংশে থেকে যেতে পারছে। কিন্তু ছোট বোতলে বেশি অংশ অধিকার করছে।

সেই বোতলগুলি থেকে জল বার করে নাও। একটা করে সেফটিপিন উপরোক্ত প্রত্যেক জলের বোতলে (একটার পর অন্যটিতে) ফেলে দেখো। সেফটিপিনের আকার, আকৃতি ও আয়তনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। তিনটি বোতলের আকার ও আকৃতির দ্বারা সেফটিপিন প্রভাবিত হচ্ছে না।

বোতলের ভেতর থেকে সেফটিপিন বের করে দাও। দু-তিনটে ধূপকাঠিকে এক এক করে জ্বালিয়ে সেখান থেকে বেরোনো ধোঁয়া উপরোক্ত তিনটি বোতলের ভেতরে এক মিনিটের জন্যে রেখে ছিপি বন্ধ করে দাও। বোতলের ভেতর ধোঁয়া কীভাবে থাকছে লক্ষ করো।

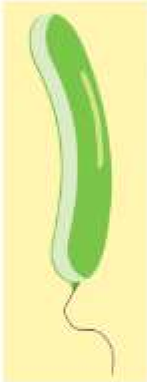

চিত্র লম্বা বেলুন

চিত্র গোল বেলুন

চিত্র ১.৮

গ্যাসীয় পদার্থ যেখানে রাখবে তা সম্পূর্ণ স্থানে ছড়িয়ে যায়।

ধোঁয়া যে বোতলে থাকছে, সেই বোতলে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে ও সেই বোতলের আকৃতি ধারণ করছে। ছিপি খুলে দিলে বোতল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওপরের পরীক্ষায় সেফটিপিন, জল ও ধূপের ধোঁয়াকে তোমরা গরম করোনি কি ঠান্ডা করোনি। তাই উপরোক্ত কার্য করার সময়ে এই পদার্থগুলির তাপমাত্রা অপরিবর্তিত আছে।

এই পরীক্ষাগুলি থেকে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার কয়েকটি গুণ আমরা জানতে পারলাম। সেগুলি হল:

- স্থির তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের (এখানে সেফটিপিন) আকার, আকৃতি ও আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না।
- স্থির তাপমাত্রায় তরল পদার্থের (এখানে জল) আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ইহার আকার ও আকৃতি ধারক পাত্রের (এখানে বোতল) আকৃতি অনুযায়ী বদলে যায়।
- স্থির তাপমাত্রায় তরল পদার্থের (এখানে জল) আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ইহার আকার ও আকৃতি ধারক পাত্রের (এখানে বোতল) আকৃতি অনুযায়ী বদলে যায়।
- তরল পদার্থ রাখার জন্যে একটা পাত্রের আবশ্যক হয়ে থাকে, তা খোলা বা আবদ্ধ হতে পারে, নচেৎ উর্ধ্বের থেকে নিম্নে বয়ে যায়।
- গ্যাসীয় পদার্থকে সর্বদা আবদ্ধ পাত্রে রাখতে হয়। নচেৎ এই গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

১.৪ পদার্থের তিনটি সাধারণ অবস্থার অন্তঃরূপান্তকরণ (Inter-Convesion)

পদার্থের অন্তঃরূপান্তকরণের বিষয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ানো হয়েছে। তাপের প্রয়োগে কঠিন ও তরল পদার্থ রূপান্তরিত হয়। তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করলে গ্যাসীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয়।

গ্যাসীয় পদার্থকে ঠান্ডা করলে তা তরল অবস্থায় এসে যায়। তরল পদার্থকে ঠান্ডা করলে তা পুনরায় কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে।

পদার্থের এই তিনটি অবস্থার একটির থেকে অন্যটিতে হওয়া পরিবর্তনকে অন্তঃরূপান্তকরণ বলা হয়।

কঠিন পদার্থ	তাপ প্রয়োগ → ← শীতলীকরণ	তরল পদার্থ	তাপ প্রয়োগ → ← শীতলীকরণ	গ্যাসীয় পদার্থ

জানলে ভালো:

রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানার ব্লাস্ট ফারনেস থেকে যখন লোহা বেরোয় তা তরল অবস্থাতেই থাকে।

তাপমাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী পদার্থের তিনটি অবস্থার অন্তঃ-রূপান্তর বিষয়ে জানলে। যে তাপমাত্রায় বরফ গলে জলে পরিনত হয় তাকে জলের গলনাঙ্ক (melting popint) বলা হয়। এই প্রকৃয়াকে **গলন** (melting) বলা হয়। যে তাপমাত্রায় জলকে ঠাণ্ডা করে বরফে পরিনত করা যায় সেই তাপমাত্রাকে জলের হিমাঙ্ক (freezing popint) বলা হয়। এই প্রকৃয়াকে **ঘনীভূত বা হিমায়িত** বলা হয়। যে তাপমাত্রাতে জল ফুটে বাষ্পে (steam) পরিনত হয় তাকে জলের **স্ফুটনাঙ্ক** (boiling popint) বলা হয়। এই প্রকৃয়াকে **স্ফুটন** বলা হয়।

মনে রাখো:

জলকে উত্তপ্ত করে তাপমাত্রা (১০০ ডিগ্রি সে.) স্ফুটনাঙ্ক করলে স্ফুটন ঘটে জল গ্যাসীয় অবস্থা (বাষ্প) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জলের তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্ক না পৌঁছলেও সাধারণ তাপমাত্রা ইহা গ্যাসীয় অবস্থা (জলীয় বাষ্প) প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বাষ্পীকরণ বলা হয়। উভয় ও বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায় জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ নিজে নিজের গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৪:

গন্ধকর্পূর, আয়োডিন দানা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, লবণ ইত্যাদি কঠিন পদার্থকে নিয়ে কিছু সময় উত্তপ্ত করলে কী হবে?

তোমার অনুমানের মতামত পরীক্ষা করে দেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.৭

কিছু ন্যাপথলিন বল (গন্ধকর্পূর) সংগ্রহ করো। সেগুলিকে গুঁড়ো করে একটা স্টিলের বাটিতে নাও। তার মুখটিকে বন্ধ করার মতো একটা ফানেল নাও। ফানেলের সাহায্যে ন্যাপথলিনের গুঁড়োগুলিকে ঢেকে দাও (চিত্র ১.৯ দেখো)। কিছু তুলোকে অল্প জলে ভিজিয়ে ফানেলের বাইরের দিকে ছুঁইয়ে দাও। এর দ্বারা ফানেলের ভেতরে উৎপন্ন হওয়া পদার্থ ঠান্ডা হয়ে যাবে। স্টিলের বাটিটিতে কিছু সময় অল্প গরম করে ছেড়ে দাও। গরম করার সময় ফানেলের মধ্যে দিয়ে বাটির ভেতরে লক্ষ করো। কঠিন ন্যাপথলিনের গুঁড়ো গলে যাচ্ছে কি? বাটিটি ঠান্ডা হওয়ার পর ফানেলটি উঠিয়ে এনে দেখো, ফানেলে কিছু লেগেছে? তা তরল না কঠিন পদার্থ? বাটির মধ্যে কোনো তরল পদার্থ আছে কি?

চিত্র ১.৯ উর্ধ্বপাতন

কঠিন ন্যাপথলিনের গুঁড়োকে উত্তপ্ত করার ফলে তা তরল হয়নি। ফানেলের ভেতরের দিকে কোনো তরল পদার্থের ফোঁটা লেগে ছিল না। সেই স্থানে একটা কঠিন পদার্থের আস্তরণ লেগে আছে। এটাকে শুঁকলে জানতে পারবে যে এটা কোনো নতুন পদার্থ নয়। তা ন্যাপথলিন বাষ্প ঠান্ডা হয়ে, তার কঠিন অবস্থায় এক আস্তরণ মাত্র। এই প্রক্রিয়াকে পদার্থের উর্ধ্বপাতন বলা হয়।

যদি পারো ন্যাপথলিনের বদলে আয়োডিন বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে উপরোক্ত পরীক্ষাটি করে দেখো।

এমন কিছু কঠিন পদার্থ আছে, যা উত্তপ্ত করলে, তা তরল পদার্থে পরিণত না হয়ে সোজা গ্যাসীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং ঠান্ডা হয়ে, তাদের গ্যাসীয় অবস্থা তরল অবস্থায় না এসে কঠিন অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, এরকম কঠিন পদার্থগুলি এক স্বতন্ত্র ধরনের কঠিন পদার্থ এবং এগুলিকে উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ বলা হয়।

মনে রাখো:

গলন, স্ফুটন, বাষ্পীকরণ, ঘনীকরণের মতো উর্ধ্বপাতনও একটা ভৌতিক পরিবর্তন।

চিত্র: ১:১০ পদার্থের তিন সাধারণ অবস্থার অন্তঃরূপান্তকরণ

ভিন্ন প্রকারের কঠিন পদার্থ:

ছেঁড়া কাগজ, কাঠের ছাল, ছেঁড়া কাপড়, চিনি ইত্যাদি পদার্থকে পরীক্ষা নলে নিয়ে উত্তপ্ত করলে তা তরল না হয়ে পুড়ে গিয়ে অঙ্গার বা কয়লা হয়ে যায়। এই পদার্থগুলির অভ্যন্তরীণ উৎপাদনগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার জন্যে তরল না হয়ে দহিত হয়ে থাকে। দহন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

১.৫ পদার্থের গঠন:

প্রত্যেক পদার্থ কতকগুলি কণিকায় গঠিত। এই কণিকাগুলির মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণবল থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট পদার্থের তিন অবস্থায় কণিকাগুলির মধ্যে থাকা এই আকর্ষণবলের পরিমাণ সমান নয়।

পদার্থের কণিকাগুলির মধ্যে কিছু শূন্যস্থান থাকে। এবং কণিকাগুলি নির্দিষ্টরূপে সজ্জিত হয়ে থাকে। যেহেতু পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় তার কণিকার মধ্যে থাকা আকর্ষণবল ভিন্ন ভিন্ন, তাই শূন্যস্থানের পরিমাণ ও সেগুলির সজ্জা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

কণিকাগুলির মধ্যে থাকা শূন্যস্থানের পরিমাণ, আকর্ষণবল ও কণিকাগুলির সজ্জাশৈলী (ঞ্ঝথঙ্ঠত্রন্দ্র) পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থাকে নির্ধারণ করে।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.৮

তোমাদের আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখা সেফটিপিন জল ও ছিপি দেওয়া বোতলের মধ্যে থাকা ধূপের ধোঁয়াকে নিয়ে এসো, আর একটি পরীক্ষা করব।

- বোতলের থাকা জলের কিছু অংশ হাতে ধরো। তোমরা লক্ষ করলে এই প্রক্রিয়া সম্ভব।
- ধূপের ধোঁয়ার কিছু অংশ তোমার হাতের মুঠোর ভেতর রাখো। তোমরা লক্ষ করবে সে ধোঁয়া কিছু সময় তোমাদের হাতের মুঠোয় থেকে তারপর তা নির্গত হয়ে যাবে।
- এখন ওপরের দুটো পরীক্ষার মতন, সেফটিপিনের কিছু অংশ আলাদা করে তোমার হাতের মুঠোয় ধরতে পারবে কি ? তুমি জান যে সেফটিপিনের কিছু অংশ আলাদা করতে হলে তোমাকে হয়তো একটি হাতুড়ির সাহায্য নিতে হবে।

প্রশ্ন ৫:

কেবল সেফটিপিনের ক্ষেত্রে তার একটা অংশ আলাদা করার জন্যে, হাতুড়ির সাহায্য কেন নিতে হল, বলো।

এসো আলোচনা করব।

পদার্থের তিন অবস্থার মধ্যে কঠিন অবস্থার পাশাপাশি কণিকাগুলির মধ্যে থাকা শূন্যস্থানের পরিমাণ সবথেকে কম। তাই এই অবস্থায় দুটি কণিকার মধ্যে আকর্ষণবল সব থেকে তীব্র। এই প্রবল আকর্ষণের জন্যে, কঠিন পদার্থের কণিকাগুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে, তাই কঠিন পদার্থের (এখানে সেফটিপিনের)

- আয়তন প্রায়শ স্থির থাকে।
- আকৃতিও স্থির থাকে।
- কিছু অংশ আলাদা করার জন্যে হাতুড়ি বা সেরকম কিছু জিনিস ব্যবহার করতে হয়।

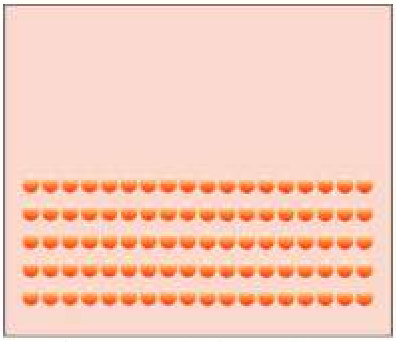

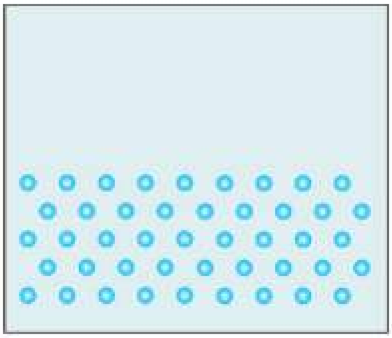

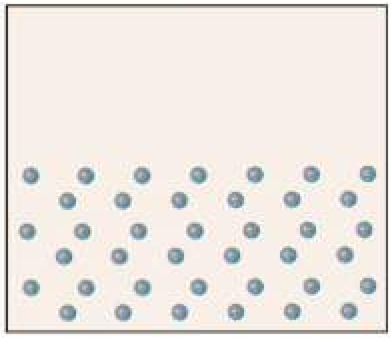

কঠিন পদার্থের কণিকার নিচয়ন　　তরল পদার্থের কণিকার নিচয়ন　　গ্যাসীয় পদার্থের কণিকার নিচয়ন

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে থাকা কণিকাগুলির নিচয়ন (Packing)

চিত্র: ১:১১

কঠিন পদার্থের তুলনায় তরলাবস্থায় পদার্থের (এখানে জল) কণিকাগুলির মধ্যে থাকা গুরুত্ব সামান্য বেশি। তাই তাদের মধ্যে থাকা আকর্ষণবল কম। তার জন্যে:

- জলের কিছু অংশ অঞ্জলির মধ্যে নেওয়া যায়।
- জলের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই এবং ইহা ধারক পাত্রের আকৃতি নিয়ে থাকে।
- জল উর্ধ্ব থেকে নিম্নের দিকে গতি করে।
- জলের কণিকাগুলি প্রায়ত একসাথে থাকে।

গ্যাসীয় পদার্থের (এখানে ধূপের ধোঁয়া) কণিকাগুলির মধ্যে অত্যধিক দূরত্ব হেতু পারস্পরিক আকর্ষণবল খুবই কম হয়ে থাকে। এইজন্যে এই কণিকাগুলি:

- পরস্পরের থেকে মুক্তভাবে থাকে।
- গ্যাসীয় পদার্থ খোলা পাত্রের থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।
- গ্যাসীয় পদার্থকে আবদ্ধ পাত্রে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

১.৬: পদার্থের শ্রেণীবিভাগ:

পদার্থের ভৌতিক অবস্থা, (কঠিন অবস্থা, তরল অবস্থা, গ্যাসীয় অবস্থা) দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পদার্থগুলি তাদের রাসায়নিক সংরচনা (Constitution) বা সংজুতি (Composition) অনুযায়ী **মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্রণ** রূপে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক পদার্থে অনেক সূক্ষ্ম কণিকা থাকার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যে পদার্থগুলিতে কেবল একরকমের কণিকা থাকে, সেগুলিকে বিশুদ্ধ পদার্থ বলা হয়। মৌলিক ও যৌগিক এই দুই প্রকার বিশুদ্ধ পদার্থ, আর কতক পদার্থ আছে, যার মধ্যে একের থেকে অধিক প্রকার কণিকা থাকে। কারণ ইহা এক বা অধিক বিশুদ্ধ পদার্থের মিশ্রণ। এইরকম পদার্থকে মিশ্র পদার্থ বা মিশ্রণ বলা হয়।

তামাদের জন্যে কাজ: ১.৯

তোমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা কয়েকটি পদার্থের তালিকা করো। সেগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি বিশুদ্ধ পদার্থ এবং কোন্‌গুলি মিশ্র পদার্থ বলে ভাবছ, বেছে আলাদা করে একটা সারণীতে সাজাও।

তামার তার, কাঠ, কয়লা কোন্ প্রকারের পদার্থ বলে ভাবছ? সেগুলির সারণীর উপযুক্ত স্থানে লেখো।

প্রশ্ন ৬:

ফিলটারের জল বিশুদ্ধ পদার্থ বলে তোমার উত্তরের যথার্থতা বোঝাও।

সারণীটি শ্রেণীতে তোমরা শিক্ষককে দেখিয়ে আলোচনা করলে নিম্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে।

তামাকে যত ভাবে বিশ্লেষণ করলে ও তামা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না। সেরকম লোহা, সোনা, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, উদ্‌জান, অম্লজান ইত্যাদি পদার্থ থেকে যাকে নিয়ে যত রকম খণ্ড, বিখণ্ড করে এমনকি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলেও কোনো ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায় না। কারণ এমন প্রত্যেক পদার্থ, কেবল একপ্রকার কণিকায় গঠিত হয়ে থাকে। এই পদার্থগুলি যে কোনো ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হলেও তাদের বিশুদ্ধ অবস্থান, এক নির্দিষ্ট পদার্থে থাকা কণিকাগুলি এরকম হয়ে থাকে, অর্থাৎ সোনায় কেবল সোনার কণিকা, অ্যালুমিনিয়ামে কেবল অ্যানুমিনিয়ামের কণিকাই পাওয়া যায়। এইরকম সরলতম বিশুদ্ধ পদার্থকে মৌলিক পদার্থ বলা হয়।

সাধারণ তাপমাত্রায় অঙ্গারক, ফসফরাস, গন্ধক, আয়োডিন, সোনা, রূপা, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, সীসা ইত্যাদি কঠিন মৌলিক। পারদ, ব্রোমিন, তরল মৌলিক এবং উদ্‌জান, অম্লজান, যবক্ষারজান, ক্লোরিন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাসীয় মৌলিকের কতকগুলি উদাহরণ। আজ পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে ৯৮টি মৌলিক প্রাকৃতিক ও অন্যগুলি পরীক্ষাগারে প্রস্তুত, মনুষ্যকৃত। মনুষ্যকৃত মৌলিকগুলি অধিকাংশ ক্ষণস্থায়ী।

(ক) মৌলিকের প্রকারভেদ:

মৌলিকগুলিকে তাদের গুণ অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যথা: ধাতু (Metal), অধাতু (Non-Metal) ও উপধাতু (Metalloid)। এদের মধ্যে ধাতুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.১০

একটুকরো গন্ধক ও একটা তামার তার নাও। গন্ধক টুকরোকে হাতুড়ি দিয়ে মারো। এর দ্বারা গন্ধকের আকারে কী পরিবর্তন লক্ষ করলে? তামার তারটিকে হাতুড়ির সাহায্যে মারো এবং এর আকারে কী প্রকার পরিবর্তন হবে?

তোমরা দেখবে, গন্ধকের টুকরোটি গুঁড়ো হয়ে গেল ও তামার তার চ্যাপটা হয়ে গেল। গন্ধক একটা অধাতু তামা একটা ধাতু। ধাতু থেকে তার ও পাত্র প্রস্তুত করা যেতে পারে। ধাতুর মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। একটা তামা বা অ্যালুমিনিয়াম তারকে ধরে একটা মাথায় গরম করলে কিছু সময় পর আমরা হাতে গরম অনুভব করব। গরম থাকা চামচ খালি হাতে ধরতে পারা যায় না। ধাতুকে গরম করলে সহজে তরল হয় না।

লোহা, দস্তা, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, রূপা, সোনা, তামা, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম ইত্যাদি কঠিন ধাতব মৌলিকের উদাহরণ।

পারদ একটা তরল ধাতব মৌলিক।

অধাতুগুলির মধ্যে অঙ্গারক, গন্ধক, ফসফরাস ইত্যাদি কঠিন অধাতু মৌলিক, উদ্‌জান, অম্লজান, যবক্ষারজান, ক্লোরিন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাসীয় অধাতু মৌলিক।

অল্প কয়েকটি মৌলিক আছে যারা ধাতু ও অধাতু উভয় উভয়ের মতো কাজ করে। কারণ, তাদের সেগুলির কতকগুলি ধাতব গুণ ও কতকগুলি অধাতব গুণ থাকে। এইরকম মৌলিকগুলিকে উপধাতু বলা হয়। আর্সেনিক, অ্যান্টিমণি ইত্যাদি উপধাতু।

প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থকে নিয়ে আমাদের পৃথিবীর ভূত্বক গঠিত হয়েছে। ভূত্বকে কোন্ মৌলিক কত পরিমাণে আছে তা এখানে দেওয়া হয়েছে। ভূত্বকের প্রায় ৯৯ শতাংশ নিম্নোক্ত ১০টি মৌলিককে নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক সজীব বস্তুতে সাধারণত ৪টি মৌলিক অধিক পরিমাণে থাকে। সেগুলি হল: অঙ্গারক, উদ্‌জান, অম্লজান ও যবক্ষারজান।

মৌলিকের নাম		ভূত্বকের শতকরা অংশ
অম্লজান	....	৪৭
সিলিকন	....	২৭
অ্যালুমিনিয়াম	....	০৮
লোহা	....	০৫
কোবাল্ট	....	৩.৫
সোডিয়াম	....	৩.০০
পটাশিয়াম	....	২.৫
ম্যাগনেশিয়াম	....	২.০০
টিটানিয়াম	....	০.৫
উদ্‌জান	....	০.১৬৭
অন্যান্য মৌলিক	....	১.৩৩৩

প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকে। পদার্থের সাধারণ গুণগুলি ছাড়া, প্রত্যেক মৌলিকের নিজের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকে, সেগুলি তোমরা উঁচু ক্লাসে পড়বে।

উদ্‌জান সব থেকে হালকা মৌলিক অম্লজানের একটা বিশেষ ধর্ম হল ইহা অন্যান্য পদার্থের দহনের সহায়ক। উদ্‌জান ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা জলের উৎপত্তি হয়। এখানে জল দহনীয় নয়। জল অন্য পদার্থকে দহনে সাহায্য করে না।

দুই বা ততোধিক মৌলিক নিজে নিজের মধ্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে থাকে। কোন্ মৌলিক অন্য কোন্ মৌলিকের সঙ্গে কোন্ অবস্থায়, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে তা অন্য অধ্যায়ে পড়বে। এভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকা নতুন পদার্থ মূল পদার্থের থেকে ভিন্ন গুণের হয়ে থাকে।

আমাদের জানা কয়েকটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে, তাদের মধ্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে, দেখা যাক কোন্ প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১.১১

দুটি মৌলিক, যথা লোহার গুঁড়ো ও গন্ধকের গুঁড়ো নিয়ে একটা স্টিলের বাটিতে রাখো। একটা চুম্বক এনে এই মিশ্রণটি ছুঁলে, লোহার গুঁড়োগুলি চুম্বকের মধ্যে লেগে যাবে। কারণ গন্ধকের সঙ্গে একটা বাটিতে থেকেও লোহা তার মৌলিক গুণ হারায়নি। গন্ধক চূর্ণ আগের মতোই হলদে দেখাচ্ছে।

স্টিলের বাটিতে লোহার গুঁড়ো ও গন্ধকের গুঁড়ো রেখে গরম করো। কী পরিবর্তন হচ্ছে লক্ষ করো। বাটিতে থাকা মিশ্রণের রং বদলে গেল কি? ঠান্ডা হওয়ার পর চুম্বক এনে এই পদার্থকে ছোঁয়ানোর পর, পূর্বের মতো কিছু আকর্ষিত হয়ে চুম্বকে লেগে থাকল কি?

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে জানা গেল যে, লোহা ও গন্ধক উত্তপ্ত হওয়ার সময় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে এক নতুন পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেগুলি নিজে নিজের বিশিষ্টগুণ হারিয়ে ফেলেছে যে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হল, তা নতুন গুণযুক্ত। এই নতুন পদার্থের নাম ফেরম সালফাইড ও এটা মৌলিক পদার্থ নয়, এটি একটি যৌগিক পদার্থ।

এইরকম অনেক উদাহরণ আছে তোমরা চিন্তা করলে অন্য কয়েকটি পরীক্ষা করে জানতে পারবে।

অঙ্গারকাম্ল, চিনি, নুন, জল, চকখড়ি, গ্লুকোজ, সোডা, ভিনিগার ইত্যাদি মৌলিক নয়। এগুলি একাধিক মৌল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। এদের গুণ মূল মৌল পদার্থের গুণের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইরকম পদার্থগুলিকে যৌগিক যৌগ বলা হয়। মৌলগুলি তাদের নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট ওজনের যৌগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন ৫৬ গ্রাম লোহার গুঁড়ো, ৩২ গ্রাম গন্ধকের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে ৮৮ গ্রাম ফেরস সালফাইড নামক যৌগ পদার্থ উৎপন্ন করে। যৌগগুলিও বিশুদ্ধ পদার্থ। এগুলির কণিকা সমজাতীয়। এ বিষয়ে উচ্চশ্রেণীতে আরো অধিক কথা জানতে পারবে।

প্রশ্ন ৭:

- অঙ্গারকাম্লে কোন্ কোন্ মৌল থাকে।
- ভোলটা মিটার যন্ত্রে জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে কোন্ কোন্ মৌল উৎপন্ন হয়?
- অঙ্গারক, উদ্‌জান ও অম্লজান তিনটি মৌলিক, গ্লুকোজ একটা যৌগিক। এর যথাযথ কারণ লেখো।
- ৮৪ গ্রাম লোহার গুঁড়ো, ৪৮ গ্রাম গন্ধকের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ ঘটালে কত গ্রাম ফেরস সালফাইড প্রস্তুত হবে?

দু'রকমের বিশুদ্ধ পদার্থ (মৌলিক ও যৌগিক) ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ আমরা দেখি ও ব্যবহার করি। এই প্রকার বস্তুর একটা সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে বায়ু। বায়ু কী পদার্থ? এতে কী কী থাকে? তোমরা আগে পড়েছ বায়ুতে যবক্ষারজান, অম্লজান, অঙ্গারকাম্ল, জলীয় বাষ্পের সঙ্গে অন্যান্য বিরল গ্যাসও থাকে। এর সঙ্গে ধুলোকণা ও অণুজীবও থাকে। এগুলির মধ্যে যবক্ষারজান ও অম্লজান দুটি মৌল কিন্তু অঙ্গারকাম্ল ও জলীয় বাষ্প হচ্ছে দুটি যৌগিক। বিরল গ্যাসও মৌলিক। এসব পদার্থ নির্দিষ্ট অনুপাতে বায়ুর সঙ্গে মিশে আছে। তাই বায়ুকে মৌল বা যৌগ বলা যাবে না। ইহা একাধিক মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ। মিশ্রণ মৌলিক ও যৌগিকের থেকে ভিন্ন। মিশ্রণ বিশুদ্ধ পদার্থ নয়।

জল একটি বিশুদ্ধ পদার্থ এবং যৌগিক শ্রেণী ভুক্ত। কিন্তু নদী, ঝরনা, হ্রদ, পুকুর, কুয়ো, সমুদ্র আদির জলকে কী বলব? প্রাকৃতিক উৎসগুলির থেকে সংগৃহীত জল বিশুদ্ধ নয়। এই জলে অনেক ধাতব লবণ ও অল্প অম্লজান দ্রবীভূত হয়ে থাকে। তাই এইরকম জল ও 'মিশ্র পদার্থ' বা 'মিশ্রণ' শ্রেণীভুক্ত। একটা মিশ্রণে একাধিক মৌল থাকতে পারে। এক থেকে অধিক যৌগ থাকলেও মিশ্র পদার্থ হতে পারে। উভয় মৌল ও যৌগ থাকা মিশ্রণও (উদাহরণ বায়ু) আছে, তবে মিশ্রণ কাকে বলব? **যে পদার্থে একাধিক মৌলিক বা যৌগিক বা উভয় মৌলিক ও যৌগিক, যে কোনো অনুপাতে মিশে থাকলে, তাকে মিশ্রণ বলা হয়। দ্রবণও একটা মিশ্রণ।**

তোমাদের জন্য কাজ: ১.১২

তোমরা খাদ্য ও পানীয়রূপে ব্যবহার করা দশটি মিশ্রণের তালিকা করো। সেই মিশ্রণে থাকা মৌল ও যৌগগুলির নাম নিম্নে দেওয়া সারণীর মতন একটা সারণী তোমাদের খাতায় করো।

মিশ্রণ	উপাদান
চিনির শরবত	চিনি, জল
স্যালাড	পেঁয়াজ, শসা, টম্যাটো নুন
-	- - -
-	- - -

বাজারে কিনতে পাওয়া 'মিক্সচার' এই শ্রেণীর হবে বলে ভাবছ কি?

উপরোক্ত মিশ্রণগুলিতে থাকা উপাদান (উভয় মৌল ও যৌগ) গুলির গুণ অপরিবর্তিত থাকে। কারণ এই উপাদানগুলি মিলে মিশ্রণ উৎপন্ন করার সময়ে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। তাই আগের গুণের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন চিনির শরবত চিনির মতো মিষ্টি লাগে। মিক্সচারে বাদাম বিচির স্বাদ বা বর্ণে কোনো নতুনত্ব দেখা যায় না। এই উপাদানগুলোও কোনো নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে সংযোগ হয়ে থাকে না। আবশ্যক হলে আমরা মিশ্রণের উপাদানগুলিকে সহজেই আলাদা করতে পারব। ঘরে ব্যবহৃত হওয়া চালে যদি কাঁকর মিশে যায়, কাঁকর কেমনভাবে বার করা হয় তা তোমরা ঘরে দেখেছ। বাজার থেকে আনা অনেক খাদ্যসামগ্রীর থেকে অনাবশ্যক উপাদানগুলিকে আলাদা করা আবশ্যক হয়ে থাকে, বিভিন্ন কৃষিজাত পদার্থ থেকেও অনাবশ্যক উপাদানগুলিকে বের করে দেওয়া হয়।

পরীক্ষাগারে বিভিন্ন মিশ্রণকে বিভিন্ন উপায়ে পৃথক করা হয়ে থাকে। এর জন্য অবক্ষেপণ (Sadimentation) উদ্‌বাহান (Dicantation), পরিস্রবণ (Filtration), পাতন (Distilation), উর্ধ্বপাতন (Sublination) আদি বিজ্ঞানাগার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এইসব পদ্ধতির বিষয় উচ্চশ্রেণীতে বিশদভাবে জানবে।

মিশ্রণ দুপ্রকারের। যথা: সমজাতীয় মিশ্রণ ও বিষমজাতীয় মিশ্রণ। এই বিষয়ে উচ্চশ্রেণীতে পড়বে।

১.৭: পরমাণু ও অণু

তোমরা জানো যে প্রত্যেক মৌল পদার্থ অনেকগুলি অতীব সূক্ষ্ম কণিকার সমষ্টি। মৌলের এই ক্ষুদ্রতম কণিকাকে পরমাণু বলা হয়। একটা মৌলিকে সব পরমাণু এক রকমের হয়ে থাকে। তবে এমন কতক মৌল আছে, যাদের একাধিক প্রকারের পরমাণুও থাকে। সেরকম পরমাণুগুলি সমস্থানিক বা আইসোটপ (Isotope) বলা হয়।

যথা কার্বন ১২ ও কার্বন ১৪, প্রোটিয়াম (1_H), ডিউটরিয়াম (2_H) ও হাইটিয়াম (3_H) ইত্যাদি। মূল মৌলিকের গুণ তার সমস্থানিক পরমাণুতে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

যৌগ পদার্থও অনেক সূক্ষ্ম কণিকার সমষ্টি। যৌগের ক্ষুদ্রতম কণিকাকে অণু বলা হয়। যৌগিকগুলির গুণ ইহার অণুতেও পরিলক্ষিত হয়। যৌগে যে যে মৌল সংযুক্ত হয়ে থাকে, সেই যৌগিকের অণুতে সেই মৌলের পরমাণু থাকে।

অধিকাংশ মৌলিকের পরমাণু ও অণু একরকমের কঠিন মৌলগুলির অণু একটা করে পরমাণুতে গঠিত। যথা: গন্ধক, অঙ্গারক, লৌহ, তামা ইত্যাদি। কিন্তু গ্যাসীয় মৌলের অণুগুলিতে দুটি করে পরমাণু থাকে। যথা: উদ্‌জান (H2), অম্লযান (O2), যবক্ষরজান (N2) ইত্যাদি।

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া মৌল ও যৌগদের অণু ও পরমাণু অংশগ্রহণ করে থাকে। এই বিষয়ে পরের অধ্যায়ে পড়ব।

১.৮: মৌলিকের প্রতীক (Symbol of Elements)

প্রত্যেক মৌলের নিজের নিজের নাম আছে। যে কোনো মৌলিকের বিষয়ে সূচনা দিতে হলে এটা সম্পূর্ণ নাম লেখার পরিবর্তে সংক্ষেপে একটা-দুটি অক্ষর লেখা সহজ ও সুবিধেজনক হয়ে থাকে। এই সাংকেতিক ক্ষুদ্র নামকে মৌলিকের প্রতীক বলা হয়। প্রতীকের সেই মৌলিকের প্রথম অক্ষরটি বা দুটি অক্ষরে উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মৌলিকের ল্যাটিন বা গ্রিক নামটি ইংরেজি অক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

> তোমরা নিজের নাম, বিদ্যালয়ের নাম, তোমার গ্রাম, শহর, রেলস্টেশন ইত্যাদিকেও ছোট করে লিখে থাকো, যথা: রামচন্দ্র মহাপাত্রকে আর সি মহাপাত্র, বক্সি জগবন্ধু বিদ্যাধর মহাবিদ্যালয়কে বি. জে. বি. মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি লেখা হয়।

নিম্ন সারণীতে কতকগুলো মৌলিকের নাম ও প্রতীক দেওয়া হয়েছে।

মৌলিক	প্রতীক	মৌলিক	প্রতীক
উদ্‌যান (Hydrogen)	H	সোডিয়াম (Natrum)	Na
যবক্ষারজান (Nitrogen)	N	পটাশিয়াম (Kalium)	K
অম্লজান (Oxygen)	O2	ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium)	Mg
ক্লোরিন (Chlorine)	cl	ক্যালশিয়াম (Calcium)	ca
ব্রোমিন (Bromine)	Br	জিঙ্ক (Zinc)	Zn

আয়োডিন (Iodine)	I	ম্যাঙ্গানিজ (Manganise)	Ma
হিলিয়াম (Helium)	He	সিসা (Plumbum)	Pb
নিয়ন (Neon)	Ne	লোহা (Ferrum)	Fe
অঙ্গারক (Carbon)	C	তামা (Cuprum)	Cu
ফসফরাস (Phosphorus)	P	পারদ (Hydragyrum)	Hg
গন্ধক (Sulpher)	S	সোনা (Aurum)	Au
সিলিকন (Sillicon)	Si	রুপো (Argentum)	Ag

একটা প্রতীককে পড়ে নির্দিষ্ট মৌলের নাম জানা যায়। প্রতিটি সেই পরমাণুর একটি পরমাণুকে বোঝায়। যেমন—প্রতীক 'H' উদ্‌জান মৌলের একটা পরমাণুকে বোঝায়।

কতক মৌলের অণু ইহার পরমাণুর থেকে ভিন্ন উদাহরণস্বরূপ উদ্‌যান মৌলিকের অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। তাই উদ্‌যানের অণুকে ভিন্ন এক উপায় দর্শানো হয়ে থাকে। তাকে আণবিক সংকেত বলা হয়।

উদাহরণ: উদ্‌যানের আণবিক সংকেত H2, অম্লজানের আণবিক সংকেত O2, যবক্ষারজানের আণবিক সংকেত N2 ইত্যাদি।

১.৯: যৌগিক পদার্থ ও তার আণবিক সংকেত:

তোমরা জানো দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ এক নির্দিষ্ট অনুপাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত হয়ে যে নতুন পদার্থ সৃষ্টি করে তাকে যৌগিক পদার্থ বলা হয়। যৌগিক পদার্থের গুণ ইহার মূল মৌলিক পদার্থের গুণের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকাকে অণু বলা হয়। যৌগিক পদার্থের সমস্ত গুণ এই অণুতে দেখতে পাওয়া যায়।

একটা উদাহরণ এখানে নেওয়া যাক। দুটি উদ্‌জান পরমাণু একটা অম্লজানের পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংযুক্ত হয়ে, জলের এক ক্ষুদ্রতম কণিকা (যাকে অণু বলা হয়) তৈরি করে। জলের অণুর সংকেত হচ্ছে H_2O।

আমরা খাদ্যে ব্যবহার করা সাধারণ লবণের অণুতে একটা সোডিয়ামের পরমাণু ও একটা ক্লোরিনের পরমাণু থাকে। তাই এই সাধারণ লবণের সংকেত হচ্ছে Nacl। এই নুনের গুণ, সোডিয়াম ও ক্লোরিনের গুণের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক চামচ নুনের যে গুণ, সেই নুনে থাকা প্রত্যেক অণুর গুণ সেই রকম হয়।

নিম্ন সারণীতে কতকগুলি যৌগিক ও সেগুলির সংকেত দেখানো হয়েছে।

যৌগিক	সংকেত	যৌগিক	সংকেত
জল	H_2O	লাইমটাটিরিক (চুনের জল)	$Ca(OH)_2$
অঙ্গারকাম্ল	Co_2	ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড	
কার্বন মনোক্সাইড	CO		
সালফার ডাইঅক্সাইড	So_2	সারফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4
অ্যামোনিয়া	NH_3		
সোডা (কাপড়কাচা)	Na_2CO_3, $10H_2O$	নাইট্রিক অ্যাসিড	HNO_3
বেকিং সোডা	$NaHCO_3$	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	Hcl
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কস্টিক সোডা	NaOH	গ্লুকোজ	$C_6H_{12}O_6$
পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড	KOH	চিনি বা সুক্রোজ	`$C_{12}H_{22}O_{11}$
ক্যালশিয়াম কার্বোনেট বা লাইম স্টোন	$CaCO_3$		

কী শিখলাম ?

- জল, বায়ু, ঘরদ্বার, কাঠ, কয়লা ইত্যাদিকে পদার্থ বলা হয়।
- কতক পদার্থ প্রাকৃতিক ও অন্য কতক মনুষ্যকৃত।
- প্রত্যেক পদার্থের বস্তুত থাকে ও তা কিছু স্থান অধিকার করে থাকে।
- পদার্থ তিন প্রকার অবস্থায় থাকতে পারে। যথা: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়।
- পদার্থের তিন অবস্থার ভৌতিক ধর্ম। যথা: আকার, আকৃতি ভিন ভিন্ন হয়ে থাকে।
- পদার্থ তিন প্রকার। যথা: মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্রণ।
- মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বিশুদ্ধ পদার্থ।
- মিশ্রণের উপাদানগুলি পৃথকীকরণ করা সহজ।
- মৌলিকের ক্ষুদ্রতম কণিকাকে পরমাণু ও যৌগিকের ক্ষুদ্রতম কণিকাকে অণু বলা হয়।
- মৌলিকগুলি তাদের প্রতীকের সাহায্যে ও যৌগিকগুলি তাদের সংকেতের সাহায্যে সংক্ষেপে দর্শানো হয়ে থাকে।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) পদার্থের তরলাবস্থায় নির্দিষ্ট — থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট — থাকে না।

(খ) পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় কণিকাগুলির মধ্যে থাকা পারস্পরিক আকর্ষণ বল — থাকে।

(গ) যে বিশুদ্ধ পদার্থগুলির পরমাণুগুলি সহধর্মী হয়ে থাকে, তাকে — বলা হয়।

(ঘ) বায়ু একটা — পদার্থ কিন্তু অঙ্গারকাম্ল একটা — পদার্থ।

(ঙ) একটা মৌলিক পদার্থের — প্রকার পরমাণু থাকে।

২. নিম্নলিখিত পদার্থগুলি থেকে মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্রণকে আলাদা করে লেখো।

ক্লোরিন, পারদ বা মার্কারি, লাইম বা চুন, চিনির শরবত, গন্ধকাম্ল, ফিটকিরি, বরফ, দুধ, হীরা, নুন।

৩. প্রতীক ও সংকেত ব্যবহার করে নিম্নলিখিত পদার্থগুলিকে লেখো।

(ক) ম্যাঙ্গানিজের পরমাণু—

(খ) ক্লোরিন অণু—

(গ) চুনজলের সংকেত—

(ঘ) যবক্ষারজানের অণু—

৪. যৌগিক ও মিশ্রণের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

৫. কোন মৌলিক অণুতে এক থেকে অধিক পরমাণু থাকে, তিনটি উদাহরণ দাও।

৬. তোমরা জানো O_2 ও O_3 একটি অন্যটির সমস্থানিক। তবে এই দুটি ভিন্ন পদার্থ, O_3 নাম লেখো ও ইহা আজকাল সব জায়গায় কেন আলোচনা হচ্ছে, সংক্ষেপে লেখো।

৭. প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম উদ্‌জানের তিনটি সমস্থানিক। জলের সংকেত H_2O ও ইহার ব্যবহার বহুল। ডিউটেরিয়াম, অম্লজান থেকে প্রস্তুত যৌগিকের নাম ও সংকেত লেখো। এবং সেই যৌগিকের ব্যবহার সম্বন্ধে কী জানো লেখো।

৮. একটা ধাতু ও অধাতুর নাম ও সংকেত লেখো। যা সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে।

(প্রশ্ন ৭ ও ৮-এর উত্তর লেখার সময় শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।)

ঘরে করার জন্য কাজ:

- তোমাদের ঘরে ব্যবহৃত হওয়া পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি প্রাকৃতিক ও কোন্‌গুলি মনুষ্যকৃত তার তালিকা করো।
- তোমাদের ঘরে কোন্ কোন্ পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দেখছ তা উল্লেখ করে শ্রেণীতে আলোচনা করো।

●●●

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন

২.১ পদার্থের পরিবর্তন

আমাদের ঘরে ও পরিবেশে থাকা বিভিন্ন পদার্থের পরিবর্তন হওয়া আমরা দেখে থাকি।

তোমাদের জন্যে কাজ: ২.১

নীচের সারণী তোমাদের খাতায় আঁকো ও পাঁচটি উদাহরণ দিয়ে সম্পূর্ণ করো।

পদার্থ	পরিবর্তিত অবস্থা
জল	বাষ্প
লোহার কাঁটা	জং ধরা লোহার কাঁটা
-	-
-	-
-	-

সব পরিবর্তন এক প্রকার নয়। তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিভিন্ন পরিবর্তনের বিষয়ে পড়েছ। তোমরা জানো এগুলি সাধারণত দু'প্রকারের। যেগুলি অস্থায়ী ও প্রত্যাবর্তী সেগুলিকে ভৌতিক পরিবর্তন বলা হয়। যেগুলি স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী সেগুলিকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়। তোমরা এ কথাও জানো যে ভৌতিক পরিবর্তনে পদার্থের কেবল ভৌতিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে এবং কোনো নতুন পদার্থের উৎপন্ন হয় না। কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের উভয় ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে, এক বা একাধিক নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

চিনিকে জলে দ্রবীভূত করে শরবত প্রস্তুত করা, জলকে উত্তপ্ত করে বাষ্প করা, একটা কাঠিকে ভেঙে দুখানা করা ও দুটো কাগজকে আঠা দিয়ে জোড়া ইত্যাদি পরিবর্তনগুলিকে ভৌতিক পরিবর্তন বলা হয়। কাঠ, রন্ধন গ্যাস ইত্যাদি সব রকমের ইন্ধনের দহন, লোহার কলঙ্ক লাগা, দুধ থেকে ছানা তৈরি করা ইত্যাদি রাসায়নিক পরিবর্তন।

প্রশ্ন ১:

একটা ফুলঝুরি বাজি জ্বালানোর সময় তোমরা ধরে থাকা অংশে কী প্রকার পরিবর্তন হয়।

যা জ্বলে গেল সেই পদার্থের কোন্ প্রকার পরিবর্তন হল?

ফুলঝুরির বারুদ, জ্বলে থাকা অংশের তারের কি পরিবর্তন হয়?

তোমার উত্তরের সপক্ষে দুটি কারণ দর্শাও ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ২.২

এখানে দেওয়া পরিবর্তনগুলির মধ্যে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনগুলিকে আলাদা করে সারণী ২.১ -এ উদ্দিষ্ট স্থানে লেখো। সেই পরিবর্তনের সপক্ষে থাকা কারণ যথাস্থানে লেখো।

- বেগুন কেটে রেখে দিলে তার রং পরিবর্তন হওয়া।
- বাসি পান্তাভাত টক লাগা।
- একটা সরু তারকে বাঁকিয়ে ইংরাজি আট সংখ্যা তৈরি করা।
- সাইকেলের টিউবে পাম্প দেওয়া।
- বাজি, পটকা ফেটে শব্দ হওয়া।
- চকগুঁড়ো থেকে চকখড়ি তৈরি করা।

সারণী ২.১ ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন

ভৌতিক পরিবর্তন	কারণ	রায়াসনিক পরিবর্তন	কারণ

তোমাদের জন্য কাজ ২.৩

তোমার দেখা বা অনুভব করা পদার্থের পরিবর্তনগুলির মধ্যে কয়েকটি বেছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি কোন্ কারণে ভৌতিক ও অন্য কোন্‌গুলি রাসায়নিক তা এক সারণীতে লেখো।

এরকম অনেকগুলি পরিবর্তনে অনুধ্যান করলে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। সেই পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে সারণী ২.২-তে দেওয়া হয়েছে।

সারণী ২.২ ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা			
	ভৌতিক পরিবর্তন		রাসায়নিক পরিবর্তন
১.	এই পরিবর্তনে কোনো নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় না।	১.	এই পরিবর্তনে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়।
২.	পদার্থের এই পরিবর্তন অস্থায়ী ও প্রত্যাবর্তী অর্থাৎ এই পরিবর্তনকে বিপরীত দিক থেকে কার্যকরী করলে পদার্থের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।	২.	ইহা স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী।
৩.	এর দ্বারা পদার্থের ওজনের (বস্তুত্ব) হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।	৩.	এর দ্বারা যে পদার্থ পরিবর্তিত হয় তার ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়ে থাকে।
৪.	এর দ্বারা উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে বা নাও হতে পারে।	৪.	এই পরিবর্তনের সময় কম, বেশি উত্তাপের হ্রাস, বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সময়ে সময়ে আলোক, অতিবেগুনি রশ্মি অবশোষিত হয় বা বের হয়।
৫.	এই পরিবর্তনের দ্বারা পদার্থের কোনো রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয় না, কেবল ভৌতিক ধর্ম যথা: অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে থাকে।	৫.	এই পরিবর্তনের জন্যে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হওয়ায় তা উভয় নতুন ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্মযুক্ত হয়ে থাকে।

২.২ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া

আমরা পড়লাম যে রাসায়নিক পরিবর্তনে সব সময়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা কীভাবে হয় ও কেন হয়, জানার জন্যে তোমরা আগ্রহী হবে। এই বিষয়ে তোমরা উঁচু শ্রেণীতে ভালোভাবে জানবে। তবে এখানে নিম্নোক্ত রাসয়নিক পরিবর্তনগুলিকে নিজে করে অনুধ্যান করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ২.৪

একটা পরীক্ষা নলে এক চামচ ভিনিগার নাও। তার মধ্যে এক চিমটি খাওয়ার সোডা (সোডিয়াম বাইকার্বনেট) মিশিয়ে লক্ষ করো কী হচ্ছে? অন্য একটা পরীক্ষা নলে অল্প সদ্য প্রস্তুত স্বচ্ছ চুনের জল নিয়ে রাখো। প্রথমে পরীক্ষা নলের মধ্যে বুদবুদ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে গ্যাস নির্গত হবে এবং সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাবে।

নির্গত হওয়া এই গ্যাসকে তৎক্ষণাৎ স্বচ্ছ চুন জলে প্রবেশ করিয়ে দেখো কী হল?

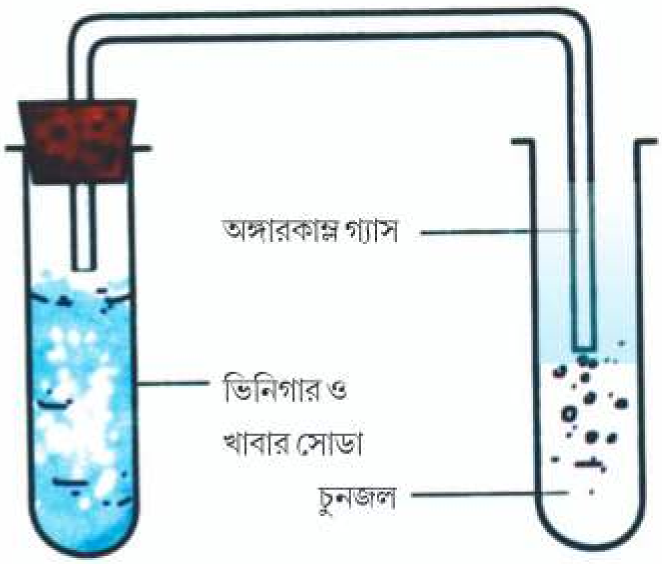

চিত্র ২.১: চুনজলের সহিত অঙ্গারকাম্ল গ্যাসের প্রতিক্রিয়া

উপরোক্ত পরীক্ষায় যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হল, সেগুলিকে লিখে রাখো, পরে আলোচনা করব।

তোমাদের জন্যে কাজ ২.৫

একটা স্বচ্ছ কাচের পাত্রে এক চামচ তুঁতে (কপার সালফেট) নিয়ে আবশ্যক পরিমাণ জল মিশিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করো। সুবিধা হলে এই দ্রবণে দু-চার ফোঁটা লঘু গন্ধকাম্ল (ডাইলুট সালফিউরিক অ্যাসিড) মেশাও।

সতর্কতা:

লঘু গন্ধকাম্ল মেশানোর সময়ে বিশেষ সাবধনতা অবলম্বন করো। দেখো যেন তোমাদের পোশাকে না পড়ে বা তোমাদের শরীরে কোথাও না লাগে।

এই দ্রবণের বর্ণ লিখে রাখো, এবং একটি কাচের নালিতে এখান থেকে অল্প নিয়ে রাখো। কাচের পাত্রে থাকা দ্রবণে জং না লেগে থাকা একটা লোহার কাঁটা ডুবিয়ে ছেড়ে দাও এবং প্রায় আধঘণ্টা পর দেখো কী পরিবর্তন হল।

লোহার কাঁটা ডোবানোর আগে তুঁতের দ্রবণের রং কী ছিল আধঘণ্টা পর সেই দ্রবণের রঙের কী পরিবর্তন হল ও লোহার কাঁটাটির কেমন পরিবর্তন লক্ষ করলে? সব কিছু লিখে রাখো, পরে আলোচনা করব।

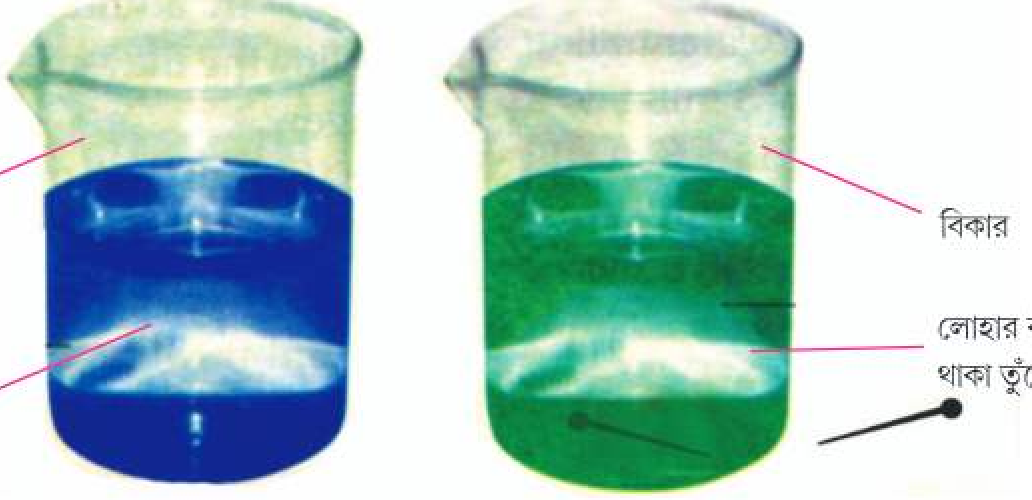

চিত্র ২.২: তুঁতের সঙ্গে লোহার কাঁটার প্রতিক্রিয়ার জন্যে হওয়া পরিবর্তন।

উপরোক্ত দুটি পরিবর্তনের সময় যা যা ঘটল তা আলোচনা করব। প্রথমে ২.৪-এর পরিবর্তনের কথা দেখব। ভিনিগারের সঙ্গে খাবার সোডার প্রতিক্রিয়া দ্বারা একটা নতুন গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হল, যা সোঁ সোঁ শব্দ করে বুদবুদের সঙ্গে বেরোচ্ছিল। ভেবে বলো দেখি তা কোন্ গ্যাস? সেই গ্যাসকে স্বচ্ছ চুনের জলে প্রবেশ করাতে চুনের জল দুধের রং হয়ে গেল। অঙ্গারকাম্ল (কার্বন-ডাইঅক্সাইড) গ্যাস-এর এটা একটা ধর্ম হয়ে থাকায়, আমরা জানলাম এই প্রতিক্রিয়ার সময় উৎপন্ন হওয়া গ্যাসটি অঙ্গারকাম্ল গ্যাস।

তোমরা জানো যে, চুনের জল হচ্ছে ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ। ইহার সঙ্গে অঙ্গারকাম্লের প্রতিক্রিয়ার জন্যে অন্য এক নতুন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হল। যা দেখতে সাদা ও জলে দ্রবণীয় নয়। তাই প্রথম থেকে স্বচ্ছ ও বর্ণহীন চুনের জল সাদা হয়ে গেল। এই নতুন পদার্থটি হচ্ছে ক্যালশিয়াম কার্বোনেট।

এই পরিবর্তনের জন্যে দুটি নতুন পদার্থ অঙ্গারকাম্ল ও ক্যালশিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন হয়ে থাকায় ইহা রাসায়নিক পরিবর্তন এবং এখানে মূল পদার্থ (ভিনিগার, খাবার সোডা, উৎপাদিত অঙ্গারকাম্ল ও চুনের জল) গুলির মধ্যে যে যে প্রতিক্রিয়া সংগঠিত হল তাকে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বলা হয়।

প্রশ্ন ২:

স্কুলের দেওয়ালে বা তোমার ঘরের দেওয়ালে চুন দেওয়া হলে, সেগুলি সব প্রথম প্রথম পানসে (জলজলে) মতো হালকা দেখা যায়। কিন্তু কিছু সময় পর তা খুব গাঢ় সাদা দেখায়। এমন কেন হয়? এই বিষয়ে তোমাদের শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ২.৫ পরিবর্তনে ব্যবহৃত হওয়া তুঁতের দ্রবণ নীল রঙের ছিল তার মধ্যে লোহার কাঁটা ফেলার আধঘণ্টা পর সেই রং বদলে সবুজ রং হয়ে গেল। এই সবুজ রংযুক্ত জলের দ্রবণীয় পদার্থ হচ্ছে আয়রন সালফেট। এই সময়ের মধ্যে লোহার কাঁটার উপর ধূসর বর্ণের তামার পাতলা আস্তরণ বসে গেছে। এই আস্তরণ তুঁতের থেকে বেরিয়ে থাকা তামার আস্তরণ। এই পরিবর্তনটি একটা রাসায়নিক পরিবর্তন। তুঁতে দ্রবণের সঙ্গে লৌহ প্রতিক্রিয়া করার দ্বারা এটা সংগঠিত হল এবং এটাও একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া।

প্রশ্ন ৩:

নিম্নলিখিত সারণীটি পূরণ করো।			
পরিবর্তন	নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় কি?	মূল পদার্থ ফিরে পাও কি?	ইহা ভৌতিক না রাসায়নিক পরিবর্তন?
ক. দুধে জল মেশানো			
খ. উলে সোয়েটার বোনা			
গ. দুধ, চিনি ও বরফ মিলিয়ে আইসক্রিম বানানো			
ঘ. দুধের থেকে দই বানানো			
ঙ. মোম গালানো			
চ. মোমবাতি জ্বলা			
ছ. দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো			
জ. বাসি পাউরুটিতে সোঁতা লাগা			
ঝ. বাসি ডাল বা তরকারি টক লাগা			
ঞ. শুকনো পাতা আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট সার বানানো।			

২.৩ রাসায়নিক সমীকরণ:

তোমরা জানো যে একটা মৌলিকের পরমাণুকে তার প্রতীক দ্বারা এবং উভয় মৌলিক ও যৌগিকের অণুকে তার সংকেত দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ঠিক সেই রকম একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে যে সমীকরণের সাহায্যে সংক্ষেপ ও সাংকেতিক রূপে পরিপ্রকাশ করা হয় তাকে **রাসায়নিক সমীকরণ** বলা হয়। এই সমীকরণ গণিতে ব্যবহার হওয়া সমীকরণগুলির থেকে আলাদা। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় যে যে পদার্থগুলি অংশগ্রহণ করে থাকে সেগুলিকে প্রতিকারক বলা হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়ায় যে যে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলিকে উৎপাদন বলা হয়।

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় এখানে অংশগ্রহণ করা পদার্থ প্রতি কারকের অণুতে থাকা পরমাণুগুলির সংরচনায়, কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটে উৎপাদিত নতুন পদার্থ (উৎপাদ) গঠিত হয়েছে সে বিষয়ে উঁচু ক্লাসে পড়বে।

একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় এক বা একাধিক প্রতিকারক ব্যবহৃত হতে পারে। সেরকম একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় এক বা একাধিক উৎপাদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। রাসায়নিক সমীকরণ লেখার সময়ে সেই প্রতিকারকগুলিকে তাদের অণুর সংকেত ও উৎপাদগুলিকে উৎপাদ অণুর সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

২.৪ রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম:

একটি রাসায়নিক সমীকরণ লেখার জন্যে কী আবশ্যক তা প্রথমে জানা উচিত। এর জন্যে একটা সরল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে উদাহরণভাবে নেব। যথা: ম্যাগনেশিয়াম ফিতের বায়ুতে দহন।

তোমরা জানো ম্যাগনেশিয়াম ফিতায় অগ্নিসংযোগ করলে তা খুব উজ্জ্বল আলো প্রকাশ করার সঙ্গে জ্বলে ওঠে। ওই সময় সাদা রঙের ছাই (চূর্ণ) উৎপন্ন হয়। ম্যাগনেশিয়ামের এই রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যে বায়ুতে থাকা অম্লজানের সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন হওয়া সাদা রঙের ছাই হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড।

উপরোক্ত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াতে এক রাসায়নিক সমীকরণে প্রকাশ করব। এর জন্যে নিম্নলিখিত তথ্যগত সোপানগুলি প্রতি ধ্যান দেওয়া আবশ্যক।

- রাসায়নিক সমীকরণ লেখার পূর্বে প্রতিকারক ও উৎপাদ অণুর সংকেত জানা থাকা আবশ্যক। আমরা নিয়ে থাকা উদাহরণে ম্যাগনেশিয়াম ও অম্লজান হচ্ছে প্রতিকারক। ম্যাগনেশিয়াম এক কঠিন ধাতব মৌলিক পদার্থ হয়ে থাকায়, ইহার প্রত্যেক অণুতে একটা পরমাণু থাকে। তাই ইহার অণু সংকেত ও পরমাণুর প্রতীক সমান ও তা হচ্ছে 'Mg' । অম্লজান এক মৌলিক পদার্থ হলেও একটা গ্যাসীয় পদার্থ হয়ে থাকায়, এর প্রত্যেক অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। তাই ইহার সংকেত O_2।

  এই প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদ হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড। ইহা এক যৌগিক পদার্থ। এর প্রত্যেকটি অণুতে একটা ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু ও একটা অম্লজানের পরমাণু থাকে। ইহার সংকেত MgO। রাসায়নিক সমীকরণে উভয় প্রতিকারক ও উৎপাদের অণুর সংকেত 'হি' ব্যবহৃত হয়।

- রাসায়নিক সমীকরণে বাম পার্শ্বে প্রতিকারকগুলির সংকেত লেখা হয়। তাই সমীকরণের বাম পার্শ্বে Mg ও O2 এবং ডান পার্শ্বে MgO লিখতে হবে।

- এখানে ম্যাগনেশিয়াম ও অম্লজান দুটি প্রতিকারক হয়ে থাকায় সেগুলির অণুর মধ্যে যুক্তচিহ্ন, লিখতে হবে। যদি কোনো সমীকরণ লেখার সময়ে এক থেকে অধিক উৎপাদ প্রকাশ করতে আবশ্যক হয়ে তাকে, তবে সেগুলির অণুর মধ্যেও যুক্তচিহ্ন, লেখা আবশ্যক। এখানে প্রতিকারক দুটিকে $Mg+O_2$ এবং একমাত্র উৎপাদের জন্যে MgO লেখা হবে।

- সমীকরণের বাম পার্শ্ব ও ডান পার্শ্বকে পৃথক করার স্থানে 'তির' ($\rightarrow$) চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়। প্রতিকারক ও উৎপাদের মধ্যে এই তিরচিহ্ন দেওয়া হয়। তিরটি বাম থেকে ডাইনে সুচানোর জন্যে প্রতিকারক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হওয়া দর্শায়।

- প্রথমে রাসায়নিক সমীকরণটি প্রতিকারক ও উৎপাদগুলির নাম ব্যবহার করে লেখা যেতে পারবে। যথা: ম্যাগনেশিয়াম, অম্লজান $\xrightarrow{\text{তাপ}}$ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড।

- উপরোক্ত রাসায়নিক সমীকরণটি প্রতিকারক ও উৎপাদগুলির সংকেত ব্যবহার করে নিম্নপ্রকারে লেখা যায়।

$$Mg + O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} MgO$$

- উপরোক্ত রাসায়নিক সমীকরণটিকে কঙ্কাল (Skeletal) বা অসমতুল (Unbalanced) সমীকরণ বলা হয়।
- রাসায়নিক পরিবর্তনে, পরিবর্তনের পূর্বে বস্তুত এবং পরিবর্তনের পরের বস্তুত্ব সর্বদা সমান থাকে। এটা একটা নিয়ম যা তোমরা উচ্চশ্রেণীতে ভালোভাবে পড়বে। এবং এর যথার্থতা তথা উপকারিতা বুঝতে পারবে। এর অর্থ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকা প্রতিকারকগুলির মোট বস্তুত্ব, প্রতিক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন হয়ে থাকা, উৎপাদগুলির মোট বস্তুত্বের সঙ্গে সমান, তাই অসমতুল রাসায়নিক সমীকরণগুলিকে সমতুল করা হয়ে থাকে। সব থেকে সরল পরীক্ষানিরীক্ষা (Trial+error) পদ্ধতির সাহায্যে সমতুল করব।
- অসমতুল সমীকরণটি নিম্ন প্রকারে আছে।

$$Mg + O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} MgO$$

এই সমীকরণটিতে উভয় পার্শ্বে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুর সংখ্যা একটা করে থাকার সমান আছে। কিন্তু অম্লজানের পরমাণু সংখ্যা বামপার্শ্বে দুটি ও ডানপার্শ্বে একটি থাকায় সমান নেই। তাই অম্লজানের পরমাণুর সংখ্যা সমীকরণে উভয়পার্শ্বে সমান করার জন্যে যে পার্শ্বে অম্লজান পরমাণু কম আছে (এখানে ডান পার্শ্ব) এবং যে অণু আছে (এখানে MgO) তাকে দুগুণ করব। এখন সমীকরণটি নিম্ন প্রকার হবে।

$$Mg + O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2MgO$$

এর ফলে অম্লজানের পরমাণু উভয় পার্শ্বে সমান হল সত্যি কিন্তু ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা অসমান হয়ে গেল। বামপার্শ্বে এটা কম থাকায়, সেই 'Mg'-কে দুগুণ করতে হবে। সেই সমীকরণটি নিম্ন প্রকার হল।

$$2Mg + O_2 = 2MgO$$

এখন সমীকরণটি সমতুল হল। স্থল বিশেষে এই রকম সমতুল সমীকরণ লেখার সময় ইহার তির চিহ্ন ($\rightarrow$) স্থানে সমান (=) চিহ্নও লেখা হয়ে থাকে।

মনে রেখো:

রাসায়নিক সমীকরণকে সমতুল করার সময় প্রতিকারক ও উৎপাদগুলির সংকেতকে কোনোদিন বদলাবে না।

রাসায়নিক সমীকরণ লেখা এবং তাকে সমতুল করা সোপানগুলিকে অভ্যাস করার জন্যে আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

উদ্‌জান যখন অম্লজানের সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রায় প্রতিক্রিয়া করে তখন জল উৎপন্ন হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় উদ্‌জান ও অম্লজান প্রতিকারকও জল উৎপাদ। উক্ত সমীকরণটি হল

$$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O \ldots(1)$$

(এখানে H_2, O_2, H_2O যথাক্রমে উদ্‌জান, অম্লজান ও জলের অণুর সংকেত),

উপরোক্ত সমীকরণে উভয়পার্শ্বে উদ্‌জান পরমাণুর সংখ্যা সমান আছে। অম্লজান পরমাণুর সংখ্যা সমান নেই।

পরমাণু	প্রতিকারক পার্শ্বের সংখ্যা	উৎপাদ পার্শ্বের সংখ্যা
উদ্‌জান	২	২
অম্লজান	২	১

তাই অম্লজান পরমাণুকে সমান করার জন্য জল (H_2O) অণুকে দুগুণ করব। এর দ্বারা সমীকরণটি নিম্ন প্রকার হল $H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$

এরফলে সমীকরণটি উভয়পার্শ্বে অম্লজানের পরমাণুর সংখ্যা সমান হল সত্য কিন্তু উদ্‌জানের পরমাণু অসমান হয়ে গেল। তাই উভয় পার্শ্বে উদ্‌জানের পরমাণুকে সমান করার জন্যে বামপার্শ্বস্থ উদ্‌জানের অণুর সংখ্যাকে দুগুণ করব। এর দ্বারা সমীকরণটি $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$, ইহা সমতুল হয়ে গেল। তাই প্ত স্থানে ঠেগুড ব্যবহার করে লিখব যথা: $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$

প্রশ্ন ৩

সমীকরণ (১)-কে সমতুল করার জন্য আমরা যদি লিখি

$$H_2+O = H_2O$$

তা হলে কী ভুল হবে

তোমার উত্তর যথার্থতার সঙ্গে লেখো।

প্রশ্ন ৪

নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য সমতুল রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

ক. বায়ুতে অঙ্গার ও (কার্বন) জ্বলার সময় অঙ্গারকাম্ল গ্যাস (কার্বন-ডাইঅক্সাইড) উৎপন্ন হয়।

খ. সোডিয়াম ক্লোরিনের সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

গ. উদ্‌জান, ক্লোরিনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করলে লবণাম্ল (হাইড্রোজেন ক্লোরাইট) গ্যাস উৎপাদিত হয়।

কী শিখলে ?

- বিভিন্ন পদার্থের অনেক পরিবর্তন হয়ে থাকে।
- এই সব পরিবর্তন মুখ্যত দুপ্রকারের। যথা: ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন।
- ভৌতিক পরিবর্তনগুলি প্রত্যাবর্তী ও এর জন্যে পদার্থের কেবল ভৌতিক ধর্মগুলির পরিবর্তন হয়ে থাকে।

- রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি অপ্রত্যাবর্তী ও এই পরিবর্তন দ্বারা পদার্থের উভয় ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্মগুলি পরিবর্তন হয়ে থাকে।
- রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যে সর্বদা নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়।
- রাসায়ানিক পরিবর্তনের সময় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।
- রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেওয়া পদার্থগুলিকে প্রতিকারক ও প্রতিক্রিয়ার সময় উৎপন্ন হওয়া নতুন পদার্থকে উৎপাদ বলা হয়।
- রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সংক্ষেপ, সাংকেতিক, উপস্থাপন বা পরিপ্রকাশকে রাসায়নিক সমীকরণ বলা হয়।
- রাসায়নিক সমীকরণ দুপ্রকারের লেখা হয়ে থাকে। যথা: সমতুল ও অসমতুল রাসায়নিক সমীকরণ।
- একটা সমতুল রাসায়নিক সমীকরণে উভয়পার্শ্বে সমান প্রকার সমান সংখ্যক পরমাণু থাকে, কারণ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটলে পরিবর্তন-পূর্ব, বস্তুত্ব ও পরিবর্তন পরের বস্তুত্ব সর্বদা সমান থাকে।

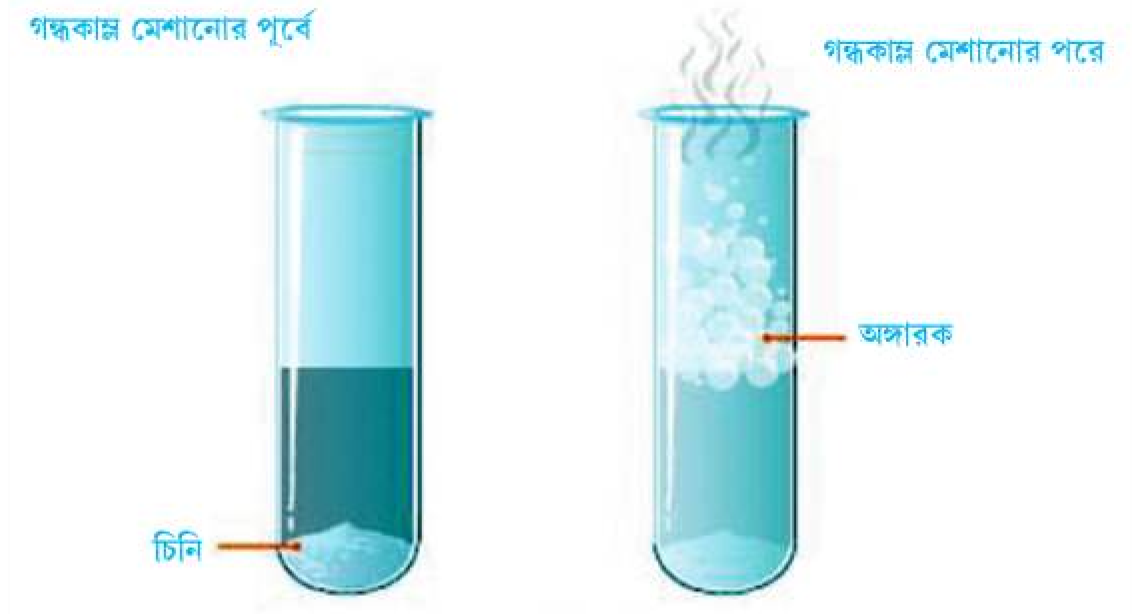

চিনি ও গন্ধকাম্ল মধ্যে প্রতিক্রিয়া

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ভৌতিক পরিবর্তন ?

ক) আলোর সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

খ) পুরোনো কাগজ ব্যবহার করে ঠোঙা তৈরি করা

গ) একটা তামার মুদ্রাকে পিটিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করা

ঘ) স্বচ্ছ চুনের জলকে একটা সরুমুখ থাকা শিশিতে নিয়ে ফোঁকো।

ঙ) বিভিন্ন আবর্জনা পদার্থের থেকে ক্ষত তৈরি করা।

চ) তুলো থেকে সুতো প্রস্তুত করা।

২. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ভৌতিক কিন্তু অপ্রত্যাবর্তী ?

ক) আইসক্রিম গলে যাওয়া

খ) চিনেমাটির তৈরি ফুলদানি ভেঙে যাওয়া

গ) ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বালানো

ঘ) লোহার কাঁটায় মরচে বা জং লাগা।

৩. একটা কাঠের গুঁড়িকে ছোট ছোট করে কেটে জ্বালালে দুটি ভিন্ন ভিন পরিবর্তন হয়ে থাকে। দুটি কারণসহ বোঝাও।

৪. নিম্নলিখিত অসমতুল রাসায়নিক সমীকরণগুলি সমতুল করো ?

ক) $Na+O_2 \rightarrow Na_2O$

খ) $Mg+N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

গ) $N_2+H_2 \rightarrow NH_3$

ঘ) $KClO_3 \rightarrow KCl+O_2$

৫. নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সমতুল রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে দর্শাও।

ক) অ্যালুমিনিয়াম অম্লজানসহ প্রতিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে।

খ) সোডিয়াম অঙ্গারকাম্লের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করলে সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

গ) পটাশিয়াম, গন্ধকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে পটাশিয়াম সালফাইডে রূপান্তরিত হয়।

ঘ) কার্বন-ডাইঅক্সাইড অম্লজানের সঙ্গে দহিত হলে অঙ্গারকাম্ল উৎপন্ন হয়।

৬. $H_2+1/2\,O_2 \rightarrow H_2O$ সমীকরণটি ঠিক কী ভুল যথার্থতা সব বোঝাও।
(আবশ্যক হলে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো)

ঘরে করার জন্যে কাজ:

তোমার ঘরে ও বাইরে লেখা পরিবর্তনগুলির তালিকা করো। সেগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ভৌতিক ও কোন্‌গুলি রাসায়নিক পরিবর্তন বাছো।

এই তালিকায় থাকা কোন্ পরিবর্তনগুলিকে পরিবেশ দুষিত করে, সেগুলিকে আলাদা করো। পবিবেশ কীভাবে দুষিত হচ্ছে তা চিত্রের সাহায্যে দর্শিয়ে একটা চার্ট প্রস্তুত করে বিদ্যালয়ে আনো।

•••

তৃতীয় অধ্যায়

অম্ল, ক্ষার ও লবণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমরা লেবু, নুন, চিনি, তেঁতুল, ভিনিগারের মতো পদার্থ ব্যবহার করি। এসবের স্বাদ তোমাদের একইরকম লাগে কি? তাহলে সারণী ৩.১-এ লেখা বিভিন্ন খাদ্য পদার্থের স্বাদ মনে করো। যেটিকে তুমি চাখোনি, তা চাখো এবং সারণী পূরণ করো।

সাবধান!
তোমাদের না বলা কোনো পদার্থকে ছুঁতে বা তার স্বাদ চাখার চেষ্টা করো না। ও সব অজানা পদার্থ আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

সারণী ৩.১: বিভিন্ন পদার্থ ও সেগুলির স্বাদ

পদার্থ	স্বাদ (টক / মিষ্টি / নোনতা / ক্ষারীয় / অন্যকিছু)
লেবুর রস	
কমলা রস	
ভিনিগার	
সাধারণ লবণ	
দই	
তেঁতুল	
চিনি	
আমলকী	
খাবার সোডা	
আঙুর	
কাচা আম	

৩.১ অম্ল ও ক্ষার

লেবুর রস, কমলা রস, ভিনিগার ও দই-এর স্বাদ টক, এসব পদার্থ চাখলে টক লাগার কারণ এর মধ্যে অম্ল আছে। এসব প্রাকৃতিক পদার্থের রাসায়নিক গুণ অম্লীয়। অম্ল শব্দটি এক ল্যাটিন শব্দ 'অ্যাসিডস' থেকে এসেছে। যার অর্থ টক।

কিন্তু খাবার সোডার স্বাদ টক নয়। কারণ এর মধ্যে অম্ল নেই। ইহা ক্ষার লাগে। ইহাকে দু আঙুলে ঘষলে চিকচিক (Soapy) করে। এভাবে আঙুল চিকচিক করাটা ক্ষারীয় স্বাদযুক্ত পদার্থকে ক্ষারক বলা হয়।

আমরা স্বাদ চাখতে না পারা পদার্থগুলির প্রকৃতি জানব কী করে? কোনো পদার্থের অম্লীয় বা ক্ষারকীয় গুণকে জানার জন্যে কয়েকটি বিশেষ পদার্থ ব্যবহৃত হয়, এগুলিকে সূচক বলা হয়। এই সূচক পদার্থে সংস্পর্শে এলে অম্লীয় কিংবা ক্ষারীয় পদার্থের রং বদলে যায়। লিটমাস, হলুদ, জবাফুলের মতো কয়েকটি সূচক প্রাকৃতিক।

তোমরা জানো কি?

অম্লের নাম	প্রাকৃতিক উৎস
এমিটিক অম্ল	ভিনিগার
ফরমিক অম্ল	পিঁপড়ে, ডেঁওপিঁপড়ে, মৌমাছির হুল
সাইট্রিক অম্ল	কমলা, লেবু
ল্যাকটিক অম্ল	দই
অকজলিক অম্ল	পালং শাক
অমকরবিক অম্ল (ভিটামিন সি)	আমলকী
টারটারিক অম্ল	তেঁতুল, আঙুর, কাঁচা আম
ক্ষারের নাম	**উৎস**
ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড	চুনের জল
অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড	কাপড় কাচার সোডা
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	সাবান
পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড	প্রতিঅম্ল
ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড	বটিকা

৩.২ প্রাকৃতিক সূচক (Natural Indicator)

লিটমাস:

লিটমাসকে এক মুখ্য প্রাকৃতিক সূচকভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি লাইকেন থেকে প্রস্তুত হয়। পাতিত জলে ইহার পাটল অম্লীয় দ্রবণে মিশলে এর রং লাল এবং ক্ষারীয় দ্রবণে মিশলে এর রং নীল হয়। এটা দ্রবণ কিংবা কাগজ খণ্ডরূপে পাওয়া যায়। এই কাগজকে লিটমাস কাগজ বলা হয়। যেমন: লাল লিটমাস কাগজ ও নীল লিটমাস কাগজ।

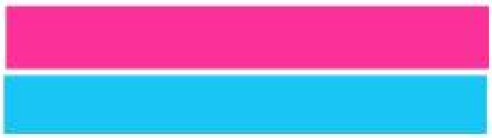

চিত্র ৩.১: লাল ও নীল লিটমাস কাগজ

তোমাদের জন্যে কাজ ৩.১

- লেবুর রসে কিছুটা জল মিশিয়ে একটা কাচের পাত্রে রাখো।
- একটা লাল লিটমাসের কাগজের উপরে এই লেবুর জল একফোঁটা ফেলো। লিটমাস কাগজের রং বদলাচ্ছে কী?
- সেরকম একটা নীল লিটমাসের কাগজের উপর একফোঁটা লেবুর রং ফেলো। লিটমাস কাগজের রং বদলাচ্ছে কি?

কোনটাতে রং বদলাচ্ছে লিখে রাখো।

তারপর কলের জল, সাবান জল, শ্যাম্পু, নুনের জল, চিনির জল, কাপড়কাচার সোডার জল, চুনের জল ও পাতিত জল, লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে পরীক্ষা করে দেখো। তোমরা যা দেখলে সারণী ৩.২-এ লেখো।

সারণী ৩.২

ক্রমিক নং	দ্রবণের নাম	লাল লিটমাসের প্রভাব	নীল লিটমাসের প্রভাব	সিদ্ধান্ত
১.	কলের জল			
২.	সাবান জল			
৩.	শ্যাম্পু			
৪.	নুনের জল			
৫.	চিনির জল			
৬.	কাপড় কাচার সোডার জল			
৭.	চুন জল			
৮.	পাতিত জল			

সারণীতে দেওয়া পদার্থগুলির মধ্যে যেখানে কোনো লিটমাসের রং বদলাল না, তাকে প্রশমিত (Neutral) দ্রবণ বলা হয়। এই দ্রবণ অম্ল নয় কি ক্ষার নয়।

মনে রাখো:

চুনের জল প্রস্তুত করার জন্যে একটা পাত্রে জল নিয়ে অল্প কিছু চুন দাও। একে ঘাঁটো ও কিছু সময়ের জন্যে রেখে দাও। পাত্রের তলায় চুন বসে যাবে ও পরের স্বচ্ছ জল অন্য এক পাত্রে ঢেলে দাও। এটাই চুনের জল।

অম্লীয় দ্রবণে নীল লিটমাস চিত্র ৩.২ ক্ষারীয় দ্রবণে লাল লিটমাস

হলুদ:

হলুদকে একটি প্রাকৃতিক সূচকভাবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষারীয় দ্রবণ মিশলে এর হলুদ রং বদলে লাল হয়ে যায়।

তোমাদের জন্যে কাজ ৩.২

বড় একটা চামচ হলুদ গুঁড়োতে অল্প জল মিশিয়ে ঘন দ্রবণ তৈরি করো।

ব্লটিং কাগজে এই দ্রবণ ঢেলে শুকিয়ে নাও।

এই হলুদ রঙা কাগজের উপর একফোঁটা সাবানজল ফেলো। কী দেখলে?

সারণী ৩.৩-এ পাওয়া অন্য দ্রবণগুলির সঙ্গে এই হলুদ রঙা কাগজের রং কীভাবে বদলাচ্ছে লক্ষ করো।

সারণী ৩.৩

ক্রমিক নং	দ্রবণের নাম	হলুদ দ্রবণের পরিবর্তন	মতামত
১	লেবুর রস		
২	কমলার রস		
৩	ভিনিগার		
৪	চুনের জল		
৫	চিনির জল		
৬	নুন জল		
৭	খাবার সোডার জল		
৮	কাপড়কাচা সোডার জল		

এই রকম বিভিন্ন আকারের হলুদ কাগজ তৈরি করে তার উপর সাবান জলে তুলো লাগানো কাঠির সাহায্যে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করো।

তোমার বন্ধুর জন্মদিনের জন্যে সুন্দর অভিনন্দনপত্র একটা প্রস্তুত করো।

জবাফুল:

জবাফুলের পাপড়ি থেকে প্রস্তুত দ্রবণকে এক সূচকভাবে ব্যবহার করা হয়। এই সূচক অম্লীয় দ্রবণে মিশলে গাঢ় গোলাপি রং (Dark Pink) এবং ক্ষারীয় দ্রবণের সঙ্গে মিশলে সবুজ রং হয়ে যায়।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৩.৩

কিছু জবাফুলের পাপড়ি এনে কাচের গ্লাসে রাখো। এর মধ্যে অল্প গরম জল মিশিয়ে লাল রং হওয়া পর্যন্ত রাখো। এই রঙিন দ্রবণ এক সূচক। তাই লেবুর রসও চুনের জলের সঙ্গে পৃথকভাবে মেশাও। কী দেখছ?

সারণী ৩.৪-এ দেওয়া প্রত্যেক দ্রবণে এই সূচক মেশাও এ পরিবর্তন লক্ষ করো।

সারণী ৩.৪

ক্রমিক নং	দ্রবণের নাম	মূল রং	জবাফুলের দ্রবণের সঙ্গে মেশার পর রং
১	লেবুর রস		
২	শ্যাম্পু		
৩	ভিনিগার		
৪	সোডার জল		
৫	চিনির জল		
৬	নুনের জল		

চিত্র: ৩.৩ (ক) জবাফুল, এর থেকে প্রস্তুত দ্রবণ (খ) অম্লীয় ও ক্ষারীয় পদার্থের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া।

তোমরা জানো কি?

* বৃষ্টির জলে অত্যধিক অম্ল থাকলে একে অম্লবৃষ্টি (Acid Rain) বলা হয়। এইসব অম্ল কোথা থেকে আসে? বায়ুমণ্ডলে থাকা প্রদূষক অঙ্গারকাম্ল, সালফার ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে যথাক্রমে কার্বনিক অম্ল, গন্ধকাম্ল ও নাইট্রিক অম্লে পরিণত হয়। এই সব অম্ল মেশা জল, পাকাঘর, গাছপালা ও প্রাচীনকীর্তি এমনকি তাজমহলেরও ক্ষতিসাধন করে।
* আমাদের শরীরের কোষে একটি অম্ল আছে। যার নাম ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অম্ল (DNA), ইহা আমাদের শরীরের আকৃতি, উচ্চতা, চোখের রং প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরের কোষ গঠনে আবশ্যকীয় অ্যামাইনো অম্ল (Amino Acid) এবং স্নেহসারের স্নেহাম্ল (Fatty Acid) রয়েছে।

পরীক্ষণ:

শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীকে অনুরোধ সারণী ৩.৫-এ দেওয়া দ্রবণগুলিকে পৃথকভাবে লিটমাস কাগজে হলুদ কাগজ ও জবাফুল দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে এর প্রভাব বাচ্চাদেরকে শ্রেণীগৃহে দেখাবেন। বাচ্চারা সেসব লিখে রাখবে।

সাবধান:

বিভিন্ন অম্ল ও ক্ষার ব্যবহারের সময়ে অধিক সতর্ক থাকা আবশ্যক। কারণ এসবের প্রকৃতি ক্ষয়কারী (Corrosive) ও চামড়ার জন্যে ক্ষতিকারক।

সারণী ৩.৫

ক্রমিক নং	দ্রবণের নাম	লিটমাস কাগজে প্রভাব	হলুদ কাগজে প্রভাব	জবাফুলের দ্রবণের প্রভাব
১.	লঘু লবণাম্ল			
২.	লঘু গন্ধকাম্ল			
৩.	লঘু নাইট্রিট অম্ল			
৪.	লঘু অ্যাসেটিক অম্ল			
৫.	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড			
৬.	অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড			
৭.	ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড (চুনজল)			

৩.৩ প্রশমনীকরণ (Neutralisation)

এক অম্লীয় দ্রবণ ও ক্ষারীয় দ্রবণ পরস্পর মিশলে প্রশমিত হয়। এর দ্বারা অম্লের অম্লীয় প্রকৃতি ও ক্ষারকের ক্ষারীয় প্রকৃতি লোপ পেয়ে যায়। এই প্রশমন প্রক্রিয়ায় এক নতুন পদার্থ ও তাপ সৃষ্টি হয়। এই পদার্থকে লবণ বলা হয়। লবণ অম্লীয়, ক্ষারীয় কিংবা প্রশমিত হতে পারে।

অম্ল ও ক্ষারের মধ্যে প্রতিক্রিয়াকে প্রশমনীকরণ বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর সঙ্গে তাপ উৎপন্ন হয়।

অম্ল + ক্ষারক $\longrightarrow$ লবণ + জল (উৎপাদিত তাপ)

লবণাম্ল (Hcl) + সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaoH) $\longrightarrow$ খাওয়ার নুন (Nacl) + জল (H_2O)

দৈনন্দিন জীবনে প্রশমনীকরণ

বদহজম:

আমাদের পাকস্থলীতে থাকা লবণাম্ল খাদ্য হজমের সহায়ক হয়। এই অম্ল অধিক মাত্রায় ক্ষরিত হলে খাদ্য বদহজম হয়ে খুব কষ্টদায়ক হয়। প্রতিঅম্ল (Antacid) খেয়ে ইহাকে প্রশমিত করা হয়।

পিঁপড়ে কামড়ালে:

একটা পিঁপড়ে কামড়ালে আমাদের চামড়ায় ফর্মিক অম্লের মতন, আম্লীয় পদার্থে এসে পীড়া প্রদান করে। এর উপর খাবার সোডা কিংবা কালামিন দ্রবণ ঘষলে ইহা প্রশমিত হয়।

শিল্প আবর্জনা:

শিল্প আবর্জনা জলে মিশলে এর মধ্যে থাকা অম্ল জলকে প্রদূষিত করে। মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবদের জন্যে ইহা ক্ষতিকারক। তাই প্রথমে ক্ষারক প্রয়োগ করে কারখানা থেকে নির্গত জল প্রশমিত করা হয়।

৩.৪ বদহজমি রোগী

৩.৫ শিল্প আবর্জনা

কী শিখলে ?

- অম্লের স্বাদ টক। ক্ষারের স্বাদ ক্ষারীয় ও লবণের স্বাদ নোনতা।
- অম্ল নীল লিটমাসকে লাল করে, ক্ষার লাল লিটমাসকে নীল করে।
- যে পদার্থ অম্ল কিংবা ক্ষার নয় তাকে প্রশমিত পদার্থ বলা হয়।
- অম্ল ও ক্ষারকে চেনার জন্যে ব্যবহৃত পদার্থকে সূচক বলা হয়।
- অম্ল ও ক্ষার মিশলে, উভয়ে প্রশমিত হয়ে লবণ সৃষ্টি হয়। লবণ আম্লীয়, ক্ষারীয় কিংবা প্রশমিত পদার্থ হতে পারে।

অভ্যাস

১. তিনটি করে অম্লীয় ও ক্ষারীয় পদার্থর নাম লেখো।

২. অম্ল ও ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

৩. লিটমাস কাগজ কীভাবে প্রস্তুত হয়? কোন্ ব্যবহারে লাগে?

৪. প্রশমনীকরণ কী? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৫. চুনের জন অম্লীয়ঙ্খ ক্ষারীয়ঙ্খ প্রশমিত কী? তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে?

৬. তুমি নতুন বছরে তোমার বন্ধুর কাছে অভিনন্দনপত্র পাঠাতে চাইছ। এক সূচক পদার্থের মাধ্যমে অভিনন্দন পত্রটি কীভাবে প্রস্তুত করবে?

৭. লাল লিটমাস ও নীল লিটমাস কাগজে একটা দ্রবণ ফেলায় কোনো পরিবর্তন হল না। দ্রবণটি কোন্ প্রকৃতির দর্শাও।

৮. প্রথম শব্দদ্বয়ের সম্পর্ক দেখে তৃতীয় শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দটি লেখো।

(ক) চুনের জল: ক্ষারক :: পাতিত জল: ——

(খ) তেঁতুল:: টারটারিক অম্ল : দই: ——

(গ) নীল লিটমাস লাল : অম্ল :: লাল লিটমাসকে নীল : ——

(ঘ) প্রতি অম্ল : বদহজম :: কালামিন : ——

৯. কারণ দর্শাও:

(ক) শিল্প আবর্জনা জলের স্রোতে মেশার পূর্বে ইহাকে প্রশমিত করা জরুরি।

(খ) তোমার বদহজম রোগ হলে প্রতিঅম্ল বটিকা খাও।

(গ) বাসি পান্তাভাত টক লাগে।

১০. কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি ভুল চেনাও।

(ক) পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড লাল লিটমাসকে নীল করে।

(খ) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সহ লবণাম্ল মিশলে পরস্পর প্রশমিত হয়ে লবণ ও জল সৃষ্টি করে।

(গ) নাইট্রিক অম্ল লাল লিটমাসকে নীল করে।

(ঘ) ক্ষারক বেশি হলে দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা হয়।

(ঙ) লেবুর রসে অধিক পরিমাণে অ্যাসিটিক অম্ল থাকে।

১১. তোমাকে তিনটি বোতলে লবণাম্ল, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও চিনির জল পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। তোমার কাছে সূচকভাবে জবাফুলের পাপড়ির দ্রবণ আছে। তুমি তাদের কীভাবে চিনবে?

ঘরে করার জন্যে কাজ:

১. তোমাদের অঞ্চলের কিছু মাটির নমুনা এনে ইহা আম্লীয়, ক্ষারীয় কিংবা প্রশমিত তার প্রকৃতি নিরূপণ করো। কৃষকদের সঙ্গে এই মাটির গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

২. একজন ডাক্তারকে সাক্ষাৎ করে বদহজম রোগের সম্বন্ধে অলোচনা করো। এটা কীভাবে নিরাকরণ হবে? তার জিজ্ঞাসা করে বোঝো

●●●

চতুর্থ অধ্যায়

তন্তু থেকে বস্ত্র

৪.১ প্রাণী ও উদ্ভিদের তন্তু:

মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে অন্য এক মৌলিক আবশ্যকতা হচ্ছে বস্ত্র। তন্তু জাতীয় পদার্থ থেকে বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তন্তু জাতীয় পদার্থ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে ও প্রাণীদের কাছে উপলব্ধ হয়ে থাকে। উদ্ভিদজাত তন্তুর বিষয়ে তোমরা পূর্ব শ্রেণীতে পড়েছ। সেরকম পশম ও রেশম তন্তু কতক প্রাণীর কাছে উপলব্ধ হয়। ভেড়া, চমরী গরুর মতো কিছু প্রাণীর লোম থেকে উল বা পশম পাওয়া যায়। রেশমকীটের গুটি থেকে সিল্ক বা রেশম পাওয়া যায়। তোমরা জানো কি, সোয়েটার বোনার জন্যে আমাদের বাজার থেকে কেনা উল এই তন্তু থেকে কীভাবে তৈরি হয়। রেশমকীটের গুটি থেকে রেশম বের করে এর থেকে কীভাবে সিল্কের কাপড় বোনা হয়?

এসো, আমরা এই অধ্যায়ে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করব।

৪.২ পশম (উল):

ভেড়া, ছাগল, চমরী গরু অন্য কিছু পশুদের লোম থেকে পশম পাওয়া যায়। এসব প্রাণীদের ঘন লোম শরীরকে গরম রাখে। ভেড়ার শরীরে দুপ্রকার লোম থাকে। যথা: মোটা লোম ও নরম চর্ম লোম। নরম ও পাতলা লোমের থেকে পশম তন্তু পাওয়া যায়। কয়েক জাতের ভেড়ার কেবল নরম লোম থাকে। আজকাল বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে কেবল উন্নত মানের নরম লোম থাকা ভেড়া সৃষ্টি করা যেতে পারছে। এই প্রক্রিয়াকে 'মনোনীত প্রজনন' বলা হয়।

চিত্র ৪.১ : লোমশ ভেড়া

আমাদের দেশের রাজ্যগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভেড়া দেখা যায়। সারণী ৪.১-এ তা দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৪.১
কয়েক জাতের ভারতীয় ভেড়া

ক্রমিক নং	জাতের নাম	পশমের প্রকার	পাওয়া যাওয়া নাম
১	লোহি	উন্নতমানের পশম	রাজস্থান পঞ্জাব
২	রসশূরবর্মী	ধূসর লোম	উত্তরপ্রদেশ হিমাচলপ্রদেশ
৩	লাল	গালিচা পশম	রাজস্থান হরিয়ানা
৪	বাসাব্বাল	শাল, পশম	জম্মু কাশ্মীর
৫	মারত্বারি	মোটা পশম	গুজরাট —
৬	পতনত্বাদি	মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি	গুজরাট —

বাজারে পাওয়া পশমগুলি অধিকাংশ ভেড়ার লোম থেকে প্রস্তুত। অন্য কিছু পশুদের লোমেও পশম পাওয়া যায়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল যথা লাদাখ অঞ্চলের চমরী গরুর লোম থেকেও পশম পাওয়া যায় (চিত্র ৪.২)। জম্মু ও কাশ্মীরে পাওয়া অঙ্গরা পশম, অঙ্গরা ছাগল (চিত্র ৪.৩) এর লোম থেকে তৈরি। কাশ্মীরি ছাগলের (চিত্র ৪.৪) লোম খুব নরম। এর থেকে তৈরি শালকে 'কশ্মিনা শাল' বলা হয়। উটের (টিত্র ৪.৫) লোম থেকেও পশম প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা লামা ও আলপাকার (চিত্র ৪.৬, ৪.৭) লোম থেকে পশম প্রস্তুত হয়।

চিত্র ৪.২ চমরী গরু

চিত্র ৪.৩ অঙ্গরা ছাগল

চিত্র ৪.৪ কাশ্মীরি ছাগল

চিত্র ৪.৫ উট

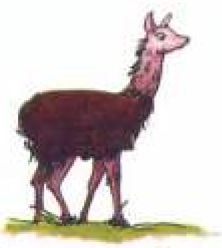

চিত্র ৪.৬ লামা চিত্র

চিত্র ৪.৭ আলপাকা।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৪.১

যে প্রাণীদের লোম থেকে পশম প্রস্তুত হয়, তাদের ছবি সংগ্রহ করে তোমার খাতায় লাগাও। যে ছবি সংগ্রহ করতে পারলে না বই দেখে তা নিজে আঁকো।

তোমাদের জন্য কাজ: ৪.৬

পৃথিবীর বিভিন্ন মুখ্য পশম উৎপাদনকারী দেশ ও কোন্ প্রাণীর থেকে সেখানে পশম পাওয়া যায় লেখো।

পশম পাওয়ার জন্যে মুখ্যত ভেড়া পালন করা হয়। তাদের লোম থেকে পশম প্রস্তুত করা হয়। এসো, ভেড়া পালন ও পশম প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে জানব।

মেষ পালন:

তোমরা যদি জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, অরুণাচলপ্রদেশ ও সিকিমের পাহাড়ি এলাকায় কিংবা হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাটের সমতল অঞ্চলে বেড়াতে যাবে ভেড়ার বা মেষের পাল দেখে থাকবে। মেষরা তৃণভোজী। তারা ঘাস পাতা খেতে ভালোবাসে। এছাড়া বিভিন্ন শস্য, ডাল, চোপরা, জব ও খোলের সঙ্গে কিছু নুন মিশিয়ে এদের খেতে দেওয়া হয়। শীতকালে ভেড়াদের ঘরে রেখে পাতা, শস্যদানা ও শুকনো খড় খেতে দেওয়া হয়।

লোমের থেকে পশম প্রস্তুতি:

ভেড়ার লোম বিভিন্ন সোপানে উপলব্ধ করে পশম উৎপাদন হয় ও তার থেকে শীতের পোশাক ও চাদর বোনা হয়।

প্রথম সোপান:

প্রথমে ভেড়ার বর্ধিত লোমকে গোড়া থেকে কেটে দেওয়া হয়, (চিত্র ৪.৮ (ক))। এই কাজ গ্রীষ্ম ঋতুতে করা হয়ে থাকে। সেই জন্যে শরীরে লোম না থাকলেও ভেড়ার বিশেষ অসুবিধে হয় না।

দ্বিতীয় সোপান:

এই সোপানে কাটা হয়ে থাকা লোমকে একটা বৃহৎ পাত্রে রেখে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়, (চিত্র ৪.৮ (খ))। এর দ্বারা লোমে লেগে থাকা ধুলো, ময়লা ও তেলতেলে পদার্থ সব বেরিয়ে যায়। এই পরিষ্কার করার কাজ আজকাল মেশিন দ্বারা করা হচ্ছে, (চিত্র ৪.৮ (গ))

তৃতীয় সোপান:

এরপর লোম পরিষ্কার করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লোম আলাদা করে সাজিয়ে রাখা হয়।

চতুর্থ সোপান:

সব লোম থেকে খুব ছোট ছোট লোমগুলিকে আলাদা করা হয়। তোমরা পরে থাকা সোয়েটারে মাঝে মাঝে খুব ছোট লোম থাকা লক্ষ করে থাকবে। ছোট লোমগুলিকে বাদ দেওয়ার পর তন্তুকে আবার সাজিয়ে রাখা হয়। এখন পশম তন্তু প্রস্তুত হয়ে গেল।

পঞ্চম সোপান:

ছাগল, ভেড়ার লোমে প্রাকৃতিক রং সাধারণত কালো, সাদা কিংবা বাদামি হয়। এই শুকনো তন্তুকে আবশ্যকতা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়।

ষষ্ঠ সোপান:

শেষ সোপানে তন্তুগুলিকে সোজা করে গুটিয়ে গুটিয়ে সুতো কাটা হয়, (চিত্র ৪.৮ (ঘ))। সুতো কাটার পর লম্বা তন্তুগুলিকে সোয়েটার বোনার জন্যে এবং ছোট তন্তুগুলিকে কাপড় বোনার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৪.৮ (ক) ভেড়ার লোম কাটা

চিত্র ৪.৮ (খ) বড় পাত্রে লোম পরিষ্কার করা

চিত্র ৪.৮ (গ) মেশিন দ্বারা লোম পরিষ্কার করা

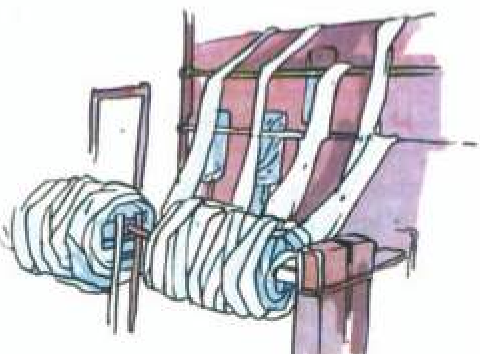

চিত্র ৪.৮ (ঘ) সুতো কাটা

চিত্র ৪.৮ লোমের থেকে পশম প্রস্তুতি

বৃত্তিগত সংকট:

পশম শিল্পে কাজ করে আমাদের দেশের বহু লোক জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু এর তন্তুর থেকে পশম প্রস্তুতির সময়ে তন্তুকে পরিষ্কার করা, পৃথক করে সাজানো এবং খুব ছোটি লোমকে আলাদা করে শুকনোর সময়ে, এতে কার্যরত কর্মচারী আনথ্রাক্স রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। এটি একটি রক্তজনিত রোগ।

তোমাদের জন্যে কাজ:

ভেড়ার লোম থেকে প্রস্তুত পশম বস্ত্র ব্যবহারের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তর্কসভায় আলোচনা করো।

তুমি জানো কি?

ভেড়ার লোম থেকে পশম উৎপাদনের জন্যে অধিকাংশ সংখ্যক মেষ পালন ক্ষেত্রে চিন প্রথম, অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ও ভারতের স্থান তৃতীয়। তবে নিউজিল্যান্ডে সব থেকে উন্নত মানের পশম পাওয়া যায়।

৪.৩ রেশম (সিল্ক) :

রেশম পোকার গুটি থেকে রেশম প্রস্তুত হয়। রেশম তন্তু পাওয়ার জন্যে এই কীট পালনকে 'রেশম চাষ' বলা হয়। প্রাকৃতিক পদার্থে তৈরি পোশাকদের মধ্যে রেশমের স্থান স্বতন্ত্র। তোমার মা, মাসি কিংবা ঠাকুরমায়ের পরা রেশমি শাড়ি লক্ষ করো। বিভিন্ন প্রকারের রেশমজাত পোশাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বোঝো।

রেশম উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে রেশম পোকার জীবনচক্র সম্বন্ধে জানা একান্ত আবশ্যক।

রেশম পোকার জীবনচক্র:

মাদী রেশম পোকা ডিম দেয়। এই ডিমজাত লার্ভাকে শূককীট বা রেশমকীট বলা হয়। এই কীট আকৃতিতে বাড়ে। লার্ভার পরের অবস্থাকে পিউপা বলে। পিউপা অবস্থায় প্রবেশ করার পর্বে লার্ভা প্রথমে তার চারদিকে এক জাল বোনে। এই সময় লার্ভাটি তার মাথাকে ইংরেজি 8-এর আকৃতিতে ঘুরিয়ে থাকে এবং পুষ্টিসারযুক্ত তন্তু ক্ষরণ করে। সেই তন্তু বায়ুর সংস্পর্শে এসে রেশম তন্তুতে পরিণত হয়। রেশমকীট খুব কম সময়ের মধ্যে নিজের চারদিকে এক আবরণ প্রস্তুত করে ও পিউপায় পরিণত হয়। এই তন্তুর আবরণকে 'গুটি' বলা হয়। গুটির মধ্যে পিউপা ক্রমশ বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ রেশম পোকায় পরিণত হয়।

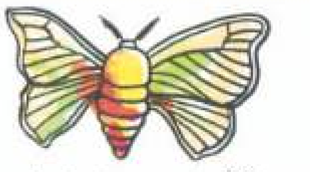

(ক) পুরুষ রেশমকীট

(খ) মেয়ে রেশমকীট

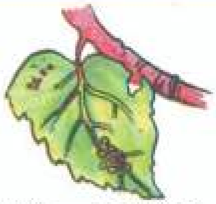

(গ) তুঁতের (পাট) পাতায় কীটের ডিম

(ঘ) লার্ভা

(ঙ) গুটির মধ্যে পিউপা

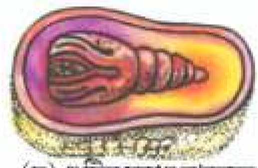

(চ) গুটির মধ্যে বাড়তে থাকা পিউপা

চিত্র রেশম পোকার জীবনচক্র।

রেশম পোকার গুটির থেকে রেশম তন্তু পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের রেশম তন্তুর থেকে বিভিন্ন ধরনের সুতো বেরোয়। যথা: তুঁত, তসর, ইরি ও মুগা, ওড়িশার তুঁতকে পাট, তসরকে মঠা ইরিকে এন্ডি ও মুগাকে মুগা বলা হয়। তুঁত রেশম পোকা সবথেকে অধিক চাষ করা হয়। পোকার গুটি থেকে বেরোতে থাকা রেশম তন্তু অত্যন্ত নরম, নমনীয় ও মসৃণ। এই রেশম সুতোকে বিভিন্ন রং সহজেই দিতে পারা যায়।

রেশম পোকা পালন ভারতের এক পুরাতন বৃত্তি। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারতে অনেক রকমের সুন্দর রেশমবস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। আমাদের রাজ্য ওড়িশায় বহু আদিবাসী পরিবার রেশম চাষ করে উপকৃত হচ্ছেন।

রেশম চাষ এক লাভজনক কুটির শিল্প। কৃষিকার্যের সঙ্গে রেশম চাষ অতি সফলতার সঙ্গে করা যেতে পারায় গ্রামাঞ্চলে গরিব লোকেদের আর্থিক মানদণ্ডের উন্নতিকল্পে রেশম চাষকে লোকপ্রিয় করা আবশ্যক। রেশম চাষের জন্যে বিশেষ কিছু বৈষয়িক জ্ঞান কৌশল, অধিক মূল্যবান কিংবা বিদ্যুৎ শক্তির আবশ্যকতা নেই। তাই যে কোনো দুর্গম অঞ্চলে এই চাষ সফলতার সঙ্গে করা যেতে পারবে।

রেশম পোকা পালনে ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনে স্ত্রীলোকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুটি থেকে নরম রেশম তন্তু বের করে একে পর্যায়ক্রমে রেশম সুতোয় পরিণত করার কাজ স্ত্রী লোকেদের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ইহার দ্বারা আমাদের দেশে ও রাজ্যের অর্থনীতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রেশম উৎপাদন ক্ষেত্রে চিনের স্থান প্রথম ও ভারত দ্বিতীয়।

তোমাদের জন্যে কাজ ৪.৪

বিভিন্ন প্রকারের রেশম সুতো সংগ্রহ করে তোমাদের খাতায় পৃথকভাবে লাগাও। মা, মাসি, শিক্ষক কিংবা অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তায় এই সুতোর মধ্যে তুঁত, তসর, ইরি ও মুগা রেশমকে চিহ্নিত করো। অন্য তন্তু থেকে প্রস্তুত সুতোর সঙ্গে ইহার তুলনা করো। বিভিন্ন প্রকার রেশম গুটির ছবি সংগ্রহ করে লাগাও।

তোমাদের জন্যে কাজ ৪.৫

কৃত্রিম তন্তুতে প্রস্তুত রেশম সুতো ও একটা আসল রেশম সুতো নাও। সাবধানতার সঙ্গে সুতো দুটিকে একটার পর একটা পুড়িয়ে দাও। এই দুটি সুতোর পোড়া গন্ধের মধ্যে কিছু পার্থক্য বুঝতে পারছ কি? সেরকম একটা পশম সুতো নিয়ে সাবধানে পুড়িয়ে দাও। পুড়ে যাওয়ার পর কিছু ভৌতিক পরিবর্তন লক্ষ করছ কি? কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক তন্তুর পোড়া গন্ধ এক রকম কি? তোমার উত্তরের কারণ দর্শাও।

তুমি জানো কি?

আজকাল বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে কৃত্রিম রেশম সুতো উৎপাদন করা হচ্ছে। তার থেকে বিভিন্ন প্রকারের পোশাক তৈরি করা হচ্ছে।

তোমাদের জন্যে কাজ ৪.৬

রেশম পোকার বিভিন্ন অবস্থার ছবি সংগ্রহ করে জীবনচক্রের অবস্থা অনুযায়ী বৃত্তাকারে লাগাও। প্রত্যেক অবস্থার নাম লিখে তিরচিহ্নের মাধ্যমে রেশম পোকার জীবনচক্র অঙ্কন করো। তোমার নিজের ভাষায় ইহার জীবনচক্র বর্ণনা করো।

গুটি থেকে রেশম:

রেশম পাওয়ার জন্যে রেশমকীট পালন করে, তাদের গুটি সংগ্রহ করা হয় ও তার থেকে রেশম সুতো বের করা হয়।

রেশমকীট পালন:

একটা মেয়ে রেশম পোকা একবারে শতাধিক ডিম দেয় (চিত্র ৪.১০ (ক))। এই ডিমগুলিকে কাগজ কিংবা কাপড়ের থলে যত্নের সঙ্গে গুছিয়ে রাখা হয় এবং রেশম চাষিকে বিক্রয় করা হয়। চাষিরা এই ডিমগুলিকে উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় স্বাস্থ্যপ্রদ অবস্থায় রাখেন। অধিক উষুম অবস্থায় এই ডিম থেকে লার্ভা জাত হয়। তুঁতগাছে (চিত্র ৪.১০ (খ)) পাতা কচি থাকার সময় এই লার্ভা জাত করা হয়। এই লার্ভাকে আমরা শূক কিংবা রেশমকীট বলে থাকি। এরা দিনরাত কচি তুঁতে পাতা খেয়ে (চিত্র ৪.১০ (গ)) আকারে খুব বড় হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাদের বাঁশের ডালায় রেখে সদ্যোজাত কচি তুঁতে পাতা খেতে দেওয়া হয়। ২৫ থেকে ৩০ দিন পর কীট এই পাতা খাওয়া বন্ধ করে একটা ক্ষুদ্র বাঁশের প্রকোষ্ঠের মধ্যে গিয়ে সেখানে গুটি (চিত্র ৪.১০ (ঘ)) প্রস্তুত করে। গুটিটি কোনো ছোটি বাঁশের ডালার সঙ্গে লেগে থাকে। গুটির মধ্যে রেশম কীটটি জ্বাল বোনে শেষে রেশম পোকায় পরিণত হয়।

চিত্র ৪.১০ রেশমকীট পালন

রেশম আবিষ্কারের সঠিক সময় এ পর্যন্ত জানা নেই। এক পুরানো চিনা লোককথা অনুযায়ী রাজা হুয়াঙ টি একবার তার তুঁতে গাছের পাতা নষ্ট হওয়ার কারণ অন্বেষণ করতে একজন পরিচারিকাকে বললেন। পরিচারিকাটি দেখল যে একরকম সাদা কীট তুঁতে পাতাগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তারপর এর চারদিকে এক চকচকে গুটি তৈরি করা সে লক্ষ করল। একবার আকস্মিকভাবে সূক্ষ্ম সুতো বেরোল। এর পর থেকে চিনে রেশমশিল্প আরম্ভ হল এবং শ'য়ে শ'য়ে বছর অবধি এর রহস্য চিনেই আবদ্ধ হয়ে থাকল। পরে পরে ব্যবসায়ী ও যাত্রীদের দ্বারা রেশম অন্য দেশে পরিচিত হল। যে মুখ্য পথ দিয়ে চিন থেকে সাধারাণত রেশম ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দেশে এই ব্যবসায় চালু রেখেছিল, তাকে 'রেশমপথ' বলা হয় (Silk Route)।

রেশম উৎপাদন:

অনেকগুলো বুটি সংগ্রহ করে রাখা হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকাটি গুটি থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে গুটিগুলিকে রোদে শুকিয়ে কিংবা ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলা হয়। নচেৎ পোকাটি নিজে খোসাটিকে কেটে বাইরে বেরিয়ে আসার দ্বারা সমস্ত রেশমসুতো খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। খোসার থেকে রেশমসুতো বের করা হয়। এই সুতো কাটার পর তাঁতিদের দ্বারা কাপড় বোনা হয়।

কী শিখলে ?

- পশম ও রেশম হচ্ছে প্রাণীজ তন্তু। ভেড়া ছাগল ও চমরী গরুর লোম থেকে পশম পাওয়া যায়। এবং রেশমকীটের গুটি থেকে রেশম পাওয়া যায়।
- উট, লামা ও আলপাকার লোম থেকেও পশম পাওয়া যায়।
- ভারতে পশমের জন্যে মুখ্যত ভেড়া পালন করা হয়।
- ভেড়ার লোমকে শরীর থেকে কেটে বের করা হয়। এরপর একে পরিষ্কার করে বড় ছোটি লোম পৃথক করে খুব ছোটি লোমকে বের করে দিয়ে শুকিয়ে রং দিয়ে সুতো কাটা হয় ও কাপড় বোনা হয়।
- রেশম পোকার শূককীটকে রেশমকীট বলা হয়।
- রেশম তন্তু একপ্রকার পুষ্টিসার থেকে প্রস্তুত।
- রেশমগুটি থেকে রেশম তন্তু বের করে তার থেকে সুতো কাটা হয়।
- তাঁতিরা রেশম সুতো থেকে রেশম কাপড় বোনে।

অভ্যাস

১. কোনটি ঠিক? রেশমকীট এক—

(ক) লার্ভা (খ) শূককীট (গ) লার্ভা ও শূককীট (ঘ) লার্ভাও নয় শূককীটও নয়

২. কোনটির থেকে পশম পাওয়া যায় না—

(ক) চমরী গরু (খ) উট (গ) ছাগল (ঘ) লোমশ কুকুর

৩. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) উলের পোশাক ——— তন্তুর থেকে প্রস্তুত হয়।

(খ) সব থেকে উন্নতমানের পশম ——— জাতের ভেড়ার লোমের থেকে পাওয়া যায়।

(গ) কাটা হওয়া লোমকে পরিষ্কার করা দ্বারা এতে লেগে থাকা ধুলো, ময়লা ও ——— পদার্থ বেরিয়ে যায়।

(ঘ) রেশমকীটের — বায়ু সংস্পর্শে এলে, ইহা রেশম সুতোয় পরিণত হয়।

(ঙ) মঠার কাপড় — প্রকার রেশম থেকে প্রস্তুত।

৪. 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের শব্দ মেলাও।

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
তুঁতপাতা	রেশমকীট
শূককীট	এণ্ডি
ইরি	রেশমকীটের খাদ্য
চমরী গরু	তিব্বত ও লাদাখ অঞ্চল

৫. ভেড়ার লোম থেকে পশম প্রস্তুতির নিম্নলিখিত সোপানগুলিকে সঠিকক্রমে সাজাও।

(ক) অতি ছোট লোমগুলিকে আলাদা করা

(খ) লোমকে পরিষ্কার করা

(গ) কাপড় বোনা

(ঘ) সুতো কাটা

(ঙ) বর্ধিত লোমকে কাটা

(চ) তন্তুতে রং দেওয়া

৬. বামপার্শ্বের শব্দদ্বয়ের সম্পর্ককে লক্ষ করে দক্ষিণ পার্শ্বে উপযুক্ত শব্দ লেখো।

(ক) ভেড়ার লোম : পশম :: গুটি : —

(খ) তসর : মঠা :: তুঁত : —

(গ) ভেড়া : ঘাসপাতা :: রেশমকীট : —

৭. (ক) ডিম (খ) পিউপা (গ) লার্ভা (ঘ) রেশমকীট

রেশম পোকার জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থা (ক, খ, গ, ঘ)-কে ঠিক ক্রমে লেখো।

৮. টিপ্পনী লেখো:

(ক) গুটি

(খ) ভেড়ার খাদ্য

(গ) রেশম চাষ

(ঘ) মনোনীত প্রজনন

৯. কোন্‌টি ভুল কোন্‌টি ঠিক চেনাও।

(ক) ভেড়ার মোটা লোমের থেকে ভালো পশম তন্তু পাওয়া যায়।

(খ) শীতের দিনে ভেড়াকে ঘরে রেখে পাতা, দানা, খড় খেতে দেওয়া হয়।

(গ) ছোট পশম তন্তুর থেকে চাদর বোনা হয়।

(ঘ) রেশমকীট তুঁতপাতা খাওয়ার সময়ে লালা ঝরিয়ে গুটি প্রস্তুত করে।

(ঙ) রেশম সুতোয় সোয়েটার বোনা যায় না।

১০. কারণ দর্শাও।

(ক) শীতের দিনে ভেড়ার শরীর থেকে লোম কাটা হয় না।

(খ) দুর্গম অঞ্চলে রেশম চাষ সফলতার সঙ্গে করতে পারা যাবে।

(গ) রেশম উৎপাদনের সময় গুটি থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে রেশম পোকাকে মেরে দেওয়া হয়।

(ঘ) সোয়েটারে মাঝে মাঝে খুব ছোট লোম থাকা লক্ষ করা যায়।

১১. ভেড়ার লোমের থেকে পশম তন্তু কীভাবে প্রস্তুত করা হয়। সোপান ক্রমে বর্ণনা করো।

১২. রেশমকীট জীবনচক্রের প্রবাহের চিত্র অঙ্কন করো।

১৩. রেশমকীট কীভাবে পালন করা হয় লেখো।

১৪. আমাদের রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন কার্যে রেশম চাষের ভূমিকা লেখো।

১৫. তোমাদের তিনপ্রকার পোশাক আছে। সুতির পোশাক, পশমের পোশাক ও রেশমের পোশাক। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ পোশাক পরবে? কারণসহ উত্তর দাও।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

রেশমের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকা ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলের নাম লেখো এবং সেখানে কোন্‌ প্রকারের রেশম বস্ত্র পাওয়া যায় লেখো।

●●●

পঞ্চম অধ্যায়

পোষণ

অণুজীব, প্রাণী ও উদ্ভিদকে নিয়ে জীবজগৎ গঠিত। এই সব জীবদের শরীরে বিভিন্ন প্রকার জীবন প্রক্রিয়া সর্বদা চালু থাকে। বৃদ্ধি, বিকাশ, জনন, রেচন, চলন, পোষণ, শ্বসন ইত্যাদি এই প্রকিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এইসব কাজের জন্যে শক্তি দরকার। শক্তি খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। এই জন্যে সমস্ত জীব খাদ্য খেয়ে থাকে। জীবদের জন্যে খাদ্যের উপাদেয়তা ও খাদ্যে থাকা বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে আমরা আগে জেনেছি।

এসো, এসব কথা আর একবার মনে করি।

৫.১ জীবের জন্যে খাদ্যের উপাদেয়তা:

খাদ্য খেলে কোন্ আবশ্যকতা পূরণ হয় তা জানার জন্যে নিম্ন সারণীটি দেখো। নিজের খাতায় একটা সারণী করে খাদ্য দ্বারা আমাদের আর কোন্ আবশ্যকতা হাসিল হয়ে থাকে লেখো।

সারণী ৫.১

জীবের জন্যে খাদ্যের উপাদেয়তা।
● নতুন কোষ গঠন।
● কার্য করার জন্যে শক্তি।
●
●
●
●
●

খাদ্যের মুখ্য উপাদানগুলি হল—শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য, পুষ্টিসার বা প্রোটিন, স্নেহসার বা চর্বিজাতীয় খাদ্য, জীবনীকা বা জীবসার বা ভিটামিন, ধাতুসার বা খনিজ লবণ ও জল।

প্রত্যেকটি উপাদানের কার্য সম্বন্ধেও আমরা জানি।

৫.২ জীবজগতের খাদ্য:

আমরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খেয়ে থাকি। তাই আমাদের সর্বভুক বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভাত, ডাল, রুটি, ফল ও সবজি আমরা উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণী থেকে পায়। কিন্তু গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণের মতো প্রাণীরা কেবল ঘাস, ডালপালা, খড়কুটো, তুষ ইত্যাদি খাদ্য খেয়ে থাকে। তাই এদের তৃণভোজী বলা হয়। মাছ, মুরগি এরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিতজাত পদার্থ ও কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। সেরকম

অণুজীব, প্রাণী ও উদ্ভিদকে নিয়ে জীবজগৎ গঠিত। এই সব জীবদের শরীরে বিভিন্ন প্রকার জীবন প্রক্রিয়া সর্বদা চালু থাকে। বৃদ্ধি, বিকাশ, জনন, রেচন, চলন, পোষণ, শ্বসন ইত্যাদি এই প্রকিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এইসব কাজের জন্যে শক্তি দরকার। শক্তি খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। এই জন্যে সমস্ত জীব খাদ্য খেয়ে থাকে। জীবদের জন্যে খাদ্যের উপাদেয়তা ও খাদ্যে থাকা বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে আমরা আগে জেনেছি।

এসো, এসব কথা আর একবার মনে করি।

৫.১ জীবের জন্যে খাদ্যের উপাদেয়তা:

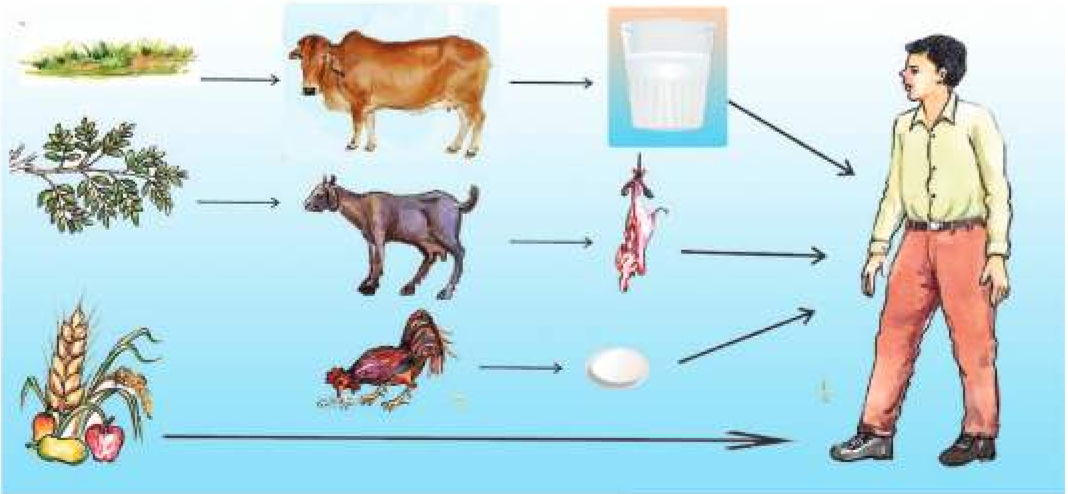

চিত্র ৫.১ খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীলতা

তোমাদের জন্যে কাজ ৫.১

সারণী ৫.২ খাদ্যতালিকা:

গত দু'দিনে তোমরা কী খেয়েছ?									
	সকালে জলখাবার	উপাদান	কোথাথেকে পাওয়াযায়? (উদ্ভিদ/প্রাণী)	মধ্যাহ্ন ভোজন	উপাদান	কোথা থেকে পাওয়া যায়? (উদ্ভিদ/প্রাণী)	রাতের ভোজন	উপাদান	কোথাথেকে পাওয়া যায়? (উদ্ভিদ/প্রাণী)
প্রথম দিন									
দ্বিতীয় দিন									

ওপরের সারণী থেকে আমরা জানলাম যে, আমাদের খাদ্য মূলত প্রাণীজাত ও উদ্ভিতজাত।

৫.৩ উদ্ভিদ পোষণ

প্রাণীদের মতো উদ্ভিদের হাত, পা ও মুখ নেই। এখন প্রশ্ন হল একটি উদ্ভিদ খাদ্য কোথা থেকে পায় ও কীভাবে খাদ্য গ্রহণ করে।

সাধারণত বীজ থেকে একটি উদ্ভিদের জন্ম হয়ে থাকে। মাটি থেকে খাদ্য পেয়ে থাকে। আবার আমরা তার গোড়ায় সার ও জল দিয়ে থাকি। এসব থেকে উদ্ভিদ খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও খনিজ লবণ পেয়ে থাকে। ফলে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঠিকভাবে হয়।

তোমার জন্যে কাজ ৫.২

উদ্ভিদ মাটি থেকে কোন্ কোন্ খনিজ লবণ পায়? অন্য বই পড়ে ও শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে তালিকা করো। এর জন্যে কৃষিবিভাগ, উদ্যানবিভাগের কর্মচারী ও চাষিদের সঙ্গে আলোচনা করো।

জল ও বিভিন্ন খনিজ লবণের সঙ্গে উদ্ভিদ খাদ্যের জন্যে অঙ্গারকাম্ল ও যবক্ষারজানও গ্রহণ করে থাকে। এই সমস্ত উপাদান উদ্ভিদের পোষণ (খাদ্যগ্রহণ ও বিনিয়োগ) এর জন্যে দরকার। তাই এই উপাদানগুলিকে পোষক বলা হয়। পোষকগুলি আহরণ ও খাদ্যপ্রস্তুতিতে বিনিয়োগকে সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদের পোষণ বলা হয় (চিত্র ৫.২)।

চিত্র ৫.২: উদ্ভিদদ্বারা খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ

৩.৪ উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতি—আলোকশ্লেষণ

তবে এসো জানব, সবুজ উদ্ভিদ মাটির থেকে সংগ্রহ করা জল ও খনিজ লবণ এবং পাতা দ্বারা বায়ুর থেকে সংগৃহীত অঙ্গারকাম্ল কোথায় বিনিযোগ করে?

সেই জল ও খনিজ পদার্থ কোন্ দিক দিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে পৌঁছোয়, তার জন্যে একটা সরল পরীক্ষা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ৫.৩

একটা হরগৌরী গাছ গোড়া থেকে তুলে এনে গোড়াটি পরিষ্কার করে ধুয়ে দাও। একটি গ্লাসে কিছুটা রঙিন জল নিয়ে হরগৌরী গাছের গোড়াকে সেই জলে ডুবিয়ে রাখো। গ্লাসের সঙ্গে গাছকে কিছু সময় রোদে রেখে লক্ষ করো। কোন্‌দিক দিয়ে রঙিন জল গাছের কোন্ অংশে যাচ্ছে?

এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে গোড়ার দ্বারা সংগৃহীত জল ও দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল থেকে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা দিয়ে পাতায় পৌঁছায়। গোড়ার থেকে পাতা পর্যন্ত লম্বা সংবাহী নালী (Phloem) দিয়ে এই পোষকগুলি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সংবাহী পেশিগুলিকে নিয়ে এই সংবাহী নালী গঠিত হয়ে থাকে। এর সঙ্গে পাতা নিজের পৃষ্ঠে থাকা খুব ছোট ছোট রন্ধ্র (কণা) দিয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে অঙ্গারকাম্ল সংগ্রহ করে। এই রন্ধ্রকে স্তোম বলা হয়।

সবুজ পাতায় থাকা কোষের মধ্যে হরিতকণা বা সবুজকণা থাকে। 'সবুজকণা' সূর্যালোক থেকে শক্তি আহরণ করে। সৌরশক্তি বিনিয়োগ করে পাতা অঙ্গারকাম্ল ও জল মিশিয়ে শ্বেতসার খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রক্রিয়াটিতে আলোকশক্তি বিনিয়োগ হওয়ায় একে আলোকশ্লেষণ বলা হয়। পাতা থেকে খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় ও তার বৃদ্ধির বিকাশে সাহায্য করে।

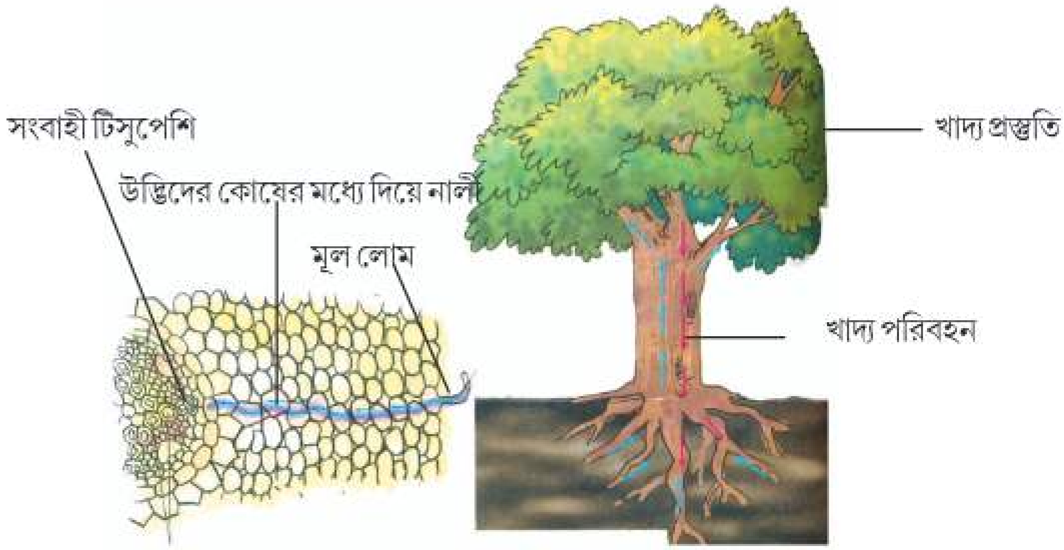

(ক) (খ)

চিত্র ৫.৩ (ক) উদ্ভিদের জল ও পোষকের পরিবহন (খ) খাদ্য পরিবহন

তোমাদের জন্যে কাজ ৫.৪

দুটি ফুলের টব বা সেরকম পাত্রে সমান সংখ্যক পাতা থাকা একটা করে উদ্ভিদ নাও। একটা টবকে খুব কমে ৭২ ঘণ্টা সূর্যকিরণ পড়তে থাকা স্থানে রাখো, অন্য টবটিকে ঠিক ততটা সময় সূর্যকিরণ একদম না পড়া অন্ধকার স্থানে রাখো।

৭২ ঘণ্টা পর উভয় গাছের ৫টি করে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পৃথকভাবে স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখো। যেন পাতার সবুজ রং বেরিয়ে গিয়ে পাতা ফিকে দেখা যাবে। সূর্যের কিরণ পাওয়া এবং সূর্যকিরণ একদম না পাওয়া পাতাকে পৃথকভাবে আয়োডিন দ্রবণে ডোবাও। কী হল লিখে রাখো (চিত্র ৫.৪)।

আয়োডিন দ্রবণে ডোবানোর পর

সূর্য কিরণ পেয়ে থাকা পাতার রং কেমন হল?

সূর্যকিরণ না পেয়ে থাকা পাতার রং কেমন হল?

সূর্যকিরণ না পাওয়া গাছকে সূর্যকিরণে রেখে তার পাতাকে পূর্বের মতো পরীক্ষা করায় কী হল?

কোন্ উপাদানে আয়োডিন মিশলে নীলবর্ণ হয়?

তুমি লাল হলুদ কিংবা ধূসর পাতার গাছ দেখে থাকবে। তোমার মনে প্রশ্ন আসতে থাকবে এই পাতাগুলির আলোকশ্লেষণ হয় কি না ? সত্যিকারে এমন অন্য রঙের পাতার সবুজ কণার সঙ্গে অন্য রঙের কণিকা থাকায় সেই পাতা অন্য রঙের দেখায়। কিন্তু সবুজকণা থাকায় পাতাগুলি আলোকশ্লেষণ করে শ্বেতসার প্রস্তুত করতে পারে।

(ক) সূর্যলোকে রাখা ফুলের টব

(খ) অন্ধকারে রাখা টব

চিত্র ৫.৪ আলোকশ্লেষণে আলোকের আবশ্যকতা দেখানো দুটি টব বা কুণ্ড

$$\underset{\text{(মাটি থেকে)}}{\text{জল}} + \underset{\text{(বায়ু থেকে)}}{\text{অঙ্গারকাম্ল}} \xrightarrow[\text{পাতায় সবুজকণা}]{\text{সূর্যলোক}} \text{শ্বেতসার (খাদ্য)} + \text{অম্লজান}$$

আলোকশ্লেষণের সমীকরণ

ওপরে দেওয়া প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে এবং এর পরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। ইহা সারা জীবজগতের জন্য খাদ্য হয়। এছাড়া আলোকশ্লেষণের সময় অম্লজান নির্গত হয়। সেই অম্লজান সমস্ত জীবজগতের শ্বাসক্রিয়ায় বিনিয়োগ হয়।

এখন আমরা জানলাম যে সবুজ উদ্ভিদ সমগ্র জীবজগৎকে শুধু খাদ্য জোগায় তা নয় বরং খাদ্যের সঙ্গে শ্বাসক্রিয়ার জন্যে অম্লজানও জুগিয়ে থাকে। তাই বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশকে প্রদূষণমুক্ত রাখার জন্য সকলের ধ্যান দেওয়া উচিত।

সবুজ উদ্ভিদ আলোকশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় নিজের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারায় তাদের স্বভোজী বা স্বপোষী বলা হয়। আলোকশ্লেষণ করতে না পারা কিছু উদ্ভিদ অণুজীব ও সমস্ত প্রাণীদের 'পরভোজী' বলা হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ ৫.৫

বন্ধুদের সঙ্গে মিলে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের নিকটে থাকা বাগান, পার্ক বা গাছপালা থাকা স্থানে যাও। সেখানে বিভিন্ন প্রাকার গাছপালা চেনো। তাদের নাম লেখো। না জানতে পারলে শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করে এক বিবরণী প্রস্তুত করো।

৫.৪ উদ্ভিদে শ্বেতসার ব্যতীত অন্য খাদ্য প্রস্তুতি

শ্বেতসার ব্যতীত উদ্ভিদে পুষ্টিসার, স্নেহসার ও জীবসারও প্রস্তুত হয়ে থাকে। স্নেহসার ও জীবসারে উদ্জান, অম্লজান, অঙ্গারক এবং শক্তি ব্যবহার হয়। আলোকশ্লেষণ থেকে সৃষ্টি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের বিপচন প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন উপায়ে স্নেহসার ও জীবসারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুষ্টিসারে যবক্ষরজান থাকে। আমরা জানি যে বায়ুমণ্ডলে প্রায় তিন চতুর্থাংশ যবক্ষরজান থাকলেও তা ক্রিয়াহীন হয়ে থাকায় উদ্ভিদ একে সোজা সংগ্রহ করতে পারে না। তবে উদ্ভিদ এটা কীভাবে আহরণ করে? কয়েক জাতের বীজাণু বায়ুমণ্ডলে মুক্ত যবক্ষরজানকে প্রাকৃতিক উপায়ে যবক্ষারজান যৌগিকে পরিণত করে। বীজাণুর মৃত্যুর পরে মূলের সাহায্যে জলের সঙ্গে এই যবক্ষারজানকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করে। এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা যাবার পর তা পচে গিয়ে মাটিতে মেশে ও তার থেকে যবক্ষারজান যৌগিক মাটিতে গিয়ে থাকে। তোমরা একথাও জানো যে চাষিরা মাটিতে যে ক্ষত ও মাড় দেয়, তার মধ্যে খনিজলবণ ও যবক্ষারজান থাকে।

তুমি পুষ্টিসার কোন্ উদ্ভিদের থেকে অধিক পরিমাণে পাও? কলাই, ছোলা, মুগ, অড়হর এর মতন ডালজাতীয় উদ্ভিদ থেকে সব থেকে অধিক পুষ্টিসার পাওয়া যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদের গোড়ায় একপ্রকার বীজাণু (রাইজোবিয়াম—Rhizobium) সহজীবী ভাবে থাকে। বায়ুমণ্ডলে যবক্ষারজানের বিবন্ধন করে এই বীজাণুরা ডাল জাতীয় উদ্ভিদকে জুগিয়ে দেয়। সেই রকম কিছু নীলহরিত শৈবাল দ্বারাও বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারজান ও বিবন্ধন হয়ে থাকে।

বিবন্ধিত যবক্ষারজানের যৌগিককে ব্যবহার করে উদ্ভিদরা বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিসার ও ন্যষ্টিঅম্ল সংশ্লেষণ করে থাকে।

৫.৫ অন্য উপায়ে জীব পোষণ:

আগে থেকে বলা হয়েছে যে সবুজ উদ্ভিদ ব্যতীত সমগ্র জীবজগৎ, নিজের পোষণের জন্যে অন্যের ওপরে নির্ভর করে থাকে। তাই তাদের পরভোজী বলা হয়। এই জীবেদের সবুজকণিকা থাকে না। ফলে তাদের আলোকশ্লেষণ ক্ষমতাও থাকে না। সমস্ত কবক, অধিকাংশ পরজীবী ও অপঘটক বীজাণু, প্রায় সমস্ত প্রাণী (কিছু প্রোটোজোয়াঙ্ক ছাড়া) এবং কিছু পরজীবী উদ্ভিদ (নির্মূলী, মলাঙ্গ ইত্যাদি) ইহার উদাহরণ। পরভোজী পোষণ চার প্রাকার। যথা: মৃতভোজী, পরজীবী, সহজীবী ও প্রাণী পোষণ। এসো সে সব পোষণের বিষয়ে আলোচনা করব।

৫.৫.১ মৃতভোজী পোষণ:

তোমরা ছাতু দেখেছ ও খেয়ে থাকবে। কমলালেবুর খোসা, পাঁউরুটি ও কাটা হয়ে থাকা ফলে ছাতা লেগে থাকা দেখে থাকবে। ছাতু ও ছাতা হচ্ছে সবুজকণা না থাকা উদ্ভিদের উদাহরণ। এরা কীভাবে নিজেদের পোষণ করে? কোন্ স্থানে বাড়ে?

বৃষ্টির দিনে যেসব জায়গায় গাছ, ডালপাতা, খড় প্রভৃতি পড়ে পচে যায়, সেখানে ছাতুর জন্ম হয়। সেরকম বাসি খাবার জিনিস ও কমলালেবুর খোসা ও চামড়ার জুতোয় ভেবনে বা ছাতা লেগে থাকা তোমরা দেখে থাকবে। ছাতু ও ভেবনেদের কবক বলা হয়। এই কবকরা একপ্রকার পাচকরস ত্যাগ করে। এই রস কবকের পরিবেশে থাকা জটিল পদার্থকে সরলীকৃত করে দেয়। তারপর সেই সরল পদার্থগুলিকে ছাতু ও ভেবনে বা ছাতা (ছত্রাক) জাতীয় মৃতভোজী কবকেরা শুষে নেয়। পরে তাকে নিজের পোষণে ব্যবহার করে।

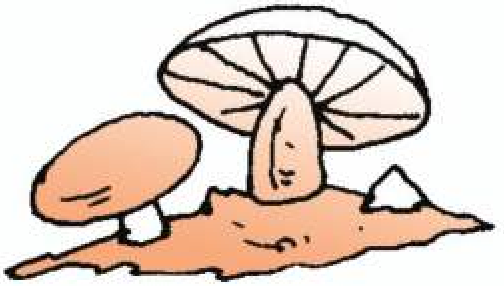

৫.১ কতক ফিশি জাতীয় উদ্ভিদ বা (ক) ছাতু।

তোমাদের জন্যে কাজ ৫.১

একটি প্লেটে পাঁউরুটি নাও। তার উপর একটু জলসিঞ্চন করে দাও। প্লেটটিকে অন্ধকার ঘরে বা সূর্যালোক থেকে দূরে রাখো। দু-তিন দিন পরে পাঁউরুটিটিকে অনুধ্যান করো। যবকাচ বা সুবিধে থাকলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নাও। (চিত্র ৫.৪)

১. পাঁউরুটির টুকরোটির কী পরিবর্তন হয়েছে?

২. যবকাচ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তা কেমন দেখা যাচ্ছে?

৩. পাঁউরুটির গন্ধে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? লেখো।

চিত্র: ৫.৪ পাঁউরুটিতে ফিশি।

কিছু কবক আমাদের ক্ষতি করলেও আর কিছু কবক আমাদের উপকার করে থাকে। ছাতু জাতীয় কবক আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য। পেনিসিলিন নামক প্রতিজীবী আমরা পেনিসিলিয়ম কবক থেকে পেয়ে থাকি। পাঁউরুটি করার জন্যে ইস্ট (yeast) কবককে বেকিং পাউডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫.৫.২ পরজীবী পোষণ:

যে পরভোজীরা অন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদের থেকে নিজের পোষণের জন্যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, তাদের পরজীবী বলা হয়। এরা মৃতভোজীদের মতন অন্য জীবেদের শরীর থেকে সরলীকৃত খাদ্য পদার্থকে গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ যথা: মলাঙ্গ, নির্মূলী (চিত্র ৫.৫) ও প্রাণী, যথা: প্লাসমোডিয়াম এবং নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করতে থাকা বীজাণু ইহার উদাহরণ।

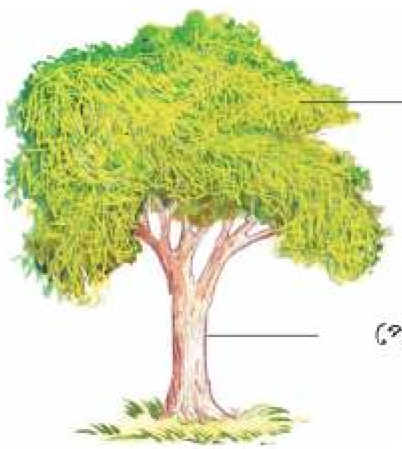

৫.৫ একটা বড় গাছে নির্মূলী

৫.৫.২.১ মাংসাশী উদ্ভিদ:

কিছু উদ্ভিদ আছে যারা কীট, পতঙ্গদের খেয়ে হজম করতে পারে। তাদের মাংসাশী উদ্ভিদ বলা হয়। কমণ্ডুল (Pither Plant) এই জাতের উদ্ভিদ। এর পাতা রূপান্তরিত হয়ে কীটকে ধরার কাজ করে। দেওয়া ছবি ৫.৬ থেকে এটা বুঝতে পারবে। পাতাটি রূপান্তরিত হয়ে ঘটির মতো হয়ে যায় ও ইহার মুখে একটা ঢাকনা মতো থাকে। এই পাত্র সদৃশ্য পাতার ভেতরের অংশ থেকে অনেক সূক্ষ্ম সুতোর মতো উপাদান বেরিয়ে থাকে। কমণ্ডুল সাদৃশ্য পাতার মধ্যে কীট ঢুকে গেলে ঢাকনা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায় এবং কীটটি তার মধ্যে থেকে যায়। সুতোর মতো সূক্ষ্ম জ্বালে আটকে গিয়ে কীটটি মারা যায়। কমণ্ডলু থেকে ক্ষরিত পাচকরস কীটটিকে বিঘটিত করে হজম করে। কমণ্ডুল শর্করা জাতের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারলেও তার যবক্ষরজানের আবশ্যকতা কীটের বিঘটনের থেকে পাওয়া যায়।

চিত্র ৫.৬ কমণ্ডুল গাছ

৫.৫.৩ সহজীবী পোষণ:

কিছু জীব আশ্রয় ও পোষণের জন্যে মিলেমিশে থাকে। কিছু কবক ও বীজাণু উদ্ভিদের শেকড়ে আশ্রয় নিয়ে থাকে। উদ্ভিদটি কবক বা বীজাণুর মতো জীবদের বাসস্থান ও খাদ্য জোগায়। কবক ও বীজাণুর সাহায্যে উদ্ভিদটি মাটির থেকে জল ও পোষক সংগ্রহ করে উভয় সম্পর্ক বেঁচে থাকার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তোমাদের জন্যে কাজ ৫.৭

একটা মুগচাষ হওয়া জমির থেকে একটা মুগের গাছ খুব সাবধানতার সঙ্গে তোলো, যেন তার মূলের অংশ সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসে। সেই গাছের শেকড়টিকে পরীক্ষণ করো। কী দেখলে লেখো।

সহজীবীর অন্য এক উদাহরণ হল 'লাইকেন'। এখানে শৈবাল ও কবকের সহজীবী পোষণ দেখতে পাওয়া যায়। শৈবালকে কবক আশ্রয় দেয় এবং তাকে খনিজ লবণ ও জল জোগায়। 'লাইকেন'-এর বংশ বিস্তার কবক দ্বারা হয়ে থাকে। প্রতিদানে শৈবাল আলোকশ্লেষণ করে প্রস্তুত খাদ্য কবককে জুগিয়ে থাকে।

ক্রুস্টোজ লাইকেন (Crustose Lichen)

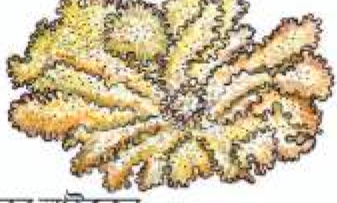

ফোলিঅজ লাইকেন (Follose Lichen)

চিত্র ৫.৭ বিভিন্ন প্রকারের লাইকেন

৫.৬ প্রাণী পোষণ:

প্রাণীরা নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে না। এর জন্যে এরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীদের উপর নির্ভর করে থাকে। যেসব খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টিসার, শ্বেতসার, জীবসার ইত্যাদিকে প্রাণীরা বিভিন্ন পাচকরস দ্বারা সরলীকৃত করে থাকে। পরে সেই পদার্থগুলিকে নিজের শরীর বৃদ্ধি ও বিকাশে নিয়োজিত করে থাকে।

প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশে জীবনযাপন করে থাকে। তাই তাদের খাদ্য অভ্যাসের বিভিন্নতা দেখা যায়। এসো প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস অনুধ্যান করব।

৫.৬.১ খাদ্যাভ্যাস:

তোমাদের চারপাশে থাকা প্রাণীরা কেমন খাদ্য খায়, কোনোদিন চিন্তা করেছ কি? সকলের কি আমাদের মতন মুখ, দাঁত, জিভ আছে? প্রাণীদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাওয়ার অভ্যাসকে খাদ্যাভ্যাস বলে। কেউ চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে থাকে তো আর কেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে, কেউ চেটে চেটে, গিলে গিলেও পোষণ করেও খেয়ে থাকে। তোমাদের ঘরে ও বাইরে প্রাণীদের খাদ্য খাওয়ার অনুভূতিকে মনে করে নিম্নোক্ত সারণীটি প্রস্তুত করো।

সারণী ৫.২

প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যাভ্যাস

ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	কী খায়?	কীভাবে খায়?/খাদ্যাভ্যাস
১	পিঁপড়ে		
২	মশা		
৩	মাছি		
৪	উকুন		
৫	বক		
৬	পায়রা		
৭	বেড়াল		
৮	চিল		
৯	মাছ		
১০	প্রজাপতি		
১১	কাঠঠোকরা পাখি		
১২	শকুন		

তোমরা জানো কি ?

তারা মাছ (Starfish)-এর খাদ্য হচ্ছে শামুক ও গেঁড়ি। তাদের কোমল শরীর একটা মোটা কঠিন খোলসের মধ্যে থাকে। তার মুখ্য উপাদান ক্যালশিয়াম কার্বোনেট। শামুক ও গেঁড়ি যখন ওদের খোলসের থেকে বের হয়, তারা মাছ তখন তার পাকস্থলীকে বাইরে বের করে এনে তাদের কোমল মাংস খেয়ে থাকে।

৫.৭ পরিপাক বিভাগ /পরিপাক ক্রিয়া

মুখ দিয়ে আমরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। হজম হওয়ার পর অদরকারী অংশ মলরূপে মলদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। তাই তোমরা অনুমান করতে পারছ মুখ থেকে মলদ্বার অবধি একটা নলী লম্বা হয়ে আছে, একে খাদ্যনালী বলা হয়। আমরা খাদ্যকে যেরূপে খাই/গ্রহণকরী তার থেকে দরকারী পদার্থ আমাদের শরীরে শুষে নেওয়ার পর তার রূপ বদলে যায়। এই যে অদলবদল কার্য হয়, তাকেই পরিপাক ক্রিয়া বলা হয়।

পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্যে খাদ্যতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা কাজ করে থাকে। তোমরা চিত্র ৫.৯ দেখো। মুখ থেকে আরম্ভ হওয়া খাদ্যতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি হল: (১) মুখগহ্বর (২) খাদ্যনালী (৩) পাকস্থলী (৪) গ্রহণী বা ডিওডিনাম (৫) ক্ষুদ্রান্ত্র (৬) বৃহদন্ত্র (৭) মলকোষ্ঠ (৮) মলদ্বার। পরিপাক ক্রিয়ায় খাদ্যনালীর সঙ্গে আরও কতক অভ্যন্তরীণ অঙ্গ যথা যকৃৎ অগ্ন্যাশয় ও পিত্তকোষও সাহায্য করে থাকে।

এসো এখন ৫.৯ চিত্রে দেখব খাদ্যতন্ত্রের কোন্ অংশ খাদ্য হজমে সাহায্য করে থাকে।

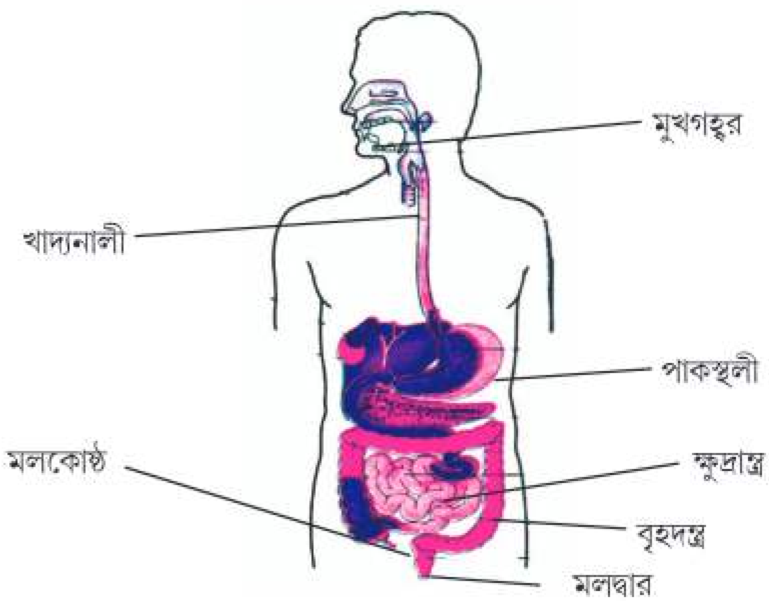

চিত্র: পরিপাক বিভাগ ৫.৯

৫.৭.১ মুখগহ্বর:

আমাদের মুখ, দাঁত ও জিভকে নিয়ে মুখগহ্বর গঠিত। মুখের ভেতর দাঁত আছে। দাঁত প্রত্যেক খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট করায় সাহায্য করে। আমাদের মুখের ভেতর সর্বাধিক ৩২টি দাঁত আছে। দাঁতের আকার অনুসারে কার্য বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

তোমাদের জন্যে কাজ:

তুমি তোমার হাত ভালো করে ধোও। আর না দেখে তোমার তর্জনীর সাহায্যে মুখে কটা দাঁত আছে গোনো। প্রত্যেক দাঁতের আকার দেখো। একটা শসা বা পেয়ারা নিয়ে খাও। দেখো কোন্ কোন্ দাঁত চিবতে, কামড়াতে, গুঁড়ো করতে বা চিরতে সাহায্য করছে। সেসব নীচে দেওয়া সারণী ৫.৩-এ লেখো।

সারণী ৫.৩

দাঁতের বিভিন্ন প্রকার কার্য

ক্রমিক নং	দাঁতের প্রকার	দাঁতের নম্বর		মোট
		নীচের মাড়ি	ওপরের মাড়ি	
১	কামড়ানো			
২	কাটা			
৩	টানা			
৪	গুঁড়ো করা			
৫	চিবানো			

তোমাদের জন্যে কাজ:

তোমরা একটি ছোট বাচ্চার, একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের এবং একজন বৃদ্ধের দাঁত ভালো করে দেখো। কার কয়টি ও কী কী প্রকারের দাঁত আছে, লেখো।

তোমার অঞ্চলে থাকা কুকুর, বেড়াল, গোরুর খাবার সময় তাদের দাঁত লক্ষ করো। কীসব পার্থক্য দেখছ?

তোমরা জানো কি?

- মানুষের দু'বার দাঁত ওঠে। প্রথমে যে দাঁত ওঠে তাকে দুধদাঁত বলা হয়। তোমার মনে থাকবে তুমি যখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তে তোমার সব দাঁত পড়ে গিয়েছিল। সে স্থানে আবার নতুন দাঁত উঠেছিল। দ্বিতীয়বার যে দাঁত ওঠে তাকে স্থায়ী দাঁত বলা হয়। এই দাঁত পড়ে গেলে আর ওঠে না। সাধারণত বয়স্ক মানুষদের বা দাঁতের কোনো রোগ হলে দাঁত শীঘ্র পড়ে যায়।

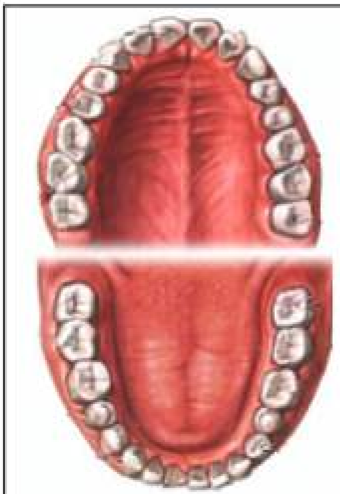

বিভিন্ন প্রকার দাঁতের সজ্জীকরণ

চিত্র ৫.১০

আমরা খাওয়ার পরে দাঁত মুখ কেন পরিষ্কার করব?

আমরা যদি দাঁত ও মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার না করি তবে কিছু ক্ষতিকারক

৫.৭.১ মুখগহ্বর:

আমাদের মুখ, দাঁত ও জিভকে নিয়ে মুখগহ্বর গঠিত। মুখের ভেতর দাঁত আছে। দাঁত প্রত্যেক খাদ্যকে

তাই আমাদের সকলের দাঁতকে ভালো ব্রাশ কিংবা দাঁতকাঠির সাহায্যে দিনে দুবার মাজা উচিত। খাদ্য খেয়ে মুখ ধোয়া উচিত।

দাঁত ছাড়া মুখগহ্বরে জিভও আছে। জিভের তলায় লালাগ্রন্থি থাকে। এই লালা আমাদের খাদ্যে থাকা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে হজমে সাহায্য করে। মুখগহ্বরের ভেতরের দিকে জিভ লেগে থাকে। ইহা নরম মাংসপেশিতে তৈরি হয়ে থাকায় চারদিকে ঘুরতে পারে। এটা মুখগহ্বরের বাইরেও বেরিয়ে আসতে পারে। আমরা খাওয়া খাদ্যকে এদিক ওদিক করে দাঁতকে চিবিয়ে খাওয়ায় সাহায্য করে। জিভের জন্যে আমরা কথা বলতে পারি। জিভের তলা থেকে নির্গত হওয়া লালা খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে গিলতে সাহায্য করে। জিভের সাহায্যে খাদ্যে স্বাদ জানা যায়। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যনালী দিয়ে খাদ্য পাকস্থলীতে যায়।

তোমাদের জন্যে কাজ:

হাত ধোও। তোমার বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে জিভকে টেনে ধরে রাখো, তারপর তুমি বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলো। কী হচ্ছে দেখো। মাঝে মাঝে খাদ্য খাওয়ার সময়ে যদি আমরা হাসি কিংবা কথাবার্তা বলি তবে আমাদের কাশি হয়। আমরা বলি, খাদ্য তালুতে উঠে গেল। মায়েরা মাথা থাবড়িয়ে দেয়। সত্যিকারে কী হয়? চিন্তা করে বলো। আমাদের গলার কাছে দুটো নালি কাছাকাছি থাকে। একটা মুখ দিয়ে পাকস্থলীতে যায় একে খাদ্যনালী বলা হয়। অন্যটি নাক থেকে ফুসফুসে যায়। একে শ্বাসনালী বলা হয়। বায়ু যাওয়ার সময় খাদ্যনালীকে গ্লটিস (ঘণ্টিকা) বন্ধ করে দেয়। সেইভাবে খাদ্য যাওয়ার সময়ে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। যদি হঠাৎ কোনো কারণে খাদ্য বায়ুনালীর সংস্পর্শে আসে, আমাদের কাশি হয়। নাক, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তাই খাওয়ার সময়ে সাবধানের সঙ্গে খাওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি না খেয়ে খাদ্যকে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাওয়া উচিত।

এখন দেখব জিভ আমাদের স্বাদ জানতে কীভাবে সাহায্য করে। জিভে কতকগুলি স্বাদমুকুল আছে (Test bud)। চিত্র ৫.১১ দেখো তারা কোন কোন স্থানে আছে।

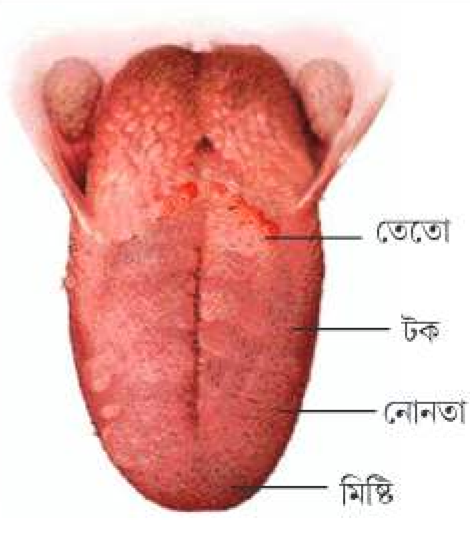

চিত্র ৫.১১ জিভে থাকা স্বাদমুকুল

তোমাদের জন্যে কাজ:

- দুজন করে বন্ধু মুখোমুখি বসো।
- চারটি পাত্রে বিভিন্ন মিশ্রণ তৈরি করে রাখো (চিনির জল, নুনের জল, লেবুর জল ও উচ্ছের রস)।
- চারটে সরু পরিষ্কার কাঠি নাও। প্রত্যেক মিশ্রণে একটা কাঠি ফেলো।

- তুমি তোমার বন্ধুকে জিভ বের করতে বলো।
- তুমি কাঠির সাহায্যে প্রত্যেক মিশ্রণ থেকে এক ফোঁটা জিভের মাঝে এবং ৫.১১ চিত্রে দেখানোর মতন বিভিন্ন অংশে ফেলো।
- বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে বোঝো জিভের কোন্ অংশে সে টক, মিষ্টি, নোনতা ও তেতো জিনিসের স্বাদ জানতে পারছে।
- এখন তুমি তোমার পর্যবেক্ষণের তথ্য খাতায় লিখে রাখো।
- তোমার বন্ধুকে বলো তোমার জিভের উপরে বিভিন্ন মিশ্রণের ফোঁটা ফেলতে। এই রকম স্বাদ বোঝার পরীক্ষা অন্য বন্ধুদের সঙ্গে করো।

৫.৭.২ খাদ্যনালী:

খাদ্যনালী দিয়ে খাদ্য গিয়ে থাকে। খাদ্যনালীর সংকোচন, প্রসারণের ফলে খাদ্য নীচের দিকে ঠেলে চলে যায়।

মাঝে মাঝে পাকস্থলীতে যদি কিছু অসুবিধা হয়, তবে খাদ্য পাকস্থলীতে না থেকে পুনর্বার খাদ্যনালী দিয়ে, মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আমরা একে বমি হচ্ছে বলে থাকি।

তোমার যদি কোনো দিন বমি হয়ে থাকে, সেকথা মনে করো। বমি হওয়ার কারণ কী? যদি পাকস্থলীতে গ্যাস হয়, তবে এই গ্যাস খাদ্যের সঙ্গে খাদ্যনালী দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

চিত্র ৫.১২খাদ্যনালী

৫.৭.৩ পাকস্থলী:

চিত্র ৫.১৩ দেখো। খাদ্যনালীর শেষ অংশটি পাকস্থলীতে লেগেছে। পাকস্থলীর শেষ অংশটিকে গ্রহণী বলা হয়। পাকস্থলীর আকার কেমন দেখাচ্ছে (চিত্র ৫.১৩) এটা একটা থলের মতো দেখতে। পরিপাকতন্ত্রের সবথেকে চওড়া অংশটি হচ্ছে পাকস্থলী।

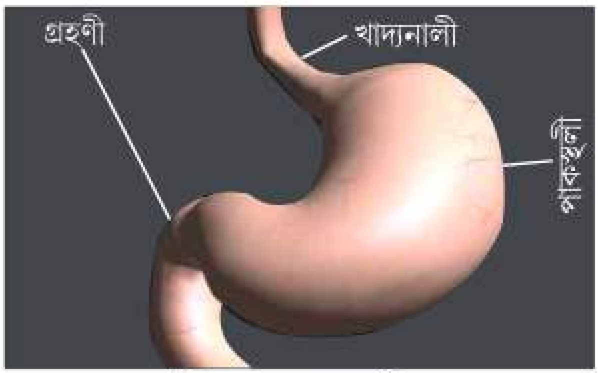

চিত্র ৫.১৩ পাকস্থলী

পাকস্থলীর ভিতরের আবরণে থাকা বিভিন্ন গ্রন্থির থেকে পাচকরস, লবণাম্ল ও লালা নির্গত হয়। লবণাম্ল খাদ্যে থাকা ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে মেরে ফেলে, এবং পাচকরস খাদ্য হজম করায় সাহায্য করে। পাচকরস খাদ্যে থাকা পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্যকে সরলীকৃত করে থাকে।

পাকস্থলীর পরবর্তী অংশটি হচ্ছে গ্রহণী। পিত্তকোষ থেকে পিত্ত এসে গ্রহণীতে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। এই পিত্তরস যকৃতে তৈরি হয়ে পিত্তকোষে সঞ্চিত হয়ে থাকে। পিত্ত খাদ্যতে থাকা চর্বিকে হজম করায় সাহায্য করে থাকে।

তোমরা জানো কি ?

খাদ্যে কোনো সাধারণ ছোটখাটো বিষাক্ত পদার্থ থাকলে তার বিষক্রিয়া হ্রাস করার কার্য যকৃৎ করে থাকে। তোমরা ভাবছ, আমাদের খাদ্যে বিষ কোথা থেকে আসবে? তোমরা দেখেছ কপিতে পোকা না লাগার জন্যে কেয়ারিতে পোকা মারা ওষুধ সিঞ্চন করা হয়। ওষুধ ফেলার কমপক্ষে ১৪ দিন পর গাছের থেকে ফল এনে খাওয়ার কথা। কারণ ততদিনে ওষুধের প্রকোপ কমে যায়। কিন্তু চাষিরা লোভের বশে ওষুধ কেনার পাঁচছয় দিন পর ছোট ছোট কপি এনে বাজারে বিক্রি করে। আমরাও সেগুলি কিনে এনে খেয়ে থাকি। তাই কিছু পরিমাণে বিষাক্ত অংশ আমাদের শরীরে চলে যায়।

তোমরা জানো কি পাকস্থলীর ভেতরে কী হয়, কেপ্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন বা দেখেছিলেন?

১৮২২ সালের কথা। আলেকসিস সেন্ট মারটিক নামে একজন ব্যক্তির বুকে গুলি লেগে গেল। গুলিটি তার বুকের ভিতর দিয়ে পাকস্থলীকে ফুটো করে দিয়েছিল। তাকে চিকিৎসা করার জন্যে একজন আমেরিকার আর্মি ডাক্তার উইলিয়াম ব্যুমোন্ট-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার ওকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু পাকস্থলীর ফুটো বন্ধ করতে না পেরে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তখন ডাক্তার ব্যুমোন্ট একটা সুযোগ পেলেন, পাকস্থলীতে হওয়া ফুটো দিয়ে পাকস্থলীর ভেতরের কাজ দেখার জন্যে। উনি দেখলেন পাকস্থলীতে খাদ্য সব গুঁড়ো হচ্ছে ও ভেতরের আবরণের থেকে রস নির্গত হয়ে খাদ্যকে হজম করছে। উনি আরও দেখলেন পাকস্থলীতে খাদ্য হজম হওয়ার পর ক্ষুদ্রান্ত্রে যাচ্ছে।

৫.৭.৪ ক্ষুদ্রান্ত্র:

চিত্র ৫.১৪ দেখো। এটা খাদ্যনালীর সবথেকে লম্বা অংশ। তা গুটিয়ে গুটিয়ে থাকে। এবং লম্বা প্রায় ৭.৫ মিটার। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশকে গ্রহণী বলা হয়। আগের থেকে বলা হয়েছে গ্রহণীতে পিত্তরস এসে মেশে। সেরকম ক্ষুদ্রান্ত্রের ঠিক তলায় থাকা ঘিয়ে রঙের গ্রন্থিকে অগ্ন্যাশয় বলা হয়। চিত্রে অগ্ন্যাশয় কোথায় কীভাবে আছে দেখো। অগ্ন্যাশয় থেকে রস নির্গত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে মিশে থাকে। খাদ্যে থাকা শ্বেতসার, স্নেহসার ও পুষ্টিসার ইত্যাদিকে অগ্ন্যাশয় সরলীকরণ করায় সাহায্য করে।

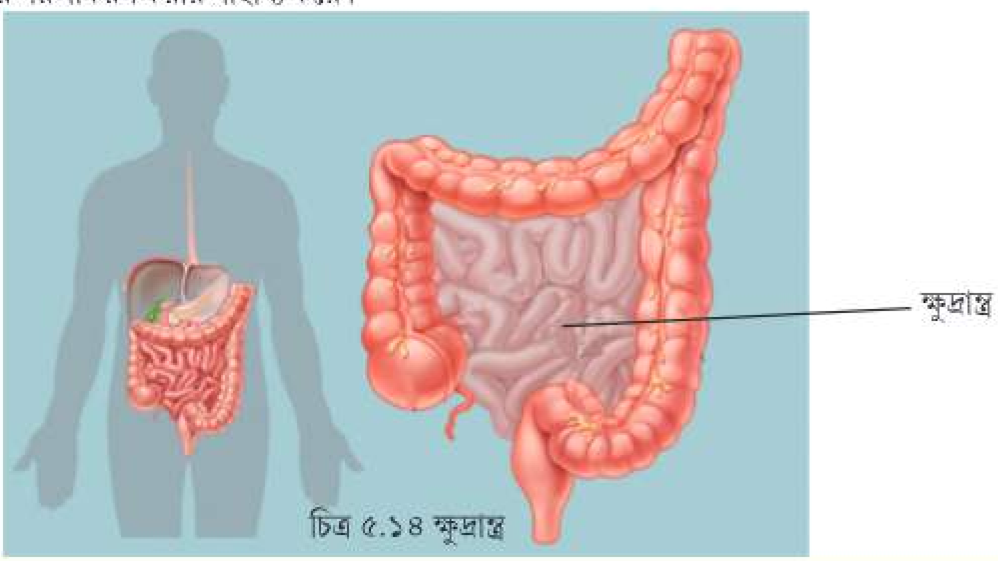

চিত্র ৫.১৪ ক্ষুদ্রান্ত্র

ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষভাগে খাদ্য আসার সময়ে প্রায় সব খাদ্য হজম হয়ে গিয়ে থাকে। যথা: শ্বেতসার, গ্লুকোজ, চর্বিজাতীয় খাদ্য ফ্যাটি অ্যাসিডে ও গ্লিসে বলে। এবং পুষ্টিসার অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে।

হজম হওয়া খাদ্যসার, ক্ষুদ্রান্ত্র দ্বারা পোষিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভেতরের দিকের আবরণ আঙুলের মতন, ওপরের দিকে উঠে থাকে। তাকে ভিলি (Villi) বলা হয়। এতে কিন্তু রক্ত কৈশিক নালী থাকে। ভিলিতে থাকা কৈশিক নালী খাদ্যের থেকে খাদ্যসার অধিক পোষণ করে থাকে। পরে উক্ত কৈশিক নালীর সাহায্যে ইহা শরীরের বিভিন্ন অংশে যায়। ইহাকে আত্মীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়। যে খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে পোষিত না হয়ে কিংবা হজম না হয়ে থেকে যায়, তা বৃহদন্ত্রের ভিতরে যায়।

৫.৭.৫ বৃহদন্ত্র:

ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ বৃহদন্ত্রের সঙ্গে যোগ হয়ে থাকে। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশকে মলদ্বার বলা হয়। ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রের থেকে চওড়া কিন্তু লম্বায় ছোট। লম্বা প্রায় ১.৫ মিটার। বৃহদন্ত্রে ভিতরের অংশ, খাদ্যের ছিবড়ের অংশের থেকে জল ও কতক লবণ শোষণ করে থাকে। অবশিষ্ট ছিবড়ে অংশ মলকোষ্ঠের ভিতরে চলে যায়, সেখানে অর্ধতরল অবস্থায় থাকে। পরে মলদ্বার দিয়ে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

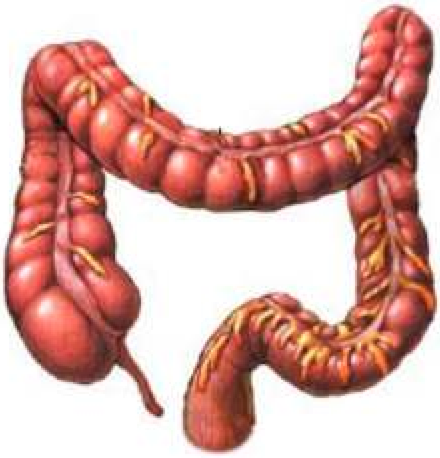

চিত্র ৫.১৫ বৃহদন্ত্র

৫.৮ তৃণভোজীদের পোষণ

তোমাদের চারপাশে থাকা তৃণভোজী প্রাণীদের মনে করো। যেমন— গোরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। তোমরা দেখে থাকবে শোয়ার সময় গোরু, বাছুররা খাবার চিবোতে থাকে। সত্যিকারে ওরা চরার সময় ঘাসকুটো তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে। ওই খাদ্য ওদের পাকস্থলীর প্রথমভাগে (Rumen)-এ গিয়ে জমা থাকে। সেখানে খাদ্য কিছু পরিমাণে হজম হয়ে যায়। ইহাকে রোমন্থিত (Cuel) খাদ্য বলা হয়। পরে এই রোমন্থিত খাদ্য ছোট ছোট গোলার আকারে পরিণত হয়ে আবার মুখে ফিরে আসে এবং গোরুরা সেগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে মন্থন ও তাদের রোমন্থন প্রাণী বলা হয়।

চিত্র ৫.১৬ গোরুর পাকস্থলী

ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে অধিক পরিমাণে সেল্যুলোজ থাকে। সেল্যুলোজ এক প্রকার শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। প্রাণীরা সেল্যুলোজকে সহজে হজম করতে পারে না। চিত্র ৫.১৬ দেখো ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রে মাঝে একটা বড় থলির মতো অংশ দেখা যাচ্ছে। তাকে অন্ধনালা বা সিকম (Caucum) বলা হয়। সেল্যুলোজযুক্ত খাদ্য এই সিকমে

ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষভাগে খাদ্য আসার সময়ে প্রায় সব খাদ্য হজম হয়ে গিয়ে থাকে। যথা: শ্বেতসার, গ্লুকোজ, চর্বিজাতীয় খাদ্য ফ্যাটি অ্যাসিডে ও গ্লিসে বলে। এবং পুষ্টিসার অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে।

কতক ছোট ছোট প্রাণী আছে যাদের পরিপাক যন্ত্র নেই, মুখও নেই। তবে তারা কীভাবে খাদ্য খায়? খাদ্য হজম কীভাবে হয়? এসো সে বিষয়ে জানব।

৫.৯ অ্যামিবার পোষণ

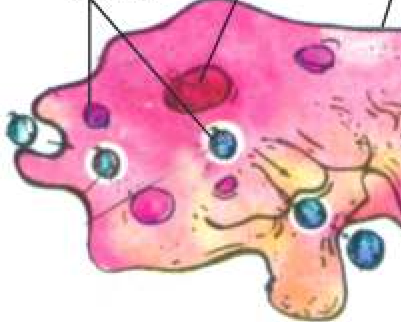

৫.১৭ অ্যামিবা

অ্যামিবা একটি এককোষী প্রাণী। ইহা খালিচোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একে দেখতে পাওয়া যায়। চিত্র ৫.১৭ দেখো। ইহার শরীর একটা পাতলা আবরণ বা কোষঝিল্লি দ্বারা ঢেকে রেখেছে। এর শরীরের ভেতরে বড় গোলাকার ন্যষ্টি আছে এবং অনেক ছোট ছোট গোলাকার জলের ফোসকার মতো রসদানী আছে।

অ্যামিবা নিজের শরীর সবসময় বদলিয়ে থাকে। সে নিজের শরীরের আকার ছোট করে দুটি কূটপাদ বের করে হাঁটতে থাকে। অ্যামিবা ছোট ছোট কীট খেয়ে বেঁচে থাকে। এর খাদ্যগ্রহণ এক স্বতন্ত্র ধরনের। সে খাদ্য দেখামাত্র নিজের শরীর থেকে কূটপাদ বের করে খাদ্যের চারপাশে জড়িয়ে দেয়। তারপর খাদ্যটিকে শরীরের ভেতর নিয়ে যায়। এই খাদ্য শরীরের ভেতরে রসযানীতে থাকে। রসযানীর থেকে পাচকরস নির্গত হওয়ার ফলে খাদ্য হজম হয়ে থাকে বা খাদ্যের সরলীকরণ হয়ে থাকে। তার পর ইহার আত্মীকরণ হয়। এরকম খাদ্য পোষিত হওয়ার ফলে তার শরীরের অভিবৃদ্ধি ঘটে থাকে। পুনর্বার সেই রসযানীতে থাকা খাদ্যের ছিবড়ে অংশ শরীরের যে কোনো অংশের থেকে বেরিয়ে যায়।

কী শিখলে?

- জীবের শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও কাজ করার জন্যে শক্তি আবশ্যক।
- খাদ্য গ্রহণ শরীরে তার বিনিয়োগ/পরিপাক, শোষণ/আত্মীকরণ ও অব্যবহৃত খাদ্যের বহিষ্করণ প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে পোষণ বলা হয়।
- জীবের পোষণের জন্যে আবশ্যকীয় উপাদানদের পোষণ বলা হয়।
- সবুজ উদ্ভিদরা পত্রহরিৎ বা সবুজকণার সাহায্যে সূর্যালোকের থেকে শক্তি আহরণ করে জল ও অঙ্গারকাম্ল সহযোগ করে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াকে আলোকশ্লেষণ বলা হয়।
- কেবল সবুজকণা থাকা উদ্ভিদ এই উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারায় তারা স্বভোজী। সবুজকণা না থাকা উদ্ভিদ ও সমস্ত প্রাণী পরভোজী।
- পরভোজীদের মধ্যে পরজীবী ও মৃতজীবী অন্তর্ভুক্ত।
- কমণ্ডুলের মতো মাংসাশী উদ্ভিদ স্বভোজী হয়ে থাকলেও যবক্ষরজান যুক্ত পদার্থ কীটপতঙ্গ থেকে পেয়ে থাকে।
- কয়েকস্থানে জীব জীবের মধ্যে সহজীবী জীবনক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে।
- প্রাণীদের পোষণ বলতে পোষকের আবশ্যকতা, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরে ইহার সদুপযোগকে বোঝায়।

- মানুষের পরিপাকতন্ত্রের খাদ্যনালী ও ক্ষরণ গ্রন্থিগুলির কার্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের নাম (ক) মুখগহ্বর (খ) খাদ্যনালী (গ) পাকস্থলী (ঘ) গ্রহণী (ঙ) ক্ষুদ্রান্ত্র (চ) বৃহদন্ত্র (ছ) মলকোষ্ঠ (জ) মলদ্বার ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলির নাম: ১. লালাগন্থি ২. যকৃতে থাকা পিত্তকোষ ৩. অগ্ন্যাশয় ৪. পাকস্থলী ৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃআবরণ থেকে ক্ষরিত হওয়া পাচকরস।
- প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতা থাকে।
- পোষণ এক জটিল প্রক্রিয়া। যেখানে (ক) খাদ্যগ্রহণ (খ) খাদ্যহজম (গ) খাদ্যসার শোষণ (ঘ) আত্মীকরণ এবং (ঙ) নিষ্কাশন ইত্যাদি প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে।
- মুখগহ্বরের শ্বেতসার, পাকস্থলীর পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্যের হজম হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র যকৃতে থাকা পিত্রকোষ থেকে ক্ষরিত পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত পাচকরস, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃআবরণ থেকে ক্ষরিত পাচকরস মিশে সমস্তপ্রকার খাদ্য সারকে হজম করে দেয়।
- ক্ষুদ্রান্ত্রে হজম হয়ে থাকা খাদ্যসার রক্ত কৈশিক নালীদের দ্বারা পোষিত হয়ে থাকে।
- ক্ষুদ্রান্ত্র দ্বারা পোষিত খাদ্যসার শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠানো হয়। জল এবং কতক লবণ বৃহদন্ত্র দ্বারা পোষিত হয়ে থাকে।
- হজম না হওয়া খাদ্যের ছিবড়ে অংশ মলদ্বার দিয়ে বাইরে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।
- তৃণভোজী প্রাণী যথা: গোরু, মোষ, হরিণ ইত্যাদিকে রোমন্থন প্রাণী বলা হয়। তারা তাড়াতাড়ি খাদ্য গিলে নিয়ে সিকমে রেখে দেয়।
- অ্যামিবা এক এককোষী প্রাণী। সে নিজের কূটপাদ বের করে খাদ্যকে শরীরের রসযানীর ভেতরে ঠেলে দেয়। রসযানী ভেতরে সেই খাদ্য হজম হয়ে থাকে। শরীরের যে কোনো স্থান দিয়ে হজম না হওয়া খাদ্য নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

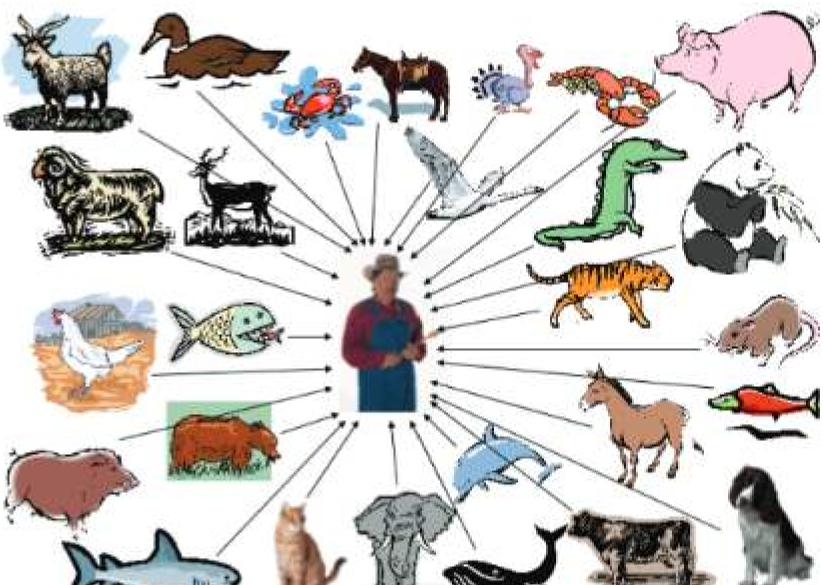

অভ্যাস

১. আমাদের খাদ্যে থাকা উপাদানগুলির নাম লেখো।

২. 'জীবজগৎ কাজ করার জন্যে শক্তি সূর্য থেকেই পেয়ে তাকে।' ইহা কেন সত্যি, কারণ দিয়ে বোঝাও।

৩. স্বভোজী ও পরভোজী প্রতিটি থেকে তিনটি উদাহরণ দাও।

৪. তুমি মানুষকে স্বভোজী, পরভোজী ও মৃতভোজীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে রাখবে ও কেন লেখো।

৫. নিজের খাতায় নিম্ন সারণীর মতো একটা সারণী তৈরি করো ও সারণীর খালি স্থান পূরণ করো।

	পরভোজী	মৃতোপজীবী	সহজীবী
কাকে বলে			
উদাহরণ কোথা থেকে খাদ্য পায়			

৬. প্রত্যেকের একটা উদাহরণ দাও (খাতায় লেখো)।

(ক) উভয় স্বভোজী ও পরভোজী ভাবে পোষণ সংগ্রহ করা উদ্ভিদ।

(খ) যবক্ষরজানের বিবন্ধনে ডালজাতীয় গাছকে সাহায্য করা বীজাণু।

(গ) সূর্যালোকের থেকে শক্তি সংগ্রহের জন্যে পাতায় থাকা কণিকা।

৭. তালিকায় থাকা শব্দের মধ্যে সঠিকটি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) কীটপতঙ্গের খেয়ে ফেলা উদ্ভিদ হচ্ছে --------।

(নির্মুলী, শৈবাল, কমণ্ডুল, ছাতু)

(খ) শৈবাল ও কবকের মধ্যে সহজীবী অবস্থা -------- দেখা যায়।

(ফিসি, ডালজাতীয়, পেনসিলিয়ম, লাইকেন)

৮. পাতায় শ্বেতসার খাদ্য প্রস্তুতির জন্যে যেগুলি আবশ্যক নিম্ন তালিকার থেকে বেছে লেখো।

বায়ু, যবক্ষরজান, জল, প্রোটিন, অঙ্গারকাম্ল, সূর্যালোক, অম্লজান।

৯. নিম্নে পরিপাক বিভাগের বিভিন্ন অংশের নাম লেখা হয়েছে।

খাদ্য খেলে কোন্ অংশ থেকে কোন্ অংশে যায় ক্রমান্বয়ে লেখো।

পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, খাদ্যনালী, বৃহদন্ত্র, গ্রহণী, মুখগহ্বর, মলকোষ্ঠ।

১০. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) পরিপাকতন্ত্রের সব থেকে বড় আকারের অংশের নাম —।

(খ) পরিপাকতন্ত্রের সব থেকে লম্বা অংশের নাম —।

(গ) পাকস্থলীর থেকে —, — ও — রস ক্ষরণ হয়ে থাকে।

(ঘ) ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃআবরণের আঙুলের মতন উঠে থাকা অংশকে — বলা হয়।

(ঙ) অ্যামিবার হজম কার্য —য়ে হয়ে থাকে।

১১. প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটা বা দুটো লাইনে লেখো।

(ক) পিত্তরস কোথা থেকে ক্ষরিত হয়ে থাকে ও ইহা কোন্ প্রকার খাদ্যকে হজমে সাহায্য করে ?

(খ) বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভাগ নিয়ে থাকা বাচ্চাদের গ্লুকোজ দেওয়া হয়। কারণ কী ?

(গ) শাক সহজে হজম হয় না, এর কারণ কী ?

(ঘ) অগ্ন্যাশয় কোন্ অংশে থাকে ? এর কার্য কী ?

১২. 'ক' স্তম্ভে দেওয়া পরিপাকতন্ত্রের অংশগুলির নামের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে থাকা সম্পর্কিত কার্যকে জুড়ে লেখো।

'ক'	'খ'
লালাগ্রন্থি	পাচকরস
পাকস্থলী	জল পোষণ
যকৃৎ	হজমক্রিয়া শেষ
ক্ষুদ্রান্ত্র	ছিবড়ে অংশ নিষ্কাশন
বৃহদন্ত্র	লালা অংশ ক্ষরণ

১৩. শরীরের কোন্ কোন্ অংশে নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি হজম হয়ে থাকে লেখো।

- শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ————
- পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য ————
- চর্বি জাতীয় খাদ্য ————
- সমস্ত খাদ্যসার ————

১৪. পরিপাক বিভাগের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রে দর্শাও।

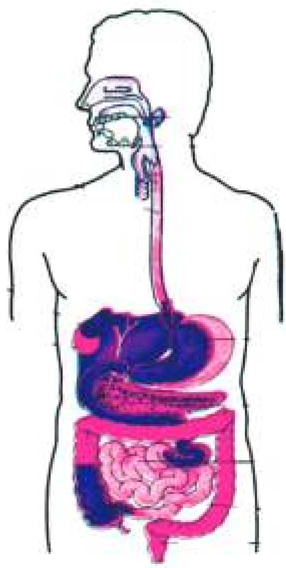

চিত্র : পরিপাক বিভাগ

১৫. কী বোঝ?

(ক) হজমক্রিয়া

(খ) খাদ্যগ্রহণ

(গ) আত্মীকরণ

(ঘ) খাদ্য নিষ্কাশন

(ঙ) দুধদাঁত

(চ) স্থায়ীদাঁত

(ছ) জাবরকাটা

১৬. কারণ দর্শাও।

(ক) খাওয়ার পর দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা।

(খ) খাদ্য খাওয়ার সময় কথা বলা উচিত নয়।

(গ) মানুষ সেল্যুলোজ জাতীয় খাদ্য সহজে হজম করতে পারে না।

(ঘ) পায়খানা হতে থাকা রোগীকে অবহেলা করা উচিত নয়।

(ঙ) খাদ্য আস্তে আস্তে চিবিয়ে খাওয়া।

১৭. মানুষের শরীরে যদি অগ্ন্যাশয় না থাকত তবে কী হত?

ঘরে করার জন্যে কাজ:

- মধুমেয় রোগীর জন্যে খাদ্যতালিকা তৈরি করো।
- দাঁতের কষ্ট পাওয়া রোগীকে পরামর্শ দাও।
- দুর্বল ব্যক্তিকে স্যালাইন লাগানোর কারণ জিজ্ঞাসা করে বোঝো।
- পাতলা পায়খানা হলে কী করবে এবং এর কী কারণ জিজ্ঞাসা করে বোঝো।

●●●

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাপ ও তাপ সঞ্চারণ

৬.১ গরম ঠান্ডা:

গ্রীষ্মঋতুতে দুপুর বেলা তুমি ঘরের বাইরে দাঁড়ালে গরম অনুভব করো। সেই রকম শীতের ঋতুতে রাতের বেলায় বাইরে দাঁড়ালে তুমি ঠান্ডা অনুভব করো। অন্যপক্ষে চায়ে আঙুল ডুবিয়ে দিলে গরম লাগে এবং বরফ স্পর্শ করলে তোমার ঠান্ডা লাগে। এরকম বিভিন্ন অনুভূতির থেকে মনে ধারণা সৃষ্টি হয় যে 'গরম' ও 'ঠান্ডা' অনুভূতি একটা বস্তুর তাপীয় স্থিতি পরিচায়ক ও পরিমাপক। এসো দেখি এই অনুভূতি সৃষ্ট সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল।

তোমাদের জন্যে কাজ:

তিনটি বড় মগ নাও (মগ না পেলে আর কী নেবে চিন্তা করো)। চিত্র ৬.১ দেখো। মগগুলিকে 'ক', 'খ' ও 'গ' নামে চিহ্নিত করো। 'ক' মগে কিছু উষ্ণ জল নাও। জলটা অল্প গরম আছে বলে কীভাবে জানবে চিন্তা করো। একদম টগবগে ফুটন্ত জল নিও না। 'খ' মগে সাধারণ জল কল থেকে বা বালতি থেকে নাও। 'গ' মগে জল নিয়ে তাকে ঠান্ডা করার জন্যে, তার মধ্যে কিছু বরফের টুকরো ফেলে দাও।

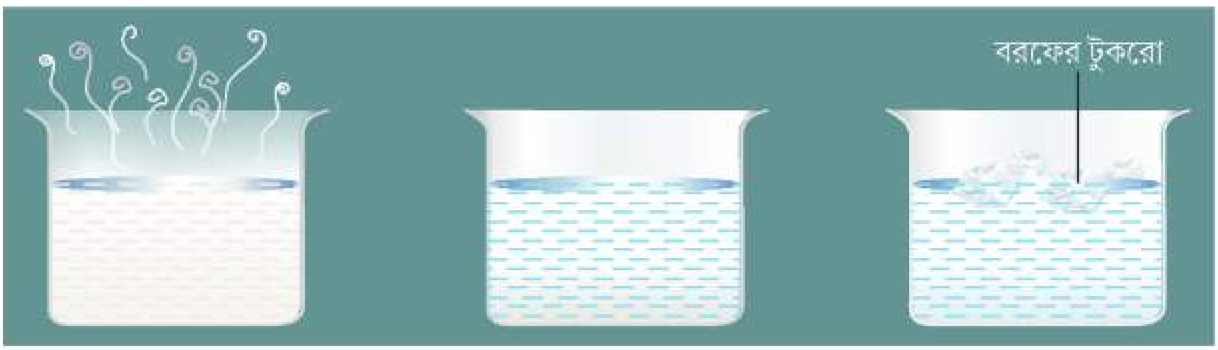

(ক) উষ্ণ জল (খ) সাধারণ জল (গ) ঠান্ডা জল

চিত্র ৬.১ তিনটি মগে থাকা জল

এখন 'ক' পাত্রে তোমার বাম হাত ডোবাও ও তাকে উঠিয়ে এনে 'খ' পাত্রে ডোবাও দেখবে তোমায় 'খ' পাত্রে থাকা জল ঠান্ডা লাগবে। এখন তোমার ডান হাতে 'গ' পাত্রে ডোবাও ও উঠিয়ে এনে 'খ' পাত্রে ডোবাও। দেখবে 'খ' পাত্রের জল গরম লাগবে।

প্রশ্ন ১: এখন বলো তো 'খ' পাত্রের জল 'গরম জল' না 'ঠান্ডা জল'?

এই পরীক্ষা থেকে আমরা জানলাম যে 'গরম' বা 'ঠান্ডা' অনুভূতি একটা বস্তুর তাপীয় স্থিতির পরিচায়ক ও পরিমাপক হতে পারে না। তুমি তোমার বন্ধুর হাত ছুঁয়ে দেখো, বন্ধুর হাত তোমাকে 'গরম' বা 'ঠান্ডা' কিছুই লাগবে না। তোমার বন্ধুর হাতের তাপীয় স্থিতির বিষয়ে তুমি কি কিছু বলতে পারবে?

তোমার জন্যে কাজ ৬.১ পর্যবেক্ষণ থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছালে?

সতর্কতা:
খুব উত্তপ্ত বস্তুকে ছোঁবে না। এমনকি খুব গরম জলে আঙুল ডোবাবে না। এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে হাতে ফোসকা বা পোড়া ঘা হয়ে যেতে পারে।

জানলে ভালো:
পদার্থে থাকা অণুগুলির গতির বেগ বাড়লে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে ও অণুগুলির গতির বেগ কমলে পদার্থের উষ্ণতা কমে।

৬.২: তাপমাত্রা

আমরা জানলাম যে আমাদের স্পর্শ অনুভূতির দ্বারা, আমরা কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থার বিষয়ে সঠিক এবং গ্রহণীয় মতামত দিতে পারব না। এখন তুমি মনে করো যখন তোমার বা তোমার পরিবারের কারো জ্বর হয়ে থাকে, তখন ডাক্তারবাবু এসে যার জ্বর হয়েছে তার শরীরের তাপীয় অবস্থা কীভাবে বুঝতে পাবেন? তোমরা দেখেছ জ্বরো রুগির বগলের তলায় বা জিভের তলায় তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার (Thermometer) রেখে জ্বরো রুগির তাপমাত্রা (Temperature) মাপে ও তার থেকে রুগির তাপীয় অবস্থা জানতে পারে। এই অনুভূতি সিদ্ধ পরীক্ষা থেকে আমরা জানলাম যে একটা বস্তুর তাপমাত্রা বস্তুটির তাপীয় অবস্থার সূচনা দিয়ে থাকে।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.২

একটা জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র নাও ও সেটা নিরীক্ষণ করো। একে লক্ষ করলে দেখবে—

- এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ সেমি।
- এটা একটা সরু এবং সমান (Uniform) কাচের সরু নল।
- এর একটা প্রান্ত চকচক করছে। এই প্রান্তকে তাপমান যন্ত্রে বাল্ব বলা হয় ও এটি অধিক পাতলা।
- কাচের নলের বাকি অংশটুকু এক কৈশিক নল।
- এই কৈশিক নলের অংশে দুটি স্কেল আছে। একটা স্কেলের নাম ^{0}F, অন্যটির নাম ^{0}C লেখা হয়েছে।
- ^{0}C স্কেলের দুই প্রান্তের মাপাঙ্ক 35 ও 42
- ^{0}F স্কেলের দুই প্রান্তের মাপাঙ্ক 94 ও 108

মনে রাখো: তাপমান যন্ত্রের প্রান্তে থাকা বাল্ব পারদে পূর্ণ।

তাপমান যন্ত্রের ইতিহাস

একথা সকলে জানে যে তাপমাত্রা জানার জন্যে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ১৫৯২ সালে বিশ্বের প্রথম তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। ওঁর তৈরি করা তাপমান যন্ত্র একটি কাচের নল ও তা এক কাচের বাল্‌বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। কাচের নলের একটা প্রান্ত খোলা থাকত। একে জলপূর্ণ জারে ডোবালে নলের মধ্যে জল প্রবেশ করত কাচের বাল্‌বের মধ্যে থাকা বায়ুর চাপ অনুযায়ী এই জল ওপরনীচ হত এবং তাকে ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হত। তবে আমরা যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করছি তা ১৬৫৫ সালে তৈরি হয়েছিল। প্রথমে এতে রঙিন অ্যালকোহল ব্যবহার করা হচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে অ্যালকোহলের বদলে পারদ ব্যবহার করা হল।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.৩

এসো তাপমান যন্ত্রের পাঠ্যাঙ্ক কীভাবে নেওয়া হয় শিখব।

- জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র নাও। চিত্র ৬.২ দেখো।

থার্মোমিটার

চিত্র ৬.২ জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র

- এখানে থাকা ^{0}C চিহ্নিত স্কেলকে সেলসিয়াস স্কেল (Celcius Scale) ও ^{0}F চিহ্নিত স্কেলকে ফারেনহাইট স্কেল (Fahrenheit Scale) বলা হয়।
- এর মধ্যে একটা স্কেল (ধরো সেলসিয়াস স্কেল) নিরীক্ষণ করো এবং স্কেলের কাছাকাছি থাকা দুটি বড় দাগের পাঠ্যাঙ্ক নাও। দেখবে এই দুই দাগের পারদ $1^{0}C$ ।
- এই দুটি বড় দাগের মধ্যে থাকা স্থানটি কয়টা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে লক্ষ করো। যদি পাঁচটি সমান ভাগ থাকে, তবে একটা ছোট ভাগের ২৪পাঠ্যাঙ্ক । $\frac{1^{0}C}{5} = 0.2^{0}C$
- এখন তাপমান যন্ত্রটিকে জলে ধুয়ে নাও। অ্যানটিসেপ্‌টিক দ্রবণ (Antiseptic Solution)-এ ধুয়ে নিলে আরও ভালো।
- এবার তাপমান যন্ত্রটিকে চোখের সামনে রেখে স্কেল থাকা অংশে পারদ স্তম্ভকে দেখো। তুমি হয়তো স্তম্ভটি প্রথমে দেখতে পাবে না। এমন অবস্থায় যন্ত্রটিকে সামান্য ঘোরাও। এভাবে ঘোরালে তুমি নিশ্চয়ই পারদ স্তম্ভকে দেখতে পারবে। হয়তো পারদ স্তম্ভের পাঠ্যাঙ্ক $35^{0}C$ দাগের উপরে থাকতে পারে।

- এবার তাপমান যন্ত্রকে হাতে ধরে একবার বা দুবার ঝেড়ে নাও। দেখো যেন পারদ স্তম্ভের পাঠ্যাঙ্ক $35^{\circ}C$ দাগের তলায় চলে যায়।
- এখন তাপমান যন্ত্রের বাল্‌বকে তোমার বগলের তলায় প্রায় দুমিনিট রাখো।
- তারপর তাপমান যন্ত্রকে বের করে এনে তাপমাত্রার পাঠ্যাঙ্ক নাও। পাঠ্যাঙ্ক নেওয়ার সময়ে তাপমান যন্ত্রটিকে কেমন ভাবে ধরবে তা চিত্র ৬.৩-এ দর্শানো হয়েছে।

সতর্কতা

- তাপমান যন্ত্রকে যদি মুখে দাও, তবে ভুলেও বাল্‌বে কামড়ে ফেলবে না।
- একজনের তাপমাত্রা মাপার পর অন্য একজনের তাপমাত্রা মাপার পূর্বে তাপমান যন্ত্রকে জলে ধুয়ে নাও।

চত্র ৬.৩ তাপমাত্রা পাঠ্যাঙ্ক নেওয়ার জন্যে তাপমান যন্ত্রকে ঠিকভাবে ধরার প্রণালী ।

তুমি দেখবে তোমার শরীরের তাপমাত্রা $37^{\circ}C$ বা $98.4^{\circ}F$। এখন তোমার কয়েকজন বন্ধুর শরীরের তাপমাত্রা আগের মতো মাপো। সারণী ৬.১-কে তোমার খাতায় এঁকে সেখানে তোমার শরীরের তাপমাত্রা লেখো। মনে রেখো সকলের ক্ষেত্রে তাপমান যন্ত্রটি একভাবে ব্যবহার করা হবে। (বগলের তলায় বা জিভের নীচে)

সারণী ৬.১

কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা

ছাত্রছাত্রীর নাম	সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা	ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা

জানলে ভালো: সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

সারণী ৬.১ লক্ষ করলে জানতে পারবে যে তোমাদের সকলের শরীরের তাপমাত্রা সমান নয়। যদিও ইহা প্রায় $37^{\circ}C$ বা $98.4^{\circ}F$।

প্রশ্ন ২: তবে 37°C বা 98.4°F কার শরীরের তাপমাত্রা ?

সুস্থ মানুষের শরীরের মোটামুটি তাপমাত্রা 37°C বা 98.4°F। একে মানুষের শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা বলা হয়। যদি তোমার জ্বর হয়ে থাকে তবে তোমার শরীরের তাপমত্রা 98.4°F থেকে অধিক থাকে। অবশ্য রোদে হেঁটে হেঁটে এলে বা খেলাধুলো করে আসার পর শরীরের তাপমাত্রা 98.4°F থেকে একটু বেশি থাকে। কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে চলন্ত পাখার তলায় বসলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। কিন্তু জ্বর হয়ে থাকলে পাখার নীচে বসলেও তাপমাত্রা হ্রাস পায় না।

প্রশ্ন ৩: জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্রের দুপ্রান্তের মাপাঙ্ক 35°C বা 42°C কেন বলতে পারবে? তোমার বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করো।

যেহেতু মানুষের শরীরে তাপমাত্রা 35°C থেকে কম বা 42°C থেকে বেশি সাধারণত হয় না, তাই জ্বরের যন্ত্রের দুই প্রান্তের মাপাঙ্ক 35°C ও 42°C।

প্রশ্ন ৪: এমন দুটি অবস্থা বলো যেখানে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ৩৭০ষ্ঠ বা ৯৮.৪০চতলায় চলে যাবে।

সতর্কতা: জ্বরের তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করে কেবল মানুষের শরীর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর তাপমান মাপার জন্যে ব্যবহার কোরো না। এমনকি একে গরম জলেও ডোবাবে না। একে রোদে কিংবা আগুনের কাছেও রাখবে না। এটা ভেঙে যেতে পারে।

৬.৩ তাপমান যন্ত্রের পারদের ব্যবহার

তুমি তোমার অনুভূতির থেকে জানো যে কোনো পদার্থকে—

- তাপ প্রায়োগ করলে তা গরম হয়ে যায় অর্থাৎ তা তাপমাত্রা বাড়ে। যেমন জলকে তাপ প্রয়োগ করলে তা গরম হয় এবং কিছু সময় পরে টগবগ করে ফোটে। তার থেকে বাষ্প বের হয়।
- তাপ অপসারণ করলে পদার্থের তাপমাত্রা কমে।

প্রশ্ন ৫: তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের তাপমাত্রা বাড়ার ও তাপ অপসারণ হলে পদার্থের তাপমাত্রা কমার দুটো করে উদাহরণ দাও।

তাপমাত্রা বদলানোর জন্যে পদার্থ প্রসারিত বা সংকুচিত হয় তাই বৈজ্ঞানিকরা ঠিক করলেন বস্তুর প্রসারণ বা সংকোচন জানলে এই ভৌতিক পরিবর্তনকে ব্যবহার করে পদার্থের তাপমাত্রা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারা যাবে। কোনো পদার্থ যদি তার তাপমাত্রা বাড়া অনুযায়ী সমপরিমাণে প্রসারিত হয় এবং তার প্রসারণ মাপা যদি সহজ হয় তবে সেই পদার্থ তাপমাত্রা নির্ণয় করায় ব্যবহৃত হয়। তরল ধাতু, পারদের কিছু বিশেষ গুণ থাকায় তাকে তাপমান যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৬: পারদের কী কী বিশেষ গুণ আছে বলে তুমি ভাবছ বা জেনেছ তা তোমার খাতায় লেখো।

এর পরের পৃষ্ঠায় যা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে তোমার খাতায় লিখে থাকা পারদের বিশেষ গুণের তুলনা করো। তোমার যে উত্তরগুলিকে ভুল বলে জানলে সে বিষয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

মনে রাখো:

পারদের বিশেষ গুণ

- পারদ একটা ধাতু হলেও তরল পদার্থ হয়ে থাকায় যে কোনো কাচের নলে একে নিয়ে তাপপ্রয়োগ করলে এর প্রসারণ মাপার সুবিধে হয়।
- এটা এক অস্বচ্ছ ও উজ্জ্বল তরল পদার্থ হয়ে থাকায় তাপমান যন্ত্রে কাচের মধ্যে দিয়ে সহজে চকচকে হয়ে দেখা যায় ও সহজে পড়া যায়।
- এটি নলের গায়ে লেগে থেকে যায় না।
- অন্য তরল পদার্থের তুলনায় অতি কম তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে এটি অধিক প্রসারিত হয়ে থাকে।
- ওপরে বর্ণিত ফর্মের জন্যে নির্ধারিত পদার্থের তাপমাত্রা নির্ণয় করার জন্যে এটি পদার্থ থেকে অনেক কম পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে এবং সেই পদার্থের তাপীয় অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করে না।
- এটি সহজেই শুদ্ধ অবস্থাতে পাওয়া যায়।
- এর স্ফুটনাঙ্ক (Boiling Point) 357°C এবং হিমাঙ্ক (Freezing Point) -39°C হয়ে থাকায় একে নিয়ে গঠিত তাপমান যন্ত্রের পরাম (Range) যথেষ্ট অধিক।

৬.৪ পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্র

আমরা আমাদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করি। কিন্তু অন্যান্য বস্তু (যথা: উত্তপ্ত জল) দের তাপমাত্রা কীভাবে মাপা হয়। আবশ্যকতা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় বা অবস্থায় বিভিন্ন তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৭: খবরের কাগজে প্রায়শ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রত্যেকদিনের আবহাওয়া সম্বন্ধীয় খবর নির্দিষ্ট স্তম্ভে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সেখানে নির্দিষ্ট শহরের পূর্বদিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উল্লিখিত থাকে, এটা কীভাবে মাপা হয়?

(এ বিষয়ে তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো)।

তোমার পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত তাপমান যন্ত্রকে পরীক্ষাগার তাপমান যন্ত্র বলা হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.৪

তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছ থেকে পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্রটি সংগ্রহ করো।

- সেখানে থাকা স্কেলটি °C না °F লক্ষ করো। চিত্র ৬.৪ দেখো।
- সেই তাপমান যন্ত্রটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কত তাপমাত্রা মাপতে পারবে তা নিরীক্ষণ করে নিজের খাতায় লেখো। তুমি দেখবে যে এই দুটো তাপমাত্রা সাধারণত 110°C ও -10°C।
- সেই তাপমান যন্ত্রের পরাম (Range) কত তোমার খাতায় নির্ণয় করো।

- জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রণালী প্রয়োগ করে এই পরীক্ষাগারে তাপমান যন্ত্রের সবথেকে ছোট দাগের মধ্যে ব্যবধান কত তাপমাত্রা তা নির্ণয় করো। মনে রাখো সব থেকে কম, এতটা তাপমাত্রা এই তাপমান যন্ত্রটি মাপতে পারবে।
- উপরোক্ত গণনার আবশ্যকতার বিষয়ে তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো।

এই তাপমান যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করব এসো শিখব।

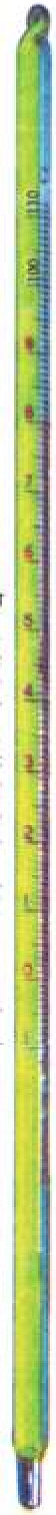

চিত্র ৬.৪: একটি পরীক্ষাগার তাপমান যন্ত্র

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.৫

একটা বিকারে কিছু জল কল থেকে নাও। এখন পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্রটি এর মধ্যে ডোবাও।

- যেন তাপমান যন্ত্রের বাল্‌বটি ডুবে যায়।
- যত্ন নাও যেন বাল্‌বটি বিকারের পার্শ্বে বা তলার অংশকে স্পর্শ না করে।
- তাপমান যন্ত্রকে ভূলম্ব করে রাখো। চিত্র ৬.৫ দেখো।
- তাপমান যন্ত্রের নলের ভেতরে ওপরদিকে উঠতে থাকা পারদ স্তম্ভকে দেখো।
- পারদ স্তম্ভ স্থির হয়ে গেলে তার পাঠ্যাঙ্ক নাও। এই পাঠ্যাঙ্কই বিকারে থাকা জলের তাপমাত্রা।

চিত্র ৬.৫: একটি পরীক্ষাগার তাপমান যন্ত্র

চিত্র ৬.৫ পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করে বিকারে থাকা জলের তাপমাত্রা মাপো।

- এবার তোমার বন্ধুদের বলে তাদের দ্বারা জলের তাপমাত্রা মাপাও।

প্রশ্ন ৮: তুমি ও তোমার বন্ধুদের দ্বারা মাপা উক্ত জলের তাপমাত্রার পাঠ্যাঙ্ক সমান না ভিন্ন? জল অপরিবর্তিত থাকায় পাঠ্যাঙ্কের এমন বিভিন্নতা কেন?

(তুমি এ বিষয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো। তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তা তোমার খাতায় লেখো।)

এখন এই প্রশ্নের উত্তর, এসো কিছু পরীক্ষা করে নির্ণয় করব।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.৬

একটা বিকারে কিছু গরম জল নাও। পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্রটি তাতে ডোবাও। পারদস্তম্ভটি ওপরে উঠে স্থির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর তাপমত্রা পাঠ্যাঙ্ক নাও। এটা সেই গরম জলের তাপমাত্রা। এখন তাপমান যন্ত্রটিকে জল থেকে বের করে আনো এবং পারদ স্তম্ভকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করো। তুমি দেখবে যে গরম জল থেকে তাপমান যন্ত্রটিকে বের করে আনার সঙ্গে সঙ্গে পারদস্তম্ভ আপনাআপনি তলায় নেমে এল। এই পরীক্ষা থেকে আমরা জানলাম যে গরম জলের তাপমাত্রা জানতে হলে সেই জলের মধ্যে তাপমান যন্ত্র ডুবে থাকা অবস্থায় আমাদের তাপমাত্রা পাঠ্যাঙ্ক নিতে হবে। এখন বুঝতে পারবে, কেন তোমার ও তোমার বন্ধুদের দ্বারা পাওয়া পাঠ্যাঙ্কের বিভিন্নতা দেখা গেল।

মনে রাখো: পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করার সময়ে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করবে।

- তাপমাত্রা যন্ত্রটি ভূলম্ব করে রাখবে, কাত করে রাখবে না। চিত্র ৬.৫-কে আবার দেখো।
- বাল্‌বটি সম্পূর্ণভাবে জলের ভেতরে ডুবে থাকা আবশ্যক। চিত্র ৬.৫-কে দেখো।
- বাল্‌বটি পাত্রের পার্শ্ব তথা তলার অংশকে ছোঁয়া উচিত নয়। চিত্র ৬.৫-কে দেখো।
- তাপমান যন্ত্রটি জলের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থাতেই তাপমাত্রার পাঠ্যাঙ্ক নেবে।

এখন মনে প্রশ্ন ওঠে যে জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করার সময়ে, তাপমান যন্ত্রটিকে জিভের তলা থেকে বাইরে বের করে এনে, তাপমাত্রার পাঠ্যাঙ্ক নেওয়া হয়। অথচ পরীক্ষাগার তাপমান যন্ত্রের ক্ষেত্রে, বাইরে বের করে এনে তাপমাত্রা নিলে ভুল পাঠ্যাঙ্ক বেরোয়। এরকম বিভিন্নতা কেন?

এখন জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র ও পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্র পাশাপাশি রেখে নিরীক্ষণ করো। তুমি দেখবে জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্রের বাল্‌ব ও কৈশিক নলের মধ্যে একটা বিভঙ্গ (Kink) আছে। চিত্র ৬.৬ দেখো। যখন জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্রকে জিভের তলা থেকে বের করে আনা হয় তখন এই বিভঙ্গ পারদস্তম্ভকে সংকুচিত হতে দেয় না। কারণ স্তম্ভের বাল্‌বে থাকা পারদের সঙ্গে সংযোগ সেই বিভঙ্গের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে কৈশিক নলের পারদ স্তম্ভটি স্থির থাকে। সেই জন্যে জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র পুনর্বার ব্যবহার করতে হলে তাপমান যন্ত্রকে একবার দুবার ঝেড়ে নিতে হয়।

এখন নিরীক্ষণ করো। পরীক্ষাগার তাপমান যন্ত্রে এই বিভঙ্গ নেই।

চিত্র ৬.৬ তাপমান যন্ত্রে থাকা বিভঙ্গ (Kink)।

প্রশ্ন ৯: পরীক্ষাগারে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করে তুমি তোমার শরীরের তাপমাত্রা মাপতে পারবে কি?

জানলে ভালো: তাপমান যন্ত্রে পারদের ব্যবহারকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা খুব চিন্তিত। কারণ পারদ একটা খুব বিষাক্ত (Toxic) পদার্থ এবং একে সহজে শরীর থেকে বের করতে পারা যায় না। সেই জন্যে বৈজ্ঞানিকরা ডিজিটাল উদ্ভাবন করেছেন। যেখানে পারদকে তাপমাত্রা মাপক পদার্থরূপে ব্যবহার করা হয়নি।

৬.৫ তাপ সঞ্চারণ

তোমার জন্যে কাজ: ৬.৭

তুমি তোমার মাকে সস্‌পেনে কিছুটা জল গরম করতে বলো। এখন একটা স্টিলের গ্লাস নিয়ে সেখানে এই গরম জল ঢালো দেখবে স্টিলের গ্লাসটি গরম হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। আমরা জানি তাপপ্রয়োগ করলে পদার্থের তাপমাত্রা বাড়ে ও তা গরম হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা গ্লাসকে উনুনের উপরে বসিয়ে বা রোদে রেখে গরম করিনি। তবে গ্লাস গরম কী করে হল? এখানে গ্লাসটি কেবল গরম জলের সংস্পর্শে এসে গরম হয়ে গেল। তাই গ্লাসটি নিশ্চয়ই গরম জল থেকেই তাপ গ্রহণ করেছে। তবে প্রথমে জল গরম ছিল ও গ্লাসটি গরম ছিল না। অর্থাৎ জলের তাপমাত্রা গ্লাসের তাপমাত্রার থেকে বেশি ছিল। এখান থেকে আমরা জানলাম—

- দুটি পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে অধিক উত্তপ্ত পদার্থ থেকে তাপ কম উত্তপ্ত পদার্থকে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

কিছু সময় অপেক্ষা করলে দেখবে যে গ্লাসটি আর অধিক উত্তপ্ত হবে না। যদিও গরম জল সেই গ্লাসের ভেতরে থাকবে। এই অবস্থাকে পদার্থ দুটির তাপীয় সমতা অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় উভয়ের তাপমাত্রা সমান থাকে।

মনে রাখো: উভয় পদার্থের তাপমাত্রা সমান হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে তাপ সঞ্চারণ হয় না।

এখন তোমার খাতায় নিম্নলিখিত সারণীটি আঁকো। তুমি দেখে থাকা ও বিভিন্ন তাপমাত্রায় থাকা দুটি পদার্থের সংস্পর্শে এলে তাপ কোন্ পদার্থ থেকে কোন্ পদার্থে সঞ্চারিত হয় তা সারণীতে লেখো।

সারণী ৬.২ তাপ সঞ্চারণের দিক

প্রথম বস্তু	দ্বিতীয় বস্তু	যে বস্তুর তাপমাত্রা বেশি	তাপ কোন্ বস্তু থেকে কোন্ বস্তুতে সঞ্চারিত হবে যদি পদার্থ দুটি সংস্পর্শে আসে
গ্লাস	গরমজল	গরমজল	গরমজল ⟶ গ্লাস
গ্লাস	ফ্রিজের জল	গ্লাস	গ্লাস ⟶ ফ্রিজের জল

এসো দেখব তাপ কীভাবে সঞ্চারিত হয়—

তোমাদের জন্যে কাজ:

একটুকরো তামার তার নিয়ে এর একটি মাথা হাতে ধরে অন্য প্রান্তটিকে উনুনের উপর অথবা এক জলন্ত মোমবাতির উপর রাখো। কিছু সময় পরে, হাতে ধরে থাকা অংশ গরম লাগবে। এই অংশটিও অগ্নির সঙ্গে সোজাসুজি কোনো সংস্পর্শে আসেনি। তবে কী করে গরম হল?

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.৯

একটা লোহা বা অ্যালুমিলিয়াম দণ্ড নিয়ে এর উপরে অল্প অল্প ব্যবধানে কিছু কিছু মোম জমিয়ে দাও। এখন এই মোমগুলির উপর একটা করে পিন কাঁটা লাগিয়ে দাও। একটা ক্ল্যাম্প স্ট্যান্ডের সাহায্যে দণ্ডটিকে এমনভাবে লাগিয়ে রাখো যেন দণ্ডটি প্রায় ভূসমান্তর হয়ে থাকবে। এবং পিনকাঁটাগুলি তলার দিকে ঝুলে থাকবে। যদি স্ট্যান্ড না পাওয়া যায় তবে দণ্ডটির একটা মাথা গুটি ইটের মধ্যে চেপে রাখো। চিত্র ৬.৭ দেখো।

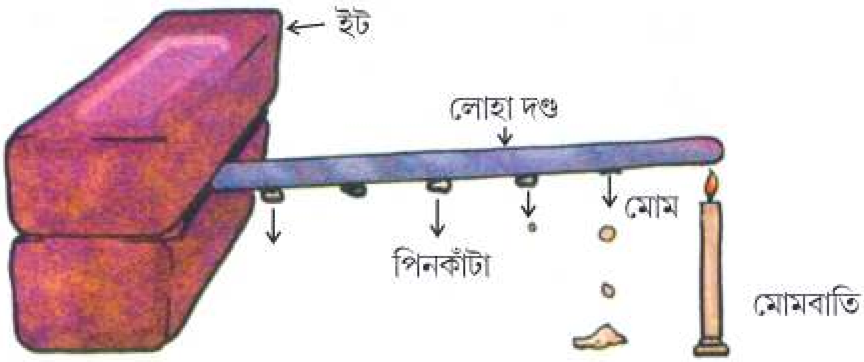

চিত্র ৬.৭ একটা ধাতু দণ্ডর মধ্যে তাপ সঞ্চারণ।

এখন দণ্ডটির অন্য মাথাটিকে মোমবাতির সাহায্যে গরম করো। তুমি দেখবে কিছু সময় পর দণ্ডটির যে মাথাটা উত্তপ্ত করা হল তার সবথেকে কাছের অংশে মোম গলে গিয়ে পিন কাঁটাটি খুলে পড়ল। এখান থেকে আমরা জানলাম—

- যেহেতু মোম গলে গেল ওখানে নিশ্চয়ই তাপ এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যে মাথাটিকে উত্তপ্ত করা হল সে মাথার থেকে তাপ ধাতব দণ্ড দিয়ে সঞ্চারিত হয়েপ্রথম মোমের কাছে পৌঁছে গেছে।

দেখা গেল প্রথন পিন খুলে পড়ার কিছু সময় পর তার পাশের পিনটি খুলে পড়বে। এখান থেকে জানা গলে যে—

- উপরের সিদ্ধান্তটি সত্য।
- কারণ কিছু সময়ের অন্তরালের ভেতরে তাপ ধাতু দণ্ড দিয়ে প্রথম মোমের জায়গা থেকে দ্বিতীয় মোমের জায়গা পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে গেছে।
- তাপ তখনও পর্যন্ত তৃতীয় মোমের স্থান সঞ্চারিত হয়নি, কারণ সেখানকার মোম গলেনি। তাই সেই পিন কাঁটাটি খুলে পড়েনি।

যদি এই সিদ্ধান্ত সব ঠিক হয়ে থাকে তবে বিভিন্ন সময়ের অন্তরালে একটার পর একটা পিন ক্রমাগতভাবে খসে পড়বে বলে আমরা অনুমান করতে পারব। কিছু সময় অপেক্ষা করলে আমাদের এই অনুমানটি সত্য বলে তোমরা উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে দেখতে পারবে।

তাই আমরা জানলাম যে দণ্ডের উত্তপ্ত মাথার থেকে তাপদণ্ডটির শীতল মাথার দিকে দণ্ডের মাধ্যমে সঞ্চারিত হল। কঠিন পদার্থের মধ্যে তাপ এই উপায়ে সঞ্চারিত হয়। ইহাকে 'পরিবহন' (Conduction) প্রক্রিয়া বলা হয়।

জানলে ভালো: এখানে দেওয়া চিত্র দেখো। চিত্রে একটা ঘরে আগুন লেগেছে। পাশের কুয়ো থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। লোকেরা লাইন করে কুয়ো থেকে ঘর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। এখন জল নিয়ে ঘর অবধি পৌছানোর জন্যে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। কুয়োর কাছের লোক একবালতি জল কুয়োর থেকে বের করে দ্বিতীয় লোকটিকে বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় লোক তৃতীয় লোককে সেই বালতি বাড়িয়ে দেবে। এই প্রক্রিয়ায় চালু রাখলে কোনো লোক তাদের স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও জলের বালতি ঘরের কাছে পৌছে যাবে।

চিত্র ৬.৮ পরিবহন বোঝার জন্যে এক সাদৃশ্য ঘটনা

পরিবহন প্রক্রিয়া ও উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য আছে। সামঞ্জস্যগুলি হল

- কুয়োকে মোমবাতি বলে ভাবো।
- জলের বালতিকে তাপ বলে ধরো।
- লোকেদের লাইনটিকে ধাতুদণ্ড বলে ধরে নাও।
- প্রত্যেক মানুষকে দণ্ডে থাকা অণু ভেবে নাও।
- ঘরটিকে দণ্ডটির শীতল মাথা বলে ধরো।

তাহলে বুঝতে পারবে যে পরিবহন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপ সঞ্চারণে কঠিন বস্তুর অণুগুলি তাদের স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয় না। বস্তুর যে অণুগুলির অগ্নির সংস্পর্শে আসে তার তাপশক্তি গ্রহণ করে। ফলে এই অণুদের হারাহারি যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই এই অণুগুলি (বিচ্ছিন্ন না হয়ে) তাদের মাঝের স্থানের থেকে অধিক বেগে প্রকম্পিত হয়। এই কম্পন রত অণু তাদের কাছের অণুদের কিছু কম্পন সঞ্চারণ করে। এই প্রক্রিয়ার অণুগুলি নিজেই নিজের স্থান পরিত্যাগ করে না কিন্তু তাপশক্তি এ মাথা থেকে ও মাথা সঞ্চারিত হয়। ইহাই পরিবহন প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন ১০: তোমার জন্যে কাজ ৬.৯-এ বর্ণিত পরীক্ষাটিকে তুমি যদি লোহা বা অ্যালুমিলিয়াম দণ্ডের বদলে কাঠের দণ্ড নিয়ে করো তাহলে কি সেখানে লেগে থাকা পিন কাঁটা সেরকম ক্রমাগতভাবে খসে পড়বে?

এই প্রশ্নের যে উত্তর তুমি দিলে চলো তার সত্যাসত্য পরীক্ষা করে নির্ণয় করব।

তোমাদের জন্যে কাজ:

একটা বিকারে কিছু পরিমাণে গরম জল নাও। সেই গরম জলে একটা স্টিলের চামচ, প্লাস্টিক চামচ, পেনসিল, ডিভাইডার, (জ্যামিতি বাক্সের), একটা কাঠি ডুবিয়ে রাখো। চিত্র ৬.৯ দেখো।

চিত্র ৬.৯ বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন

তারপর প্রত্যেক বস্তুর জলের বাইরে থাকা প্রান্তটিকে ছুঁয়ে দেখো। তোমার খাতায় তলার সারণীকে এঁকে সেখানে তোমার অনুভূতি লেখো।

সারণী ৬.৩ বিভিন্ন পদার্থে তাপের পরিবহন

বস্তু	বস্তুটি যে পদার্থে তৈরি	অন্য প্রান্তটি গরম হল কি ? হ্যাঁ/না
স্টিলের চামচ	ধাতু/স্টিল	হ্যাঁ

সারণী ৬.৩ লক্ষ করলে তুমি জানতে পারবে যে ধাতুর তৈরি বস্তুর মধ্যে তাপ, পরিবহন (Conduction) প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয় যে পদার্থের মাধ্যমে তাপ পরিবহনের প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয়, তাদের তাপের সুপরিবাহী বলে। অন্যপক্ষে প্লাস্টিক, কাঠ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ হয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে তাপ সঞ্চারিত হয় না। এদের তাপ সুপরিবাহী বলা হয়।

প্রশ্ন ১১: ধরো একটা লাঠি আছে, যার লম্বার দিকে অর্ধেকটা তামা ও অর্ধেকটা কাঠের তৈরি। তলায় চিত্র দেখো। এই লাঠিটির তামা ও কাঠের মিলিত স্থানে একটা কাগজের মতো ধরে জ্বলন্ত দীপ বা মোমবাতি দিয়ে উত্তপ্ত করলে কী হবে? তোমাদের উত্তরটিকে পরিবহন নীতি ব্যবহার করে বোঝাও।

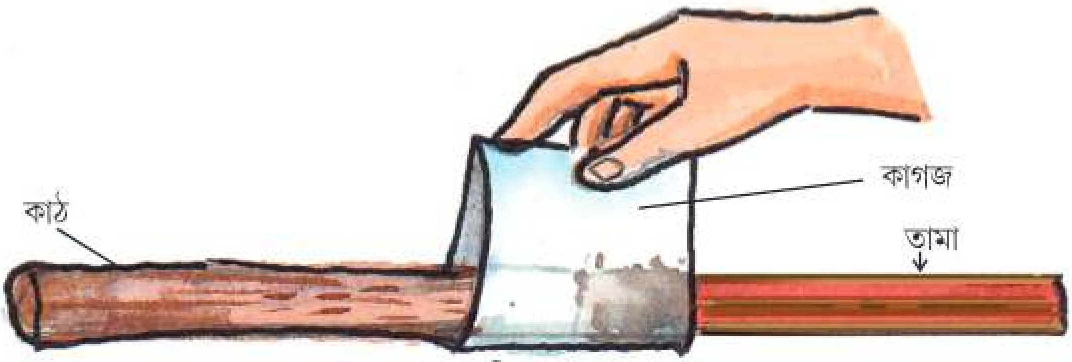

চিত্র ৬.৯ (খ)

জানার কথা: খনিগুলিতে অনেক সময়ে দহনীয় গ্যাস নির্গত হয়ে থাকে। ফলে নগ্ন অগ্নি বা শিখার সংস্পর্শে এলে খনিতে বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে খনিগুলিতে ডেভির নিরাপদ বাতি (Devy's Safety Lamp) ব্যবহার করা হয়। ধাতব পদার্থের অত্যধিক তাপ পরিবহন ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ডেভির নিরাপদ বাতিতে শিখার চারধারে তামার তারের জালি দেওয়া থাকে। তাই বাতির শিখা তামার তারের জালি অতিক্রম করে বাইরে এসে বিস্ফোরণ ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা কঠিন পদার্থের তাপ পরিবহনের বিষয়ে জানলাম। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জল ও বায়ু তাপের কুপরিবাহী। তবে জলের মাধ্যমে তাপ কীভাবে সঞ্চারিত হয় এসো দেখব।

তোমাদের জন্যে কাজ:

একটা সমতলভূমি বিশিষ্ট ফ্লাস্ক (Flat bottom Flask) বা একটু বড় আকারের একটা বিকার নাও। পাত্রের তিন চতুর্থাংশ আয়তন পর্যন্ত জল দাও। পাত্রটিকে এমনভাবে রাখো যেন তার তলায় একটা মোমবাতি বা স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন্ট বার্নার রেখে জল গরম করতে পারা যাবে। চিত্র ৬.১০ দেখো। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট স্ফটিক থেকে একটুকরো জলের ভেতর পাত্রের নীচের অংশে সাবধানে রাখো। এর জন্যে তুমি একটা স্ট্র ব্যবহার করতে পারো। ঠিক স্ফটিক থাকা স্থানের তলায় মোমবাতি রেখে পাত্রটিকে গরম করো। এখন নিরীক্ষণ করো কী হচ্ছে ও যা নিরীক্ষণ করলে তা খাতায় একটা চিত্র এঁকে বর্ণনা করো।

চিত্র ৬.১০ পরিচলন প্রক্রিয়ায় জলের তাপের সঞ্চারণ

পাত্রের নিম্ন অংশে তাপ প্রয়োগ করলে, সেখানে থাকা জলের অণু বা কণিকাগুলিকে প্রথমে তাপ গ্রহণ করে ও উত্তপ্ত হওয়ার ফলে হালকা হয়ে উপরে ওঠে, জলের ওপর স্তরে থাকা শীতল ও ভারী কণিকাগুলির

পাত্রের পার্শ্ব দিয়ে তলায় নেমে আসে। পরের মুহূর্তে তারাও তাপ গ্রহণ করে ওপরে ওঠে। কণিকাগুলি এভাবে নিরন্তরভাবে তলা-উপর-তলা গতির জন্যে জলে একটা পরিচলন স্রোত সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চারিত হয়ে জলের সমস্ত অংশে কিছু সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। ফলে পাত্রে থাকা জলের সমস্ত অংশে সমানভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারর তাপ সঞ্চারনকে 'পরিচলন' (Convection) বলা হয়।

প্রশ্ন ১২: পাত্রে থাকা জলের ভেতর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট স্ফটিক কেন নেওয়া হয়েছিল বলো।

জানলে ভালো: এখন পেছনের পৃষ্ঠা উলটিয়ে চিত্র ৬.৮ দেখো। কুয়ো থেকে জল নিয়ে ঘরের কাছে পৌঁছানোর একটা প্রক্রিয়া সেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল।

বিকল্প প্রক্রিয়া:

অন্য এক উপায়ে কুয়ো থেকে জল নিয়ে ঘরের কাছে পৌঁছনো যাবে। উপায়টি হচ্ছে প্রথমে প্রথম লোকটি জলের বালতি বের করে নিজে গিয়ে ঘরের কাছে গিয়ে সেখানে জল ঢালবে। ততক্ষণে দ্বিতীয় লোকটি জলের বালতি নিয়ে ওই ঘরের কাছে যাবে, এক্ষেত্রে সাদৃশ্য হল—

- কুয়োকে মোমবাতি ধরে নাও।
- বালতির জল তাপ
- প্রত্যেক লোক জলের কণিকা
- ঘরটি পাত্রে থাকা জলের ওপর স্তর
- কুয়োর কাছের অঞ্চলটি পাত্রে থাকা জলের নিম্ন অংশ।

এখন এই সামঞ্জস্যকে অনুধ্যান করলে বুঝতে পারবে যে, যে পরিচলন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপ সঞ্চারণে বস্তুর কণিকাগুলি (এখানে লোক) নিজের স্থান পরিত্যাগ করে তাপকে বস্তুর একটা স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চারিত করে থাকে। ইহাই পরিচলন প্রক্রিয়া। বায়ুতেও এই পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এসো একটা ছোট পরীক্ষা করব।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৬.১২

একটা মোটা কার্ডবোর্ড নাও। এর চার কোণে চারটি আলু রাখো। আলুতে একটা করে জ্বলন্ত ধূপকাঠি ভূলম্বভাবে গুঁজে দাও। দেখবে ধূপকঠির চারটির ধোঁয়া উপরে উঠছে। এখন কার্ডবোর্ডের কেন্দ্রে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি স্ট্যান্ড দিয়ে রাখো।

এখন লক্ষ করলে দেখবে যে ধূপকাঠিদের ধোঁয়া আর ওপরে উঠছে না, তার তলার দিকে বেঁকে মোমবাতির দিকে আসছে, এবং তারপর ওপরে উঠছে।

ধোঁয়ার গতিতে এ প্রকার পরিবর্তন কেন হল? একটু ভাবো ও যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তা তোমার খাতায় লেখো।

এক্ষেত্রে জ্বলন্ত মোমবাতি রাখার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির শিখার নিকটবর্তী বায়ু কণিকা উত্তপ্ত হল। ফলে তা হালকা হয়ে যাওয়ায় ওপরে উঠল। সেই খালি স্থান পূরণ করার জন্যে মোমবাতি চারধার থেকে শীতল বায়ু মোমবাতির কাছে এল, এবং সেই প্রবাহে ধূপকাঠির ধোঁয়াকে বাঁকিয়ে তলায় আনল। এই শীতলবায়ু, মোমবাতি শিখার সংস্পর্শে এসে উত্তপ্ত হয়ে ওপরে গেল। তাই এটিও একটা পরিচলন প্রক্রিয়া। কারণ এই প্রক্রিয়াটিতেই জল গরম হয়েছিল।

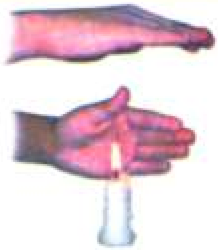

মনে রাখো: কেবর জল ও বায়ু না, সব তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের তাপ সঞ্চারণ, পরিচলন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

তবে পারদ তরল হয়ে থাকলেও একটি ধাতু। এবং পারদের তাপ সঞ্চারণ, পরিবহন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

প্রকৃতিতে ঘটতে থাকা ঘটনায় পরিচলনের পরিপ্রকাশ

যেহেতু পৃথিবী বায়ুর এক আস্তরণ দ্বারা আবৃত, তাই এই আস্তরণের তাপমাত্রার পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে ঘটে, সেখানে পরিচলন প্রক্রিয়া বিভিন্নরূপে সক্রিয় হয়ে থাকে। এসো তার মধ্যে থেকে দুটি প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানব।

প্রক্রিয়া ১:

এই প্রক্রিয়াটি চমৎকার ও উপভোগ্য প্রাকৃতিক অনুভূতি। তুমি তোমার কোনো এক ছুটিতে সমুদ্রকূলে গিয়ে দু-তিনদিন থাকার জন্য যোজনা করো, অথবা যে গিয়ে এরকম থেকে এসেছে তার সঙ্গে আলোচনা করো।

দিনের বেলা স্থলভাগ, জলভাগের তুলনায় তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়ে থাকে। তাই স্থলভাগের তাপমাত্রা জলভাগের তাপমাত্রা থেকে বেশি হয়ে থাকে। ফলে স্থলভাগের সংস্পর্শে থাকা বায়ু হালকা হয়ে ওপরে ওঠে। তার স্থান পূরণ করার জন্য জলভাগের (সমুদ্র) সংস্পর্শে থাকা শীতল বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। দিনের বেলা জলভাগের থেকে স্থলভাগে বয়ে আসা, এই উপভোগ্য বাতাসকে 'সমুদ্র সমীর' (Sea Breeze) বলা হয়। সেইজন্য সমুদ্রকূলে থাকা ঘরগুলির সব জানালা, দরজা মুখ সমুদ্রের দিকে হয়ে থাকে।

রাতের বেলায় এ প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া হয়। রাতে স্থলভাগ, জলভাগের তুলনায় শীঘ্রই শীতল হয়ে যায়। ফলে জলভাগের তাপমাত্রা, স্থলভাগের থেকে বেশি থাকে। তাই রাতে জলভাগের সংস্পর্শে থাকা বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়, এবং তার স্থান পূরণ করার জন্যে স্থলভাগের সংস্পর্শে থাকা শীতল ও ভারী বায়ু জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বাতাসকে 'স্থল সমীর' (Land Breeze) বলা হয়। চিত্র ৬.১১ দেখো।

চিত্র ৬.১১ স্থল সমীর ও সমুদ্র সমীর

বায়ুতে পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চারণে জন্যেই 'সমুদ্র সমীর' ও 'স্থল সমীর' সৃষ্টি হয়।

প্রক্রিয়া ২:

এই প্রক্রিয়াটিও এক চমৎকার প্রাকৃতিক অনুভূতি। কিন্তু এটা সময়ে সময়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, এবং প্রচুর জনজীবন নষ্ট করে দেয়।

রোদের দিনে বা গরমকালে, কোনো স্থানের তাপমাত্রা অধিক হয়ে গেলে, সে স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়। ফলে তার স্থান পূরণ করার জন্য চারদিক থেকে শীতল বায়ু ক্ষিপ্রবেগে সেই স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্রোত চারিদিক থেকে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে সেই স্থানে আসতে থাকায় সেই প্রবাহে ঘূর্ণিবায়ু (Whirl wind) সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত উপত্যকায় এই অবস্থা সৃষ্টি হলে ঘূর্ণিবায়ু য়ে স্থান থেকে বেরোতে না পেরে, সেই উপত্যকার অনেক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে। অন্যপক্ষে এই প্রক্রিয়া এক বিস্তৃত অঞ্চলে সক্রিয় হলে ঘূর্ণিবাত্যা (Cyclone) সৃষ্টি হয়।

এই প্রক্রিয়াতে বায়ুতে 'পরিচলন'-এর দ্বারা তাপ সঞ্চারণের এক দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ১৩: পরিচলন দ্বারা বায়ুতে তাপ সঞ্চারণের জন্য প্রকৃতিতে সৃষ্টি হওয়া, এবার তিনটি প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দাও।

আমরা দিনের বেলা বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের গরম লাগে। বাইরে আমরা কেবল সূর্য থেকেই তাপ গ্রহণ করে থাকি। মনে শত প্রশ্ন ওঠে, সূর্যের তাপ আমাদের কাছে কীভাবে এসে পৌঁছয়। মনে এমন প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কারণ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে থাকা মহাকাশের অধিকাংশ অংশে কোনো মাধ্যম নেই। অথচ আমরা এই পর্যন্ত জানলাম যে তাপ পরিবহন ও পরিচলন, পদার্থের কণিকা বা অণুগুলির সহযোগেই সম্ভব হয়ে থাকে। যে উপায়ে তাপ সূর্যের কাছ থেকে নির্গত হয়ে, বিনা মাধ্যমে এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়, তাকে বিকিরণ (Radiation) বলা হয়। তাই, মাধ্যম থাক বা না থাক উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপ বিকিরণ দ্বারা চতুর্দিকে সঞ্চারিত হয়।

উদাহরণ:

- হিটারের সামনে আমরা বসলে বিকিরণের মাধ্যমেই হিটারের থেকে নির্গত তাপ পেয়ে থাকি।
- একটা গরম পাত্র উনুন থেকে নামিয়ে রেখে দিলে, তা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ তা বিকিরণের উপায়ে তাপ হারিয়ে এই অন্য চারদিকে থাকা পরিবেশে চলে যায়।
- আমাদের শরীর ও বিকিরণের দ্বারা পরিবেশকে তাপ প্রদান করে, বা তার থেকে তাপ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ১৪: বিকিরণের উপায়ে তাপ সঞ্চারণের আর তিনটি উদাহরণ দাও।

মনে রাখো: প্রত্যেক উত্তপ্ত বস্তু তাপ বিকিরণ করে। এই বিকিরিত তাপ অন্য বস্তুর ওপরে পতিত হলে এই তাপের কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়। অন্য এক অংশে সঞ্চারিত হয় এবং বাকি অংশটুকু অবশোষিত হয়। আপতিত তাপের এই অবশোষিত অংশই বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিয়ে থাকে।

৬.৫ গ্রীষ্ম ঋতু ও শীত ঋতুতে আমাদের পোশাকের রং:

তুমি লক্ষ করে থাকবে যে, আমরা সাধারণত গ্রীষ্ম ঋতুতে সাদা বা হালকা রঙের পোশাক এবং শীত ঋতুতে গাঢ় রঙের পোশাক পরে থাকি। আমরা এরকম কেন পরি এসো দেখব।

তোমাদের জন্যে কাজ:

দুটি টিনের পাত্র নাও। সেই পাত্রদের মধ্যে থেকে একটায় বাহ্য পৃষ্ঠে সাদা রং ও অন্যটির বাহ্য পৃষ্ঠে কালো রং দাও। চিত্র ৬.১২ দেখো। প্রত্যেক পাত্রে প্রায় সমান পরিমাণে জল ভর্তি করো।

চিত্র ৬.১২ বাহ্য পৃষ্ঠ সাদা ও কালো রঙের দুটিপাত্র

এখন পাত্র দুটিকে নিয়ে দুপুর বেলা রোদে রেখে দাও। প্রায় এক ঘণ্টার পর উভয় পাত্রে থাকা জলের তাপমাত্রা মাপো। দুটো তাপমাত্রায় কিছু পার্থক্য দেখলে কি? কোন্ তাপমাত্রায় থাকা জলের তাপমাত্রা অধিক? দুটি পাত্রের জলের তাপমাত্রায় এত ফারাক হবে যে তুমি স্পর্শ দ্বারাও তা জানতে পারবে।

তোমাদের জন্যে কাজ:

উপরের কাজে ব্যবহৃত খালি পাত্র দুটিকে ঘরের মধ্যে ছায়ায় রাখো। প্রায় ১৫ মিনিট পরে উভয় পাত্রে থাকা জলের তাপমাত্রা মাপো। দুটো তাপমাত্রায় কিছু ফারাক দেখলে কি? কোন্ পাত্রে জলের তাপমাত্রা অধিক?

প্রশ্ন ১৫: উপরের দুটি পরীক্ষা থেকে তুমি এখন বোঝাও, আমরা কেন সাধারণত গ্রীষ্ম ঋতুতে সাদা বা হালকা রঙের পোশাক এবং শীত ঋতুতে গাঢ় রঙের পোশাক পরে থাকি।

উপরের প্রশ্নের উত্তর তোমার খাতায় লেখো ও এ বিষয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকের সঙ্গে অলোচনা করো।

মনে রাখো: আমারা শীত ঋতুতে পশম বস্ত্র ব্যবহার করে থাকি, কারণ পশম তন্তু তাপের কুপরিবাহী। ফলে আমাদের পরিবেশের তাপমাত্রা, আমাদের শরীরের তাপমাত্রার থেকে কম হলেও আমাদের শরীরের তাপ পরিবেশে সঞ্চারিত হয় না। এছাড়া, পশম তন্তুদের মধ্যে থাকা বায়ুকণিকাগুলিও তাপের কুপরিবাহী।

কী শিখলে ?

- একটা বস্তুর তাপীয় অবস্থা জানার জন্যে আমাদের স্পর্শ অনুভূতি এক নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়।
- একটা বস্তুর তাপমাত্রা তার তাপীয় অবস্থা সূচিত করে থাকে।
- তাপমান যন্ত্রের সাহয্যে তাপমাত্রা মাপা হয়।
- মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্যে জ্বর তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই তাপমান যন্ত্রের পারদ 35^0C থেকে 42^0C পর্যন্ত। অন্য কাজের জন্যে আমরা পরীক্ষাগারে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। যে তাপমান যন্ত্রের পরাম সাধারণত 10^0C থেকে 110^0C পর্যন্ত।
- মানুষের শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা 37^0C বা 98.4^0F।
- দুটি বস্তু তাপীয় সংস্পর্শে এলে অধিক তাপমাত্রা বিশিষ্ট বস্তুর থেকে তাপ কম। তাপমাত্রা বিশিষ্ট বস্তুতে সঞ্চারিত হয়।
- একটা বস্তুর তাপ অন্য এক বস্তুকে তিনটি উপায়ে সঞ্চারিত হয়। সেগুলি হচ্ছে পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ।
- সাধারণত তাপ পরিবহন উপায়ে কঠিন বস্তুতে সঞ্চারিত হয়, সেরকম তাপ পরিচলন উপায়ে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে সঞ্চারিত হয়। বিকিরণ উপায়ে, তাপ সঞ্চরণের জন্যে কোনো মাধ্যম দরকার হয় না। পারদ এমন এক তরল পদার্থ যেখানে তাপ পরিবহন উপায়ে সঞ্চারিত হয়।
- স্থলসমীর ও সমুদ্র সমীর বায়ুর পরিচলন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।
- যে পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে সঞ্চারিত হয়, তাকে তাপের সুপরিবাহী বলা হয়।
- গাঢ় রঙের বস্তু, হালকা রঙের অপেক্ষা বেশি তাপ বিকিরণ (Heat-radiation) অবশোষণ করে। তার জন্যে গ্রীষ্ম ঋতুতে সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরলে আমাদের আরাম লাগে।
- শীতের ঋতুতে পশমের পোশাক আমাদের শরীরকে উষ্ণ রাখে, কারণ পশম তন্তু তাপ কুপরিবাহী। তথা পশম তন্তুদের মধ্যে থাকা বায়ু কুপরিবাহী।

অভ্যাস

১. একটা স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ম ডেকচিতে জল নিয়ে উনুনে বসিয়ে জলকে গরম করলে এক্ষেত্রে অন্য সঞ্চারণের কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে লেখো ও বোঝাও।

২. যদি তাপ সঞ্চারণের জন্যে পরিবহন ও পরিচলনের উপায় প্রকৃতিতে না থাকত, তবে আমাদের কী কী অসুবিধা ও সুবিধা হত? প্রত্যেকটি থেকে তিনটি করে উদাহরণ দাও।

৩. গ্রীষ্ম ঋতুতে দুপুর বেলায় কালো কাপড় না সাদা কাপড়ে তৈরি ছাতা ব্যবহার করা উপযুক্ত হবে বোঝাও।

৪. জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্র ও পরীক্ষাগারের তাপমান যন্ত্রে মধ্যে থাকা দুটি সামঞ্জস্য ও দুটি পার্থক্য লেখো।

৫. শীতের দিনে তোমাকে একটা মোটা কম্বল বা দুটি পাতলা কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়ার বিকল্প দেওয়া হল। তুমি কোনটি ও কেন বাছবে লেখো।

৬. বইয়ে পাওয়া উদাহরণ ছাড়া তাপ কুপরিবাহী ও তাপ সুপরিবাহীর দুটি করে পার্থক্যের নাম লেখো।

৭. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) একটা বস্তুর তাপীয় অবস্থা বস্তুর — সূচিয়ে থাকে।

(খ) টগবগ করে ফুটতে থাকা জলের তাপমাত্রা — তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যেতে পারবে না।

(গ) — উপায়ে তাপ সঞ্চারণের জন্যে কোনো মাধ্যম দরকার হয় না।

(ঘ) — রঙের পোশাক — রঙের পোশাকের তুলনায় অধিক তাপ অবশোষণ করতে পারে।

(ঙ) একটা স্টিলের চামচ গরম জলে ডুবিয়ে উভয়ের — হওয়া অবধি তাপ জলের থেকে চামচে প্রবাহিত হবে।

(চ) — স্থল সমীর সক্রিয় হয়ে থাকে।

(ছ) — রঙের পোশাক শীতের ঋতুতে পরা হয়।

(জ) — সমুদ্র সমীর সক্রিয় হয়ে থাকে।

(ঝ) — প্রক্রিয়ার প্রভাবে ডেভির নিরাপদ আলো এক উদাহরণ।

৮. $30^{0}C$ তাপমাত্রায় থাকা এক লিটার জলের সঙ্গে $50^{0}C$ তাপমাত্রায় থাকা হাফ লিটার জল মিশে গেল। তবে এই মিশ্রণের সর্বশেষ তাপমাত্রা—

ক. $0^{0}C$ থেকে কম হবে

খ. $50^{0}C$ থেকে বেশি হবে

গ. $80^{0}C$ হবে

ঘ. $30^{0}C$ থেকে বেশি ও $50^{0}C$ থেকে কম হবে

৯. $40^{0}C$ তাপমাত্রায় থাকা ১০ গ্রামের একটা লোহার কাঁটা $40^{0}C$ তাপমাত্রায় থাকা এক লিটার জলে ফেলে দেওয়া হল, তবে

(ক) জলের থেকে লোহার কাঁটার দিকে তাপ সঞ্চারিত হবে।

(খ) লোহার কাঁটার থেকে জলে তাপ সঞ্চারিত হবে।

(গ) জল থেকে লোহার কাঁটায় বা লোহার কাঁটা থেকে জলে তাপ সঞ্চারিত হবে না।

(ঘ) প্রথম অবস্থায় জল থেকে লোহার কাঁটায় কিছু ও কিছু সময় পর লোহার কাঁটা থেকে জলে তাপ সঞ্চারিত হবে।

১০. একটা প্লাস্টিক চামচ আইসক্রিম কাপে ঢোকালে তার অন্য প্রান্তটি—

(ক) একদম শীতল হবে না।

(খ) পরিবহন প্রক্রিয়ার জন্যে শীতল হয়ে যাবে।

(গ) পরিচলন প্রক্রিয়ার জন্যে শীতল হয়ে যাবে।

(ঘ) বিকিরণ প্রক্রিয়ার জন্যে শীতল হয়ে যাবে।

১১. স্টেনলেস স্টিল প্যানের তলার পৃষ্ঠ সাধারণত তামার তৈরি হয়ে থাকে; কারণ—

(ক) তামার তৈরি পৃষ্ঠতল প্যানের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে থাকে।

(খ) প্যানটি রঙিন ও সুন্দর দেখা যাবে।

(গ) তামা এক সুপরিবাহী।

(ঘ) স্টেনসেল স্টিল অপেক্ষা তামার পৃষ্ঠতল সহজেই পরিষ্কার করা যায়।

১২. যে জায়গায় খুব রোদ হয় সেখানকার পাকাঘরের বাইরের দেওয়াল সাদারং কেন করা হয়?

১৩. মরুভূমির অধিবাসীরা কেন সাধারণত সাদা পোশাক পরে থাকে ও মাথায় সাদা পাগড়ি বেঁধে থাকে, বোঝাও।

১৪. পৃষ্ঠা ৮১-র প্রশ্ন: ১১-তে থাকা পরীক্ষাকে বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে কি কাগজ সুপরিবাহী না কুপরিবাহী।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

- জলে তাপের সঞ্চারণ যে পরিবহন প্রক্রিয়ায় হয় না ইহা প্রমাণ করার জন্যে একটা পরীক্ষার আয়োজন করো ও পরীক্ষা করে দেখাও।

  (এ পরীক্ষা কেমন করে আয়োজন করবে সে বিষয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।)

  সূচনা: এ পরীক্ষার জন্যে জলকে এক নৌকার আকারে মাটির পাত্রে নেওয়া যেতে পারে।

  প্রশ্ন: ধাতু, কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি নলের আকারের পাত্রে জল নিয়ে পরীক্ষা করলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হবে কি?

- একটা থার্মোফ্লাস্ক নাও। তার ভিতরের, বাইরের ছিপির গঠন নিরীক্ষণ করো। তাপ সঞ্চারণ কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার প্রভাবকে চোখের সামনে রেখে থার্মোফ্লাস্কের উপযোগিতার জন্যে তার গঠন করা হয়েছে সে বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করো।

  থার্মোফ্লাস্কের ওপর একটা সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী দাও।

- তোমার নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ডাক্তার, রোগীদের তাপমাত্রা কীভাবে মাপছেন নিরীক্ষণ করো। তারপর জিজ্ঞাসা করে বোঝো।

  ক. উনি কেন একজন রোগীর তাপমাত্রা মাপার পর জ্বর মাপার তাপমান যন্ত্রকে একটা ছোট শিশিতে থাকা তরল পদার্থে ডুবিয়ে রাখছেন?

  খ. সে তরল পদার্থটি কী?

গ. তাপমান যন্ত্রকে কেন জিভের তলায় রাখা হয়?

ঘ. জ্বরে আক্রান্ত ছোট বাচ্চাদের তাপমাত্রা মাপার জন্য তাপমান যন্ত্র কি তাদের জিভের তলায় রাখা হয়?

ঙ. আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা কি সমান?

(তুমি এর সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন, যা তোমার মনে আসছে, যোগ করতে পারো।)

- একজন পশু-ডাক্তারের কাছে গিয়ে তিনি পশুদের শরীরের তাপমাত্রা কীভাবে মাপছেন লক্ষ করো। বিভিন্ন পশুপাখিদের শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা কত, তাদের জিজ্ঞেস করে জানো ও তোমার খাতায় তা লিখে রাখো।

- একটা কাগজ নাও। চিত্র ৬.১৩-এ দেখানোর মতো একটা কুণ্ডলী সেই কাগজের ওপর আঁকো। কাগজের এপর টানা হয়ে থাকে দাগের ওপর কাটো। তারপরে সেই কাটা কাগজকে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির উপরে চিত্র ৬.১৩-য় দর্শানোর মতো টাঙিয়ে রাখো। নিরীক্ষণ করো কী হচ্ছে। যা দেখলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করো। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তথা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করো।

চিত্র ৬.১৩

তোমরা জানো কি?

- সেলসিয়াস স্কেল সুইডেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আন্দ্রে সেলসিয়াস ১৭৪২ সালে প্রথমবারের জন্যে বের করেছিলেন। তবে তিনি প্রথমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জলের স্ফুটনাঙ্ককে $0^{\circ}C$ ও হিমাঙ্ককে $100^{\circ}C$ নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই নির্দিষ্টাঙ্ক ক্রমকে ঠিক বিপরীতে করা হয়েছিল।
- ফারেনহাইট স্কেল জার্মান বৈজ্ঞানিক গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি স্থিরাঙ্কভাবে বরফ ও লবণের মিশ্রণের তাপমাত্রাকে ও মানুষের শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়েছিলেন।
- গ্রীষ্ম ঋতুতে বাইরে গরম, ঘরের ভেতর সঞ্চারিত না হওয়ার জন্যে ও শীত ঋতুতে ঘরের ভেতরের তাপ বাইরে সঞ্চারিত না হওয়ার জন্যে আজকাল শহরগুলিতে পাকাঘরের বাইরের দিকে দেওয়াল সব ফাঁপা ইটে তৈরি করা হচ্ছে।

●●●

সপ্তম অধ্যায়

আবহাওয়া, জলবায়ু ও উপযোজন

৭.১ জলবায়ুর প্রভাব:

সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় তোমরা একটু ঠান্ডা অনুভব করে থাকো। মধ্যাহ্নে বেশ গরম লাগে। গ্রীষ্ম ঋতুতে খটখটে রোদের জন্যে, তোমাদের বিদ্যালয় সকালে হয়ে থাকে। শীতের দিনে সকালবেলা বেড়াতে বেরোলে ঘন কুয়াশা হওয়া দেখা যায়। ভাব তো দেখি বছরের সবদিন কি আকাশ নির্মল থাকে? না সবদিন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে?

প্রশ্ন ১: সাধারণত আকাশে মেঘ ঢেকে থাকলে, অথবা বৃষ্টি হলে আমরা মেঘলা আবহাওয়া হয়েছে বলে থাকি। বাইরে কুয়াশা হলে সেরকম আবহাওয়াকে আমরা কী বলব?

বৃষ্টির দিনে তোমরা বিদ্যালয়ে কী নিয়ে আসো? রোদ ও বৃষ্টির দিনে তোমরা নিশ্চয়ই ছাতা ব্যবহার করতে থাকবে। অল্প বৃষ্টির সঙ্গে অধিক রোদ্দুর হলে তোমরা ভ্যাপসা গরম অনুভব করো। শীতকালে আকাশ নির্মল থাকে। সূর্যকিরণও ঠিকভাবে পড়ে। কিন্তু তোমার শরীরে ঠান্ডা লাগায় তুমি গরম পোশাক পরে থাকো। কোনো একদিনের একসময়ের বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়া দেখে উৎসব, মেলা, খেলা ইত্যাদির দিন ধার্য হয়ে থাকে। তবে মাঝে মাঝে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যে এসব কার্যক্রম বন্ধ করতে হয়।

৭.২. আবহাওয়া:

তোমরা জানো চাষিরা আবহাওয়া দেখে ধান বোনার ব্যবস্থা করে থাকে। রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আবহাওয়ার অগ্রিম অনুমান আজকাল সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রগুলিতেও আবহাওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়। ঝড় কিংবা বাত্যা আসার সম্ভাবনা থাকলে জেলাপ্রশাসন ও মৎস্যজীবীদের তথা সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের জন্যে বিপদসংকেত নির্দেশনামা প্রচার করে থাকেন।

টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের পরপর আবহাওয়ার বিষয়ে বিবরণী দেওয়ার সময়ে, কিছু চিত্রগত সংকেত ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২: তোমাদের অঞ্চলে ধান বোনা কবে আরম্ভ করা হয়? ওই পার্বণকে কী বলা হয়? সেদিনের অনুকূলে অন্য এক মুখ্য পার্বণের নাম বলো। এ বিষয়ে তোমার পিতা-মাতা তথা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ৭.১:

টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়ার পূর্বানুমান জানানোর জন্যে কোন কোন সংকেত ব্যবহার করা হচ্ছে তা লক্ষ করো। সেই সংকেতগুলিকে তোমার খাতায় আঁকো এবং তার পরদিন স্কুলে তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে এসবগুলিকে মিলিয়ে দেখো।

এসো, আমরা এই সংকেতগুলির প্রয়োগ শিখব। নিম্নে দেওয়া সংকেতগুলিকে কোন কোন আবহাওয়া দেখানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়, তা লক্ষ করো।

নির্মল আবহাওয়া

খট্‌খটে রোদ্দুর আবহাওয়া

মেঘলা আবহাওয়া

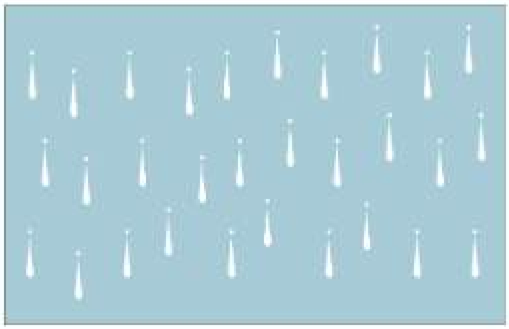

টিপটিপ বৃষ্টির আবহাওয়া

মেঘলা আবহাওয়া

জোর বৃষ্টির আবহাওয়া

চিত্র ৭.১. আবহাওয়ার সংকেত

তোমাদের জন্যে কাজ:

গত সপ্তাহে দৈনিক আবহাওয়া কেমন ছিল, তা মনে করে খাতায় লেখো। চলতি সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের আবহাওয়া কেমন আছে, লেখো। কাজটি সোমবার আরম্ভ করো ও তার পরের সপ্তাহের সোমবার শিক্ষককে দেখাও।

সারণী ৭.১এ দেওয়া সংকেতগুলি ব্যবহার করে সারণীটি পূর্ণ করো।

দিনের নাম	গত সপ্তাহ	চলিত সপ্তাহ
রবিবার		
সোমবার		
মঙ্গলবার		
বুধবার		
বৃহস্পতিবার		
শুক্রবার		
শনিবার		

৭.৩ দিনের সময়সীমা:

তোমার ঘরে থাকা ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকায় দৈনিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের সূচনা দেওয়া হয়ে থাকে। এখান থেকে প্রত্যহ দিন ও রাত্রের সময়ের অবধি কত তা জানা যায়। তোমরা লক্ষ করে থাকবে শীতকালে রাতের অবধি বেশ লম্বা থাকে। এই দিনগুলিতে তাড়াতাড়ি সূর্যাস্ত হয়ে দেরিতে সূর্যোদয় হয়ে থাকে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের একটা সূচনা নিম্ন সারণী (৭.২)-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৭.২ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়

মাস	তারিখ	সূর্যোদয় (সকাল সময়)	সূর্যাস্ত (সন্ধ্যা সময়)
জুলাই	১	৫টা ২৩ মি	৬টা ৩৭মি
	১০	৫টা ২৫ মি	৬টা৩৫ মি
	২০	৫টা ২৮ মি	৬টা ৩২ মি
	৩১	৫টা ৩২ মি	৬টা ২৮ মি

উপরের সারণীটিকে লক্ষ করলে দেখবে যে মাসের মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নির্দিষ্ট ও স্থির থাকছে না। এই পরিবর্তন কি তুমি আগে থেকে জানতে? সরণীটিকে দেখলে তুমি জানতে পারবে যে জুলাই মাসের দিনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয়ের সময় বিলম্ব হচ্ছে ও সূর্যাস্তের সময় এগিয়ে আসছে।

ওপরের সারণীতে দেওয়া তথ্যকে ব্যবহার করে গণনা করলে তোমরা পাবে যে সূর্যোদয়ের সময়ের ব্যবধান প্রথম ১০ দিনে ২ মিনিট, দ্বিতীয় ১০ দিনে ৩ মিনিট ও তৃতীয় ১০ দিনে ৪ মিনিট হচ্ছে।

তোমাদের জন্যে কাজ:

তোমাদের ঘরে থাকা ক্যালেন্ডার পাঁজি দেখে আগামী মাসের প্রদত্ত সূচনাকে ব্যবহার করে পূর্বে দেওয়া সারণী ৭.২-এর মতন একটা সারণী তোমার খাতায় প্রস্তুত করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ৭.৪:

খবরের কাগজে দেওয়া একটা আবহাওয়ার বিবরণীকে কেটে রাখো (তা চিত্র ৭.২-এর মতো হওয়া দরকার) এর মধ্যে দেওয়া তথ্যগুলিকে পড়ো।

আকাশ মেঘলা থাকবে। তাপমাত্রা সর্বাধিক ৩৫.৭ এবং সর্বনিম্ন ২৬.৪ ডিগ্রি সেল্সিয়াস। আর্দ্রতা সর্বাধিক ৯২, সর্বনিম্ন ৬১ ডিগ্রি। সূর্যোদয় : ৫টা ৩২ মিনিট সূর্যাস্ত: ৬টা ১৪ মিনিট।

মনে রাখো: প্রায়শ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আপরাহ্নের ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ভোরের সময়ে হয়ে থাকে।

এখন তুমি জানলে এমন বিবরণীর থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, সম্ভাব্য বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার সূচনা পাওয়া যায়। আর্দ্রতা বায়ুমণ্ডলে থাকা জল কণিকার পরিমাণকে নিয়ে হিসেব করা হয়। এই হিসেবের প্রণালী তুমি উঁচু শ্রেণীতে পড়বে। বায়ুর আর্দ্রতা বেড়ে গেলে আমাদের ভেপসা গরম লাগে ও শরীর থেকে ঘাম বেরোয়। বায়ুর আর্দ্রতা কমে গেলে আমাদের শুকনো লাগে।

বলতে পারবে কি? ভিজে কাপড় শুকোবার সঙ্গে আর্দ্রতার কী সম্পর্ক আছে? এ বিষয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ৩: বছরের কোন মাসে ঋতুতে আর্দ্রতা খুব বেশি থাকে। এবং কোন মাসে ঋতুতে আর্দ্রতা কম থাকে?

তাপমাত্রা মাপার জন্যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাপার জন্যে অন্য এক বিশেষ সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন তাপযন্ত্র (Maximum-Minmimum Thermometre) ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টি মাপক যন্ত্র ব্যবহার করে কোনো স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয়। বাতাসের বেগ মাপার জন্যে অ্যানিমোমিটার (Animometre), আর্দ্রতা মাপার জন্যে হাইগ্রোমিটার (Higrometre) ও বাতাসের দিক নির্ধারণের জন্যে বাতাস মাপক যন্ত্র (Wind vane) ব্যবহার করা হয়। চাপমান যন্ত্রের মাত্রাকে বায়ুর চাপ মাপা হয়। বায়ুর চাপের তারতম্য হলে বাতাস বয়ে থাকে। বাতাস উচ্চচাপ স্থান থেকে নিম্নচাপের বিশেষ স্থানের দিকে বয়ে যায়। এ সব যন্ত্রদের বিষয় তোমরা ব্যবহারিক ভূগোলের পঞ্চম অধ্যায় পড়েছ।

শিক্ষকের জন্যে কাজ:

৭ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিকটস্থ আবহাওয়া অফিসে নিয়ে এইসব যন্ত্র দেখাবেন ও এসব যন্ত্রের ব্যবহারের প্রণালীও বুঝিয়ে দেবেন।

তোমাদের জন্যে কাজ ৭.৩:

তোমাদের শিক্ষকের সাহায্যে বা আবহাওয়া অফিস থেকে খবর সংগ্রহ করে নিম্নে দেওয়া সারণীটি আলোচনা করো।

সারণী ৭.৩ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা

ভুবনেশ্বরের হারাহারি বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা (১৯৫২ থেকে ২০০০)			
	বৃষ্টিপাত মিমি	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
জানুয়ারি	১৩.১	২৮.৫	১৫.৫
ফেব্রুয়ারি	২৫.৫	৩১.৬	১৮.৬
মার্চ	২৫.২	৩৫.১	২২.৩
এপ্রিল	৩০.৮	৩৭.২	২৫.১
মে	৬৮.২	৩৭.৫	২৬.৫
জুন	২০৪.৯	৩৫.২	২৬.১
জুলাই	৩২৬.২	৩২.০	২৫.২
আগস্ট	৩৬৬.৮	৩১.৬	২৫.১
সেপ্টেম্বর	২৫৬.৩	৩১.৯	২৪.৮
অক্টোবর	১৯০.৭	৩১.৭	২৩.০
নভেম্বর	৪১.৮	৩০.২	১৮.৮
ডিসেম্বর	৪.৯	২৮.৩	১৫.২

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর সূত্র থেকে উপলব্ধ।

নিম্নে ভুবনেশ্বরের ৯ দিনের (২০০৯ সালের জুন ১ তারিখ থেকে জুন ৯ তারিখ পর্যন্ত) সর্বোচ্চতাপমানের এক সারণী দেওয়া হয়েছে। তাকে অনুধ্যান করো।

সারণী ৭.৪ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

তারিখ	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
০১.০৬.০৯	৩৯.২
০২.০৬.০৯	৩৯.৫
০৩.০৬.০৯	৩৯.৬
০৪.০৬.০৯	৪০.৬
০৫.০৬.০৯	৪১.০
০৬.০৬.০৯	৪১.৬
০৭.০৬.০৯	৪২.০
০৮.০৬.০৯	৪২.০
০৯.০৬.০৯	৪১.০

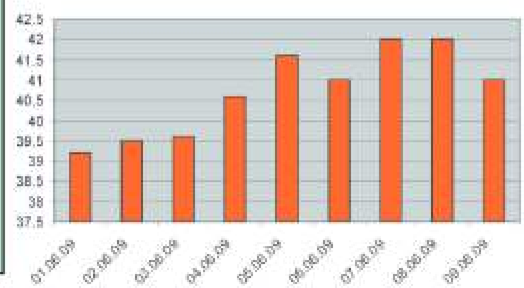

তোমাদের জন্যে কাজ ৭.৬:

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিনের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে একটা চার্টে লিখে রাখো।

সারণী ৬.৫ আগস্ট মাসের তাপমাত্রা।

	তাপমাত্রা				
তারিখ	সকাল আটটা	মধ্যাহ্ন বারোটা	অপরাহ্ণ চারটা	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
আগস্ট পয়লা					
আগস্ট দুই					
আগস্ট তিন					
আগস্ট চার					
আগস্ট পাঁচ					
আগস্ট ছয়					
আগস্ট সাত					

আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের জন্যে নিম্নে একটা সারণী দেওয়া হয়েছে। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে সারণীটি সম্পূর্ণ করো।

সারণী ৭.৬ আবহাওয়া নির্ণয়

তারিখ	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
১	পুবন আবহাওয়া			
২	টিপটিপ			
৩	বৃষ্টি			
৪				
৫				
৬				
৭				
.				
.				
৩০				
৩১				

তোমাদের জানার জন্যে ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ভুবনেশ্বর শহরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সারণী ৭.৭-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৭.৭. ভুবনেশ্বরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
১৯৯৮	৪৫.৯ ডিগ্রি সে.	২৯.৫ ডিগ্রি সে.
১৯৯৯	৪২.২ ডিগ্রি সে.	১৪.৯ ডিগ্রি সে.
২০০০	৪২.৫ ডিগ্রি সে.	১৯.৫ ডিগ্রি সে.
২০০১	৪৪.৬ ডিগ্রি সে.	১১.৫ ডিগ্রি সে.
২০০২	৪৬.১ ডিগ্রি সে.	২০.৫ ডিগ্রি সে.
২০০৩	৪৪.৯ ডিগ্রি সে.	২৭.৫ ডিগ্রি সে.
২০০৪	৪৫.১ ডিগ্রি সে.	২০.৫ ডিগ্রি সে.
২০০৫	৪৬.৩ ডিগ্রি সে.	১৩.৬ ডিগ্রি সে.
২০০৬	৪১.৩ ডিগ্রি সে.	০৯.৫ ডিগ্রি সে.

তোমাদের জন্যে কাজ ৭.৭

উপরোক্ত তথ্য নিয়ে গ্রাফ কাগজ ব্যবহার করে একটা স্তম্ভলেখ প্রস্তুত করো। তোমার প্রস্তুত করা লেখাটি নিম্নে দেওয়া চিত্রের মতো হবে।

চিত্র ৭.৩ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমানের স্তম্ভলেখ।

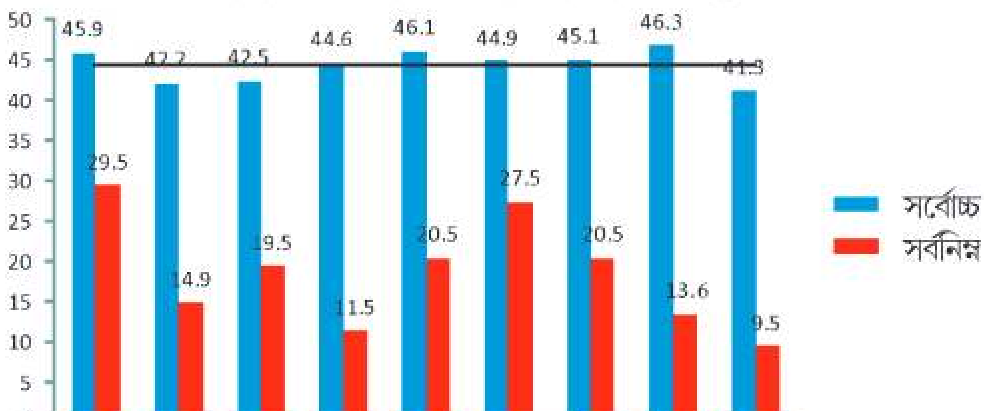

উপরোক্ত তথ্যাবলি থেকে জানা যাচ্ছে যে বিগত ন'বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার মধ্যে ২০০৫-তে সর্বাধিক তাপমাত্রা (৪৬.৩ ডিগ্রি সে.) ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে ২০০৬-এর তাপমাত্রা (৯.৫ ডিগ্রি সে.) অনুভূত হয়েছিল।

তোমাদের জন্যে কাজ:

দৈনিক আবহাওয়ার জন্যে একটা রঙের সংকেত নিম্নে দেওয়া হল—

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত নির্মল

প্রত্যেক দিনের জন্যে ক্যালেন্ডার নিয়ে কোনো একটা মাসের একটা রং দাও, যা সে দিনের আবহাওয়ার সুচনা দেবে।

সারণী ৭.৮ আবহাওয়ার সংকেত

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০					

সেই মাসের কোন রং অধিক দিনের জন্যে ব্যবহৃত হল লেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ ৭.৯

এক আবহাওয়া কেন্দ্রের প্রদত্ত কোনো এক বছরের হারাহারি তাপমাত্রা তলার সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৭.৯ বিভিন্ন মাসের তাপমাত্রা

মাসের থেকে মাস	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
জানুয়ারি—মার্চ	১৯.৭ ডিগ্রি সে.	২৭.২ ডিগ্রি সে.
এপ্রিল —মে	২০.২ ডিগ্রি সে.	৩৭.৬ ডিগ্রি সে.
জুন—সেপ্টেম্বর	২৩.৬ ডিগ্রি সে.	৩২.৬ ডিগ্রি সে.
অক্টোবর—ডিসেম্বর	২২.৫ ডিগ্রি সে.	৩০.৬ ডিগ্রি সে.

উপরোক্ত সারণীর মতন তোমার খাতায় এক সারণী প্রস্তুত করো।

দৈনিক তোমার বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা লিখে রাখো। প্রত্যেক দিনের তাপমাত্রার গড় নিয়ে সপ্তাহের গড় নির্ণয় করো তুলনা করে দেখো সপ্তাহের সমস্ত দিনের তাপমাত্রা সমান আছে কি?

মনে রাখ: আবহাওয়ার অবস্থা জানার জন্যে মৌলিক উপাদানগুলি হল:

১. বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা
২. বায়ুর চাপ
৩. বায়ুর গতি
৪. বৃষ্টিপাতের পরিমান
৫. বাদলের অবস্থিতি
৬. আর্দ্রতা

তাই নির্দিষ্ট স্থানের কোনো এক দিনের (২৪ ঘণ্টার) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা সময়ক্রমে বিচার করে সেই স্থানের আবহাওয়ার গড় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

৭.৪ জলবায়ু:

আবহাওয়া বিজ্ঞানী দৈনন্দিন বিবরণী আবহাওয়া কেন্দ্রে অনেক বছর ধরে লিপিবদ্ধ করে থাকেন উক্ত বিবরণীর থেকে সেই স্থানের আবহাওয়ার প্রকারভেদ জানা যায়।

২৫ বছর ধরে একটা স্থানের গড় আবহাওয়ার বিবরণী নিয়ে সে স্থানের জলবায়ু নির্ধারণ করা হয়। যদি একটা অঞ্চলের তাপমাত্রা বছরের অধিকাংশ সময়ে অধিক থাকে তবে সে স্থানের জলবায়ুকে উষ্ণ বলা হয়। তার সঙ্গে যদি সে স্থানে অধিক পরিমাণে বর্ষা হয়। তবে সে স্থানের জলবায়ুকে উষ্ণ ও আর্দ্র বলা হয়।

এই প্রকার উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে দেখা যায়। রাজস্থানের জলবায়ু থেকে জানা যায় যে সেখানে বছরের অধিকংশ সময়ের তাপমাত্রা অধিক হয়ে থাকলেও শীতকালে সর্বনিম্ন থাকে। এখানে বৃষ্টিপাতও খুব কম তাই তাকে শুষ্ক ও উষ্ণ অঞ্চল বলা হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে চেরাপুঞ্জি আছে। সেখানে বৃষ্টিপাত অধিক হওয়ার জন্যে তা আর্দ্র, ক্রমশ সেখানেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মেরু অঞ্চলের দেশ গ্রিনলান্ড, আইস্‌ল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতির জলবায়ু শীতল।

৭.৯ জলবায়ু ও প্রাণীদের উপযোজন:

ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইতে অষ্টম অধ্যায়ের পরিস্থান ও তার সঙ্গে জীবের সম্পর্কের বিষয়ে তুমি পড়েছ। স্থলভাগ, জলভাগ ও মরুভূমি পরিস্থান জীবদের উপযোজন পরিপ্রেক্ষিতে মাছ ও উটের শরীরের পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু জেনেছ। এসো এ সম্পর্কে অধিক কিছু জানব।

মনে রাখ: কোনো স্থানের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোক তথা পোষণের ওপরে সেখানে থাকা প্রাণীদের উপযোজন নির্ভর করে।

(ক) মাছের উপযোজন

মাছ সব সময়ে জলে থাকে, তাই তদনুসারে তার শারীরিক উপযোজনগুলি তলার সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৭.১০ মাছের উপযোজন

সূচনা	শারীরিক উপযোজন ও ব্যবহার
আকার	ওপর ও তলা চেপটা। ইহা সাঁতরানোর সময় ঘর্ষণবল কমাতে সাহায্য করে।
ডানা	হালকা ও চেপটা হালের কাজ করে তথা ওপর ওঠা ও নিচে নামার কাজ করে।
লেজ	পরদা সাদৃশ্য। বিভিন্ন দিকে গতি করতে পারে।
আঁশ	শরীরের আবরণ মাছকে আঘাত করলে তার প্রভাব আঁশের জন্যে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। ও আঘাতের কুপরিণাম কমে যায়।
কানকো	ইহা ছিদ্রযুক্ত, জলের থেকে অম্লজান সংগ্রহ করতে পারে, ইহা জলের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া করে
চোখের পরদা	ইহা চোখকে সুরক্ষা দেয়, জলের মধ্যে চোখ খুলে দেখে খাদ্য খোঁজা সম্ভব হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৭.১০

- তোমার জানা সামুদ্রিক মাছের পোনা মাছের নাম লেখো ও ছবি আঁকো।
- রুই, কাতলা, মিরগেল, মাছদের দেখে তাদের অঙ্গগুলির প্রভেদ নির্ণয় করো ও খাতায় লেখো।
- ইলিশ মাছের চিত্র অঙ্কন করো। ছবি:

(খ) ব্যাঙের উপযোজন:

উভয় স্থল ও জল ভাগে ব্যাঙ দেখা যায়। তা একে উভচর প্রাণী বলা হয়। দুটি পরিস্থানে থাকতে পারা সম্ভব হেতু তাদের শরীরের উপযোজন অনুযায়ী হয়েছে। এর জন্যে তারা ফুসফুস ও চর্ম উভয়ের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া করে থাকে। শীতকালে শরীরের উত্তাপের সমতা বজায় রাখার জন্যে ব্যাঙ নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে থাকে। এমন শয়নকে শীতসুপ্তি (Hiber mantion) বলা হয়। এই সময় ব্যাঙ তার শরীরে সঞ্চিত থাকা খাদ্য ব্যবহার করে বেঁচে থাকে।

চিত্র ৭.৫ ব্যাঙ

জেনে রাখো যে সাপ, কেঁচো ও টিকটিকিদেরও শীতসুপ্তি আছে।

তোমাদের জন্যে কাজ:

বিভিন্ন জাতের ব্যাঙের ফটোচিত্র সংগ্রহ করো।

প্রশ্ন ৩: তুমি যত রকমের ব্যাঙের নাম জানো লেখো। তোমার উত্তর তোমার সহপাঠীদের উত্তরের সঙ্গে মেলাও।

ব্যাঙের শরীর উপযোজনের অন্য উদাহরণ হল যে ব্যাঙ যেহেতু স্থলে থাকে, তাই সে সেখানে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যে নিজের জিভকে ব্যবহার করে থাকে অন্য পক্ষে যেহেতু সে জলেও থাকে তাই সে সেখানে নিজের পায়ের আঙুলের সঙ্গে সংযুক্ত পরদা দ্বারা অনায়াসে সাঁতার কাটতে পারে।

গ) মেরু ভল্লুকের উপযোজন:

মেরু অঞ্চলের জলবায়ু খুব ঠান্ডা। এখানে প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত সূর্যোদয় হয় না। শীত ঋতুতে এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। এই অঞ্চল সব সময় বরফাবৃত। এখানে থাকা ভল্লুকের শরীরেও সেই পরিস্থান অনুযায়ী উপযোজন হয়েছে।

১. মেরু ভল্লুকের লোম সম্পূর্ণ সাদা হওয়াই ইহাকে সাদা ভল্লুকও বলা হয়। এর সাদা রঙের জন্যে একে বরফাবৃত পরিস্থানে সহজে চেনা যায় না। ফলে তার উপর আক্রমণের থেকে সে সুরক্ষিত থাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিকারও সহজে করতে পারে।

২. সাদা ভল্লুকের চামড়ার তলায় একটা মোটা চর্বির স্তর থাকে। এটা তাকে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। খাদ্যাভাবের সময় তা ভল্লুককে খাদ্য জোগায়। বিশেষত মেয়ে সাদা ভল্লুক শীত ঋতুতে নিজের বাচ্চাকে নিয়ে বরফে গর্ত করে থেকে যায় এবং তখন এই চর্বিকেই ব্যবহার করে বেঁচে থাকে।

৩. এদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর। এই শক্তিই তাকে শিকারে সাহায্য করে থাকে।

৪. এর পায়ের পাতা চওড়া, বড় আকারের ও তীক্ষ্ণ নখযুক্ত হওয়ায় মসৃণ বরফের উপর হাঁটতে সাহায্য করে। গরমকালে বরফ গলে গেলে পায়ের চওড়া পাতা জলের উপর সাঁতার কাটার উপযোগী হয়ে ওঠে।

উপযোজন সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তথ্য সব চিত্র ৭.৬-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৭.৬ সাদা ভল্লুকের উপযোজন

> **প্রশ্ন:** সাদা ভল্লুক এসে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অরণ্যে থাকলে উপযোজনের ব্যতিক্রম হেতু তার কী অসুবিধা হবে চারটি বাক্যে লেখ।

(ঘ) পেঙ্গুইন্-এর উপযোজন:

পেঙ্গুইনও বরফ অঞ্চলে থাকে। এর পেটের দিকটা সাদা। তাই বরফের সঙ্গে তার শরীর মিশে যায়। তাই শিকারি একে জানতে পারে না, অন্য পক্ষে এরা মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে বলে খাদ্যের জন্যে তাদের ওড়ার দরকার নেই। ফলে পেঙ্গুইনরা তাদের ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা ভালো সাঁতারু হয়ে গেছে। এর চামড়া মোটা ও তার তলার অংশে চর্বির এক আবরণ থাকে। যা পেঙ্গুইনের শরীরের তাপ রক্ষা করে। নিজের শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে তারা দল বেঁধে থাকে।

> **প্রশ্ন ৫:** তিমির উপযোজন কীভাবে হয়েছে বলে তুমি মনে করো। তোমার শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

(ঙ) পাখিদের উপযোজন:

খাদ্যাভ্যাসের উপযোজন হেতু স্থলভাগ, নদী, জলাশয় ও সমুদ্রতট অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পাখি বাস করে। ঠান্ডার প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে পাখিরা শীত ঋতুতে উড়ে উড়ে ওড়িশার চিলকা, রাজস্থান, ভরতপুর পাখি অভয়ারণ্য (ষ্কুন্স্ব (থদ্রষ্ঠভা) ও হরিয়ানার সুলতানপুর পাখির জাতীয় উদ্যানে আসে। শীতের ঋতু ফুরিয়ে গেলে তারা আবার সাইবেরিয়ায় ফিরে যায়। এটা প্রত্যেক বছর সময় অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমন পাখিদের পরিযায়ী বা পরিব্রাজী (ষ্কুস্কুঋষ্ঠদ্রণ) পক্ষী বলা হয়।

(চ) বিষুব মণ্ডলীয় জীবজন্তু : বিষুব মণ্ডলের জলবায়ু বিশেষ ধরনের। এখানে দিন ও রাত সারা বছর প্রায় সমান। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি সে. ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৫ ডিগ্রি সে. থাকে। এখানে বৃষ্টিপাতও অত্যধিক হয়ে থাকে। তাই এই অঞ্চলে ঘন জঙ্গল দেখা যায়।

এখানে বড় বড় বৃক্ষের ডাল-পাতায় পোকা, সাপ, টিকটিকি, পাখি ও বানর দেখা যায়। বানররা ডালে ডালে সবসময় ঝুলে এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে জীবন যাপন করতে থাকায় এদের হাত ও পায়ের মাংসপেশি খুব শক্তিশালী। এখানে জাগুয়ার নামের ছোট বাঘও থাকে ও সবসময়ে ডালপালার মধ্যে লুকিয়ে থেকে নিজের শিকার ধরে।

এই জঙ্গলভূমিতে সাধারণত বড় বড় জীবেরা থাকে তারা গাছে চড়তে পারে না যথা গরিলা, ভল্লুক, হাতি ইত্যাদি। এরা সাধারণত তৃণভোজী, তাই ঘাস, পাতা, ডালের জন্যে এদের প্রত্যহ অনেকটা পথ হাঁটতে থাকায় এদের পা লম্বা ও শক্তিশালী হাতির শুঁড় তার নাক ও ওপরের ঠোঁটের এক রূপান্তরন মাত্র। জলের মধ্যে থাকলেও এটা হাতিকে শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করে থাকে। এর দ্বারা ঘাস ইত্যাদি ও পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ডালপাতা ভাঙায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাতির বড় বড় কান, তার শরীরের তাপকে বিকিরণ করায় সাহায্য করে থাকে।

৭.১০ জলবায়ু ও উদ্ভিদের উপযোজন:

আমরা প্রাণীদের উপযোজন পড়লাম এখন এসো উদ্ভিদের উপযোজনের বিষয়ে জানব।

মরুভূমিতে জলাভাব, অত্যন্ত রোদ ও রাতে অত্যধিক ঠান্ডা হেতু এখানে গাছগুলো মুখত কাঁটা জাতীয় (যথা, ক্যাকটাস ও খেজুর)। ফলে এদের তথাকথিত পাতা (কাঁটাই পাতার রূপান্তরিতকরণ) থেকে বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ পরিমাণে জল নষ্ট হয় না ফণিমনসা গাছের কাণ্ডে জল সঞ্চয় হয়ে থাকে।

মেরু অঞ্চলে আলোক, উত্তাপ মৃত্তিকা ও জঙ্গলের অভাব হেতু সেখান কোনো বৃক্ষলতা থাকে না, কেবল কোথাও কোথাও শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। মাসের পর মাস জল না পেলে তারা শুকিয়ে বেঁচে থাকে, জল পেলে তাদের শুকিয়ে যাওয়া পাউডারের মতো রেণু থেকে আবার শৈবাল সৃষ্টি হয়।

হিমালয় গিরির মত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের শীর্ষ ভাগের তাপমাত্রা সারা বছর খুব কম থাকে তাই সেখানকার গাছগুলো লম্বা লম্বা ও পাতাগুলো সরুসরু হওয়া উপযোজনের এক দৃষ্টান্ত, সেইজন্য হিমালয়ে বিশেষতঃ পাইন জাতীয় গাছ দেখা যায়।

সমুদ্র উপকূলের জলবায়ু সংম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথমত এখানকার জল লবণাক্ত। এখানকার বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ঘনতা বেশি। তাছাড়া এ অঞ্চল সবসময় ঢেউ দ্বারা উপকৃত। তাই এখানে প্রায়শ বালি মাটি দেখা যায়। সুন্দরী জাতীয় (Mangrove) গাছেদের মূল মাটি বালি স্তরের থেকে ওপরে থাকে। তা শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করে গাছের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে এর শেকড়গুলি মোটা ও শক্ত হয়ে থাকে। তাই নোনাজলের জন্যে সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে নারিকেল ও ঝাউগাছ অধিক দেখা যায়।

তোমরা জান কী ?

- মানব তাপমাত্রা: একটা স্থানের দৈনিক তাপমাত্রা বিভিন্ন সময়ে মেপে সেই স্থানের দৈনিক গড় তাপমাত্রা ব্যবহার করে মাসিক গড় তাপমাত্রা গণনা করা হয়। সেইভাবে বছরের প্রত্যেক মাসের গড় তাপমাত্রা ব্যবহার করে বার্ষিক গড় গণনা করা হয়। এর পর ২৫ বছরের অধিক বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ব্যবহার করে, সে স্থানের ২৫ বছরের গড় তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। নির্ণয় করা হয়ে থাকা তাপমাত্রাকে 'মানব' তাপমাত্রা বলা হয়।

  সেই প্রণালীতে একটা স্থানের বায়ুর মানব চাপ, মানব আর্দ্রতা ও মানব বৃষ্টিপাত গণনা করা হয়ে থাকে এইসব তথ্যই সে স্থানের জলবায়ু নির্ণয় করে।

- পরিব্রাজী পাখি: (পরিযায়ী) এক পরিব্রাজী পাখি অত্যন্ত শীতল জলবায়ুর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ১৫০০০ কিমি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। তবে তারা শীতঋতুতে কেমনভাবে সেই নির্দিষ্ট স্থান চিনে পালিয়ে আসে। সে কথা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। আর কারওর মতে সেই পাখিরা দিনে সূর্য ও রাতে চন্দ্র ও তারাদের ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানে উড়ে আসতে পারে। আর কেউ কেউ বলে যে পাখিরা পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে তারা নিজের জায়গায় পুনর্বার উড়ে আসতে পারে।

কী শিখলাম—

- বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, চাপ ও বাতাসের বেগ ইত্যাদি তথ্য থেকে আবহাওয়ার বিশেষত্ব নির্ণয় করা হয়।
- এই উপাদানগুলি মাপার জন্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।
- যে কোনো জায়গায়, যে কোনো দু'দিনের আবহাওয়া সমান থাকে না।
- যে কোনো জায়গায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ও প্রত্যেকদিন বদলাতে থাকে।
- প্রায়শই অপরাহ্নের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ এবং ভোরবেলার তাপমাত্রা সর্বনিম্ন হয়ে থাকে।
- এক অঞ্চলের ২৫ বছরের গড় আবহাওয়ার থেকে সে অঞ্চলের জলবায়ু নির্ণয় করা হয়।
- মেরু অঞ্চলে, বিযুবমণ্ডলীয় অঞ্চলে, মরুভূমি ইত্যাদি অঞ্চলের বিশেষ প্রকারের জলবায়ু অনুভূত হয়।
- যে পরিস্থানের জলবায়ুতে প্রাণী ও উদ্ভিদ নিজেকে খাপ খাইয়ে থাকে, তাদের সেই বিশিষ্ট গুণগুলি হল উপযোজন।
- মাছ, ব্যাঙ, মেরু ভল্লুক, পেঙ্গুইন, হাতি, বানর, পাখি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমন উপযোজনের ফলাফল বেশ সুস্পষ্ট।
- পরিস্থানের জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে উদ্ভিদরাও উপযোজন করে থাকে।

অভ্যাস

১. আবহাওয়ার উপাদানগুলির নাম লেখো।

২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে কোনটা অধিক পরিবর্তনশীল তোমার উত্তরের যথার্থতা দেখাও।

৩. জলবায়ু কীভাবে জানা যায়? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৪. আবহাওয়া বলতে কী বোঝো?

৫. ব্যাঙের উপযোজন বর্ণনা করো।

৬. মেরুভল্লুকের উপযোজন নকশা চিত্র করে বোঝাও।

৭. পরিব্রাজী পরিযায়ী পক্ষী কাকে বলে?

৮. খুব ঠান্ডা জলবায়ুতে মেরুভল্লুক বাঁচতে পারে এই তথ্য সম্পর্কিত শব্দপুঞ্জ নিম্ন থেকে বাছো।

ক) সাদালোম, চামড়ার তলায় চর্বি, ঘ্রাণশক্তি

খ) পাতলা চামড়া, বড়চোখ, সাদালোম

গ) লম্বা লেজ, দৃঢ়পাঞ্জা, সাদাপঞ্জা

ঘ) সাদা শরীর, সাঁতারের জন্যে পা, গালিসি

ঘরে করার জন্যে কাজ:

১. তোমাদের ঘর থেকে বা তোমার পাশের বাড়ি খবরের কাগজ থেকে আবহাওয়ার সূচনা কেটে খাতায় লাগাও। কিছু বই থেকে আবহাওয়া সম্বন্ধীয় তথ্যকে খাতায় লিখে রাখো।

ড্রইং কাগজের ওপর এখন ক'টা কাগজ লাগিয়ে চার্ট প্রস্তুত করো।

২. নিম্নে দেওয়া ১০টি জেলার জানুয়ারি মাসের গড় বৃষ্টিপাতের সারণী ব্যবহার করে গ্রাফ অঙ্কন কর। উড়িষ্যার জানুয়ারি মাসের বৃষ্টিপাত ১৪ মি.মি সঙ্গে প্রত্যেক জেলার গড় বৃষ্টিপাতের তুলনা করো।

সারণী	(মি.মি এককে) বৃষ্টিপাত	
	জানুয়ারি	মোট
ময়ূরভঞ্জ	২১.৫	১৬৪৮
কেওনঝর	২২.২	১৫৩৪
সুন্দরগড়	১৯.৯	১৬৪৭
ঢেঙ্কানাল	১৫.৫	১৪২১
কালাহাণ্ডি	১১.৫	১৩৭৮
কোরাপুট	৬.৭	১৫.২২
পুরী	১৪.২	১৪৪১
বালেশ্বর	১৭.১	১৫৬৮

৩. তুমি দেখে থাকা পাখিদের একটা তালিকা করো, এই পাখিদের ঠোঁট ও পায়ে থাকা বিশেষত্বগুলি লেখ। এই বিশেষত্বগুলি অনুধ্যান করে পাখিদের উপযোজনের বিষয়ে এক পরিচ্ছেদ লেখো।

এখন বলো

(ক) বকের ঠোঁট ও পা লম্বা কেন?

(খ) টিয়াপাখির ঠোঁট বাঁকা এবং খুব শক্ত কেন?

(গ) টিয়াপাখি ও চিলের ঠোঁটের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? যদি থাকে, তবে কেন?

●●●

অষ্টম অধ্যায়

মাটি (মৃত্তিকা)

৮.১: উপক্রম

মাটি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। কয়লা, পেট্রোল, জলের মতো এ সম্পদও সীমিত। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ বাঁচার জন্যে মাটির ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উদ্ভিদ নিজের সৃষ্টির জন্যে মাটির তলা থেকে জল ও পোষক শোষণ করে। উদ্ভিদের মতন পিঁপড়ে ও ডেঁও পিঁপড়ে, হরিণ, হাতি, মানুষ ইত্যাদি প্রাণীরাও মাটির ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ১: মানুষ নিজে বাঁচার জন্যে মাটির ওপর কীভাবে নির্ভর করে, তার চারটি দৃষ্টান্ত দাও।

উইঢিপি মাটির এক পরিবর্তিত রূপ। উই নিজে থাকার জন্যে এটা গঠন করে থাকে। কেঁচো মাটিতে থেকে, তাকে ঝুরঝুরে করে তার উর্বরতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বাসস্থানরূপে ব্যবহার করে। তোমরা রোদের দিন মাটির পাত্র থেকে ঠান্ডা জল পান করে থাক। কিছু ঘরের দেওয়াল মাটিকে ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়। অন্য কতক ঘরের দেওয়ালের জন্যে ব্যবহৃত ইট ও সেই মাটির থেকে তৈরি হয়ে থাকে। মাটি আছে বলে আমরা বিভিন্ন ফসল ফলিয়ে আমাদের খাদ্যের আবশ্যকতা মেটাতে পারি। মৃত্তিকা শিল্পীদের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক খুব নিবিড়। মাটির হাঁড়ি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি গড়া হয়। মাটির তৈরি টেরাকোটা মূর্তি এখন বিদেশেও বহুলভাবে আদৃত হচ্ছে।

তোমাদের জন্যে কাজ : ৮.১

মাটির এক মুখ্য উপাদান বালির উপযোগিতা ও ব্যবহারের বিষয়ে চারটি বাক্য লেখো।

বালুকা শিল্পী ও মৃত্তিকা কারিগরেরা এখন দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করছেন। এ বিষয়ে তুমি খবরের কাগজ ও দূরদর্শন থেকে জেনে থাকবে।

প্রশ্ন ২: ওড়িশার যে বালুকা শিল্পী পৃথিবী প্রসিদ্ধ তার নাম লেখো।

এসো এই মাটির বিষয়ে অধিক জানব।

৮.২ মাটিতে জীবেদের বহুল উপস্থিতি :

খেলার মাঠ, চাষের জমিতে, তোমার বাগানে ঘোরার সময়ে সেখানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপস্থিতি দেখে থাকবে। তুমি যা দেখেছ সেগুলি তলায় দেওয়া সারণী ৮.১ অনুসারে খাতায় এঁকে পূরণ করো—

সারণী ৮.১ বিভিন্ন স্থানে জীব

স্থান	সেখানে থাকা উদ্ভিদ	সেখানে থাকা প্রাণী
খেলার মাঠ		
চাষের জমি		
তোমাদের বাগান		

তোমরা সাধারণত পিঁপড়ে, কেঁচো, ঝিঁঝি পোকা, কেন্নো ঘাসের মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখে থাকবে। এক ঝলক বৃষ্টির পর মাঠে লাল টুকটুকে মাধব বউ পোকা ঘুরতে দেখেছ কি? যদি না দেখে থাকো, এ বছর বর্ষা ঋতুতে দেখতে চেষ্টা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৮.২

তোমাদের বাগান, খেলার মাঠ, চাষের জমি, পুকুরের পাড়, রাস্তার ধার ইত্যাদি জায়গা থেকে কিছু কিছু মাটি সংগ্রহ করো। পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে তার উপর মাটির এই বিভিন্ন নমুনাগুলিকে আলাদা আলাদা পেতে রাখো। হ্যান্ডেল থাকা একটা লেন্সের সাহায্যে সেই মাটির নমুনাগুলিকে নিরীক্ষণ করো এবং তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো। তারপরে নিম্নলিখিত সারণীটি তোমার খাতায় এঁকে পূরণ করো।

সারণী ৮.২ বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার জীব

ক্রমিক সংখ্যা	যে স্থানের মাটির নমুনা	উদ্ভিদ	প্রাণী	অন্য পদার্থ
১	বাগানের মাটি	ঘাস	পিঁপড়ে	কাঁকর, জরি, চকলেটের খোল
২	রাস্তার ধারের মাটি			
৩	খেলার মাঠের মাটি			
৪	চাষের জমির মাটি			
৫	পুকুরের পাড়ের মাটি			
৬	নলকূপের নিকটের মাটি			

তোমাদের জন্যে কাজ : ৮.৩

বিভিন্ন স্থান থেকে আনা মাটির অর্ধেক, অর্ধেক পরিমাণ আলাদা আলাদা করে রোদে শুকনো করো। অল্প শুকিয়ে যাওয়ার পর, সেখানে থাকা বড় বড় খণ্ডগুলিকে গুঁড়ো করে আবার শোকাও। এখান থেকে একটা নমুনা

নিয়ে বড় বড় ফুটো থাকা চালুনি ব্যবহার করে সেই নমুনায় থাকা ছোট বালি গোটা, মোটা বালি, সরু বালি ও মাটিকে আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করো। সেগুলির আনুপাতিক পরিমাণ অনুমান করো।

জানলে ভালো—

মাটিতে থাকা উপরোক্ত উপাদানগুলির গড় ব্যাস নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

উপাদান	ব্যাস মি.মি.
কাঁকর মেশা বালি	২.০ থেকে ৫.০০
ছোট কাঁকর মেশা বালি	০.৭ থেকে ২.০০
মোটা বালি	০.০২ থেকে ০.২
সরু বালি	০.০০২ থেকে ০.০২

মনে রাখো:

ওপরে লেখা উপাদানগুলির আনুপাতিক পরিমাণ বদলে গেলে, মাটির গুণও বদলে যায় এবং তা বিভিন্ন নামে নামিত হয়।

তুমি সংগ্রহ করা মাটির নমুনাগুলির রং ও মসৃণতাকেও লক্ষ করো। রঙের বিবিধতা নিয়ে মাটি চার প্রকারের হয়ে থাকে। যথা লাল মাটি, সাদা মাটি, কালো মাটি ও ধূসর মাটি।

মনে রাখো

১. যে মাটিতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের লবণের পরিমাণ অধিক থাকে, তা সামান্য লাল রঙের দেখায়। তাই তাকে লাল মাটি বলা হয়।

২. যে মাটিতে চুন (ক্যালশিয়াম অক্সাইড), অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অধিক পরিমাণে থাকে তা সাদা দেখায়। তাই তাকে সাদা মাটি বলা হয়।

মাটিতে থাকা বালি, কাদা, জৈব পদার্থ ও লবণের আনুপাতিক অংশে থাকা বিভিন্নতাকে হিসাবে নিয়ে মাটিকে দো-আঁশলা, এঁটেল, পাঁক ও বেলে মাটি বলা হয়।

৮.৪ মাটির সৃষ্টি:

তাপমাত্রা, বাতাস, জল ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে শিলাখণ্ড ভেঙে মাটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। দিনে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ে ও রাতে তা কমে যায়। এর দ্বারা শিলার প্রসারণ ও সংকোচন হয়ে থাকে। সেইভাবে গ্রীষ্ম ঋতুতে শিলার অধিক প্রসারণ ও শীত ঋতুতে অধিক সংকোচন হয়ে থাকে। দৈনিক ও ঋতুভিত্তিক এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার জন্যে শিলাগুলিতে ফাটল সৃষ্টি হয়। বর্ষার জল, বায়ু, জলস্রোত ও উদ্ভিদের শিকড় এই ফাটলে ঢুকে শিলাগুলিকে ভেঙে ছোট ছোট শিলাখণ্ডে পরিণত করে। বৃষ্টির জল ও নদীর স্রোতে এই শিলাখণ্ডগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নিম্নের দিকে আসে এই গড়ানোর প্রক্রিয়ার সময়ে সেগুলি পরস্পর ধাক্কা খেয়ে আরো ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত হয়। শিলার চূর্ণ থেকে বালি সৃষ্টি হয়। চিত্র ৮.১ দেখো। অত্যন্ত ছোট ছোট কণিকাগুলি জলের সঙ্গে মিশে কাদা সৃষ্টি হয়। বালি, কাদা, জৈব পদার্থ ও শিলায় থাকা লবণ মিশে মাটি সৃষ্টি হয়।

মাটি সৃষ্টি হওয়া এক অত্যন্ত মন্থর প্রক্রিয়া। এমনকি এক ইঞ্চি মোটা মাটি সৃষ্টি হওয়ার জন্যে হাজার হাজার বছর লেগে যায়। তাই (মাটির অপচয় মাটিকে পুড়িয়ে ইট করা) আদৌ উচিত নয়।

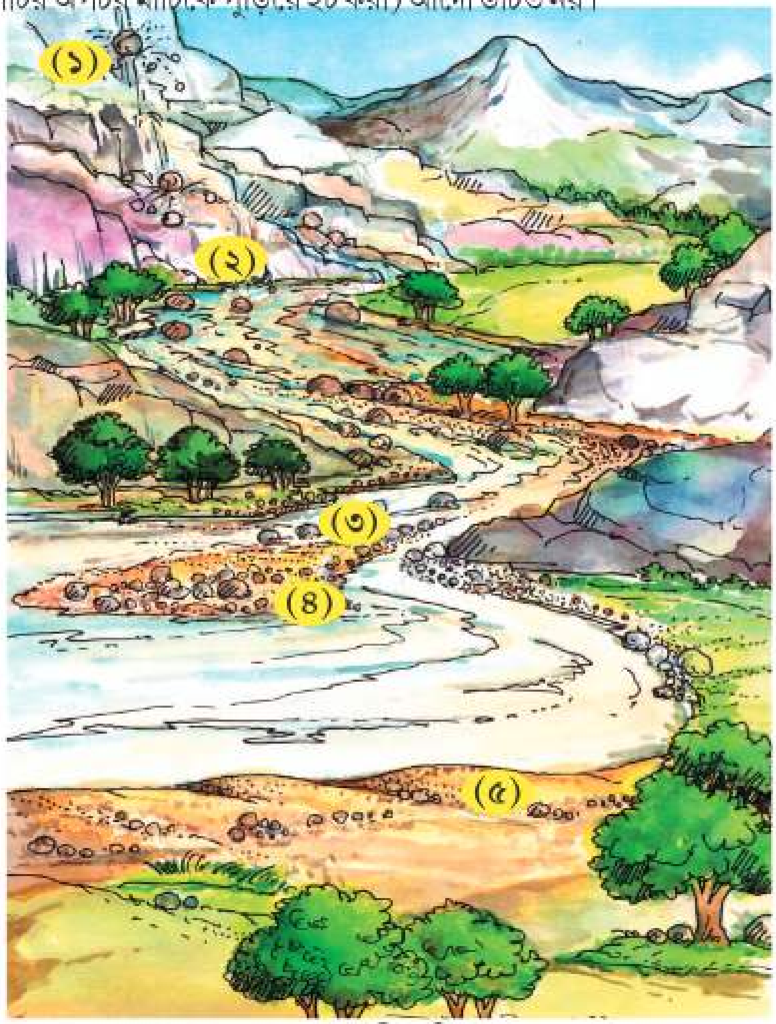

৮.১ মাটি সৃষ্টি

চিত্র বিষয়বস্তু: গাছ জঙ্গল পূর্ণ পাহাড় (১) পাহাড় থেকে গড়াচ্ছে বড় বড় পাথর খণ্ড (২) ছোট পাহার খণ্ড (৩) কাঁকর মেশা বালি (৪) মোটা বালি (৫) সরু বালি।

প্রশ্ন ৩: মাটির অপচয়ের দুটো দৃষ্টান্ত দাও।

৮.৫ মাটির পরিচিত্রণ:

মৃত্তিকার রং, এতে থাকা বিভিন্ন উপাদানের ও গভীরতাকে নিয়ে এর বিভিন্ন স্তর চেনা যায়, ওপর স্তরের মাটিকে ওপরে দেখা যায়। যখন গর্ত খোঁড়া হয়, এই স্তরগুলো নিরীক্ষণ করতে পারা যায়।

প্রশ্ন ৪ : কোনো কোনো কাজের জন্যে গভীর গর্ত হওয়া তোমরা দেখেছ? লেখো।

আমরা জানি, পাকা ঘরের ভিত খোঁড়ার সময়, কুয়ো, পুকুর, কেনাল খোঁড়ার সময়ে কম্পোস্ট খত প্রস্তুতের জন্যে গর্ত খোঁড়ার সময়, নলকূপ বসানোর সময়ে, রাস্তার চওড়া বাড়ানোর সময়ে, মধ্যম থেকে গভীর গর্ত খনন করা হয়ে থাকে।এই কার্য করার সময় মাটির বিভিন্ন স্তর তোমরা লক্ষ করে থাকবে। এই স্তরগুলি দেওয়া হয়ে থাকা চিত্রটি দেখো (চিত্র ৮.২)

(ক) ওপরের মাটি স্তর ঝুরঝুরে যৌগপূর্ণ, নরম ও ছিদ্রযুক্ত এখানে জলও থাকে। এতে পিঁপড়ে, ডেঁও পিঁপড়ে, উই, কেঁচো উদ্ভিদের শেকড় ও অণুজীবদের বাসস্থান।

(খ) দ্বিতীয় স্তরে কম্ হ্যমস্ ও অধিক খনিজ লবণ থাকে।ইহা শক্ত ও সংকোচিত।

(গ) তৃতীয় স্তরে ছোট ছোট কাঁকর ও পাথর থাকে।

(ঘ) সব শেষে কঠিন শিলাস্তর থাকে।

চিত্র: ৮.২ মৃত্তিকার স্তর

তোমাদের জন্যে কাজ: ৮.৪

কোনো স্থানে পাকাঘরের ভিত্ খোঁড়ার স্তরকে লক্ষ্য করে মৃত্তিকার স্তরকে একটা চিত্রে দেখাও। (চিত্র ৮.৩ দেখো)। তলার সারণীর মতন সারণী খাতায় আঁকো, তুমি সেই ভিত্ খোঁড়া হওয়ার গর্তে যা লক্ষ করলে তা তুমি সাবণীতে পূরণ করো।

সারণী ৮.৩ মাটির বিভিন্ন স্তরের গঠন ও ইহার উপাদান

স্তর বলয়	রং গঠন	জীব নির্জীব
প্রথম স্তর ক	কালো, ধূসর	জীবাণু, ছাতু, শিউলি, কেঁচো, বিহু
দ্বিতীয় স্তর খ	ধূসর	লবণ
তৃতীয় স্তর গ	রঙিন	ভাঙা শিলাখণ্ড
চতুর্থ স্তর ঘ	অতিকঠিন সাদা	কঠিন শিলাখণ্ড

তোমাদের জন্যে কাজ ৮.৫

মাটির ঢেলা নিয়ে হাতে গুঁড়ো করো। একটা কাচের গ্লাসে কিছু জল নাও। মাটির গুঁড়ো তার মধ্যে ফেলো। জলমেশানো মাটিকে একটা বাটিতে ঘেঁটে কিছু সময়ের জন্যে রেখে দাও।

- তুমি এখানে মাটি খণ্ড বালির আলাদা আলাদা স্তর দেখছ কি?
- বালি রগড়া, বালি, কাদা, স্তরের তফাত দেখছ কি?
- ওপর স্তরে মৃত গাছের পাতা, শেকড়, কিংবা অন্য পদার্থ দেখছ কি?

আমরা সাধারণত মাটির ওপর স্তরটি দেখে থাকি। ওপর স্তরের মাটির ওপরে বিভিন্ন স্থানে পচাপাতা আবর্জনা ইত্যাদি থাকে। ওপরের স্তরের রং সাধারণত ঘন ধূসর। এই স্তরের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে সাহায্য করে। এই মাটি ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্রের মাত্রা অনুযায়ী জল তলার স্তরে প্রবেশ করতে পারে। অনেক কৃমি পোকামাকড় ইঁদুর, ইত্যাদি এই স্তরেই দেখা যায়। দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কম ছিদ্রযুক্ত এটা কম হুমসযুক্ত এখানে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে।

তৃতীয় স্তরে পাথর, কাঁকর থাকে ইহাকে ভূশিলা স্তরও বলা যায়। কোদালের সাহায্যেও এই স্তরকে খোঁড়া সহজ নয়। তোমার পরীক্ষার ফলাফল এর সঙ্গে চিত্র ৮.৩কে তুলনা করো।

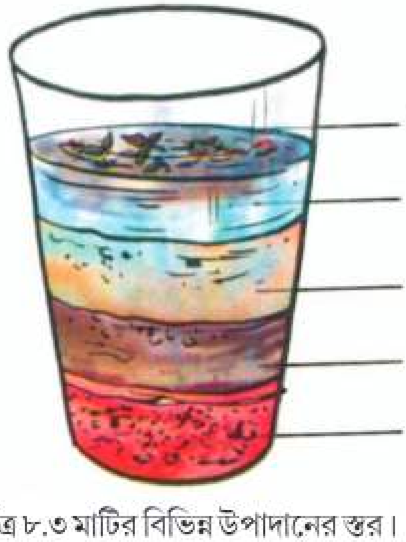

চিত্র ৮.৩ মাটির বিভিন্ন উপাদানের স্তর।

৮.৬ মাটির প্রকারভেদ:

আমরা জানলাম বালি ও কাদার অনুপাত প্রত্যেক স্থানে মাটিতে সমান থাকে না। যে প্রকার শিলার চূর্ণিভবনে মাটির উপাদান গঠিত, তদনুসারে মাটির নামকরণ হয়ে থাকে। মাটিতে থাকা উপাদান অনুযায়ী ফসল করা হয় ও গাছের প্রকারভেদ দেখা যায়। বালির পরিমাণ সমুদ্র উপকূলে ও নদীর অববাহিকায় অধিক। তাই সেরকম অঞ্চলে ঝাউগাছ অধিক দেখা যায়। মাটির সূক্ষ্ম কণিকাগুলি যদি মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে থাকে, তবে তাকে কাদা মাটি বলা হয়। বালি ও কাদার উপাদান সমপরিমাণে মিশে থাকলে তাতে দোআঁশলা মাটি গঠিত হয়ে থাকে। তাই মাটির উপাদানের অনুপাতের উপরে তার প্রকার ও ধর্ম নির্ভর করে।

বেলে মাটিতে সহজেই বায়ু প্রবেশ করতে পারে এবং জল নিষ্ক্রমণ তাড়াতাড়ি হতে পারে। তাই বেলে মাটি শুষ্ক ও হালকা। কাদা থাকলে মাটিতে বায়ু প্রবেশের পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু জল ধারণের ক্ষমতা বেড়ে যায়। বালি ও কাদার মিশ্রণে গঠিত দোআঁশলা মাটি উদ্ভিদ বাড়ার জন্যে উৎকৃষ্ট ধরনের মাটি। সম পরিমাণে বালি, কাদা ও পলিমাটির মিশ্রণে এঁটেল মাটি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৫: (ক) সাধারণত পলিমাটি কোথায় দেখা যায় লেখো।
(খ) এঁটেল মাটি মুখ্যত কোথায় দেখা যায় লেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ : ৮.৬

দোআঁশলা, এঁটেল ও বেলে মাটির নমুনা সংগ্রহ করো। সেখান থেকে বড়বড় কাঁকর, পাথর ও ঘাসকে বেছে আলাদা করে দাও। অল্প জলে ফেলে চটকে তাকে গুলি বানাও। সমতলপৃষ্ঠে তাকে গড়িয়ে সিলিন্ডার আকৃতির করো। এই সিলিন্ডার নিয়ে একটা বলয় তৈরি কর। প্রত্যেক নমুনা ব্যবহার করে এখন গুলি, সিলিন্ডার ও বলয় তৈরি করো। কোনপ্রকার মাটির নমুনায় এখন গোলা, সিলিন্ডার, বলয় ভালো হচ্ছে তা লক্ষ করো। তোমার তৈরি করা বলয়গুলিকে শুকিয়ে রাখো। চিত্র ৮.৪ দেখো ছবি

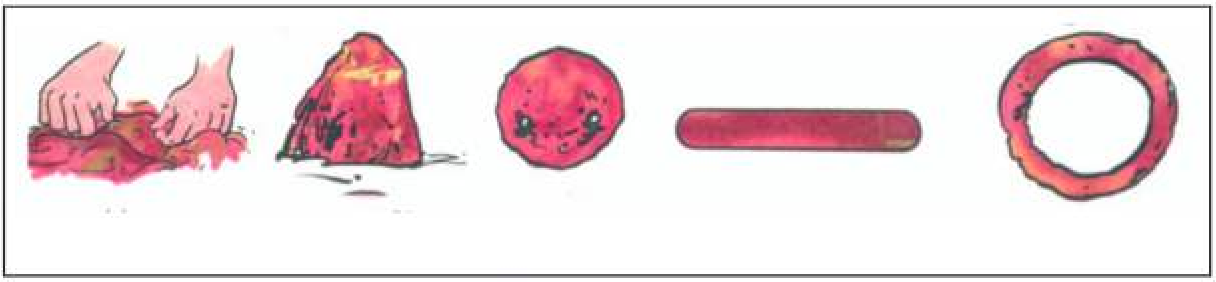

চিত্র ৮.৪ মাটির তৈরি বিভিন্ন আকৃতি

প্রশ্ন ৬: মাটির পাত্র, পুতুল ও মূর্তি গড়ার জন্যে কোন মাটি উপযুক্ত তা লেখো।

তুমি জানো রং অনুযায়ী মাটিকে লাল, কালো, সাদা ও ধূসর রঙে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেরকম আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা মৃত্তিকাকে পলি মাটি, কালো মাটি, লাল মাটি, মোরাম মাটি, পাহাড়ি মাটি, মরু মাটি ইত্যাদিতে নামিত করা হয়েছে।

পলি মাটি : এই মাটি মাল অঞ্চল থেকে নদীর জলস্রোতে বয়ে নিচু অঞ্চলের উপত্যকায় জমা হয়। এর মধ্যে বালি রগড়ার সঙ্গে কাদা অংশ অধিক থাকায় এটা খুবই উর্বর। আমাদের রাজ্যের কিছু অঞ্চলে পলি মাটি দেখা যায়।

কালো মাটি : এই মাটি আগ্নেয় শিলা থেকে সৃষ্টি। তাই এর রং কালো। এখানে লৌহ লবণ ও ম্যাগনেশিয়াম এর লবণ বেশি মাত্রায় থাকে। কার্পাস চাষের জন্যে এই মাটি খুবই উপযোগী।

লাল মাটি : অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ লবণ ও লৌহ লবণের উপস্থিতির জন্যে এর রং লাল। এটাও উর্বর মাটি।

মোরাম মাটি : লাল মাটির সঙ্গে কাদা, কাঁকর মিশলে কাঁকর মাটি বা মোরাম সৃষ্টি হয়। এটা অনুর্বর মাটি। ওড়িশার খোর্দ্ধা ও ভুবনেশ্বর অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।

পাহাড়ি মাটি : পাহাড়ি অঞ্চলে এটি থাকায় জৈব পদার্থের মাত্রা এখানে বেশি। তাই এটিও উর্বর।

মরু মাটি : বালি বেশি মাত্রায় থাকায় এটিকে বেলে মাটির মতন দেখায়। এর মধ্যে জৈব পদার্থ থাকে না। কিন্তু লবণ থাকে। এটা চাষের উপযোগী নয়। রাজস্থানে এই মাটি দেখা যায়।

প্রশ্ন ৭: ভূগোলে পড়া তথ্যকে ব্যবহার করে পলি মাটি, কালো মাটি, লাল মাটি, মরু মাটি, ভারতের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় লেখো।

৮.৭ মাটির ধর্ম:

তোমরা জানো মাটিতে ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র মাটির কণিকা, কণিকার মধ্যে থাকা খালি স্থান। এই স্থানে বায়ু ও জল থাকতে পারে। বড় বড় কণিকার মধ্যে বড় বড় ছিদ্র থাকে। কাদা ও পলি কণিকার মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। ছিদ্র বেশি বড় হলে, মাটিতে জল থাকতে পারে না। সব জল তলায় চলে যায়। খুব সরু ছিদ্র হলে জল সহজে বের না হওয়ায় স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় লেগে থাকে। বায়ু চলাচল ও জলের পরিমাণ, সহজে উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। হ্যুমাস অধিক জল ধারণ করতে পারে। বেলে মাটিতে হ্যুমাস মিশলে জল শোষণ করে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়। বেলে মাটিতে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ, এঁটেল মাটিতে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ ছিদ্র স্থান থাকে।

জৈব পদার্থের পরিমাণ তথা চাষ প্রক্রিয়া দ্বারা মাটিতে ছিদ্রের আকার ও সংখ্যা বেড়ে যায়। অম্ল মাটিতে চুন কম পরিমাণ থাকে। ক্ষারযুক্ত মাটিতে লৌহ যৌগিক অবস্থায় থাকে। গ্রানাইট শিলায় গঠিত মাটি অম্লযুক্ত। অধিক বৃষ্টিপাত হলে মাটির থেকে চুন, লবণ ধুয়ে ক্ষার মাটি অম্ল মাটিতে পরিণত হয়ে থাকে। জৈবিক পদার্থ মাটিতে প্রায় ১০ থেকে ৩০ শতাংশ থাকে। লাল মাটিতে ১০ শতাংশ থাকার সময়ে কৃষ্ণ কার্পাস মাটিতে কম থাকে। জৈবিক পদার্থের জন্যে মাটি হালকা হয় এবং তার জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মাটির জন্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও গন্ধক জৈবিক পদার্থের থেকে পাওয়া যায়।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৮.৭

দুটি টিনের কৌটো নাও এবং প্রত্যেকের তলায় একটা ফুটো করো। অথবা ফুটো থাকা দুটো মাটির টব নাও। তার মধ্যে একটাতে বেলে মাটি ও অন্যটিতে দোআঁশলা মাটি নিয়ে কৌটো টব-কে পূর্ণ করো। প্রত্যেকটিতে সমান সংখ্যক পূর্ণ গ্লাস জল ঢালো। তুমি দেখবে কিছু সময় পরে কৌটো টব-এর তলায় থাকা ফুটো দিয়ে জল বেরোবে।

প্রশ্ন ৮: ওপরে করা পরীক্ষার থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌছলে তা লেখো। যে প্রক্রিয়ায় ওপরে ঢালা জল তলার ফুটো দিয়ে বেরোল তার নাম লেখো।

এ বিষয়ে তোমার সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

যে প্রক্রিয়ায় উপরের জল তলায় গেল তাকে **অবশোষণ** বলা হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৮.৮

তোমাদের জন্যে কাজ ৮.৭-এ তুমি অর্জন করে থাকা প্রারম্ভিক দক্ষতাকে ব্যবহার করে এখন আস্তে আস্তে সমান পরিমাণে জল ঢেলে পরীক্ষাটি পুনর্বার করো এবং প্রত্যেক কৌটো টবের তলার ফুটো দিয়ে প্রথম জলের ফোঁটা বেরোতে কত সময় লাগল তা তোমার খাতায় লেখো।

প্রশ্ন ৯ : ওপরে করা পরীক্ষার সাহায্যে তুমি দোআঁশলা, বেলে ও এঁটেল মাটি কীভাবে চিনবে লেখো। এ বিষয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৮.৯

৮.৭-এ ব্যবহৃত হয়ে থাকা টিনের কৌটোকে খালি করে সেখান থেকে একটাতে দোআঁশলা মাটি ও অন্যটিতে বেলে মাটি নাও। উভয় টিনের কৌটো একটা জল থাকা পাত্রের উপর রাখো। পরের দিন টিনের কৌটোয় থাকা শুকনো মাটির উপরের স্তরকে দেখো ও যা দেখলে তা খাতায় লেখো। চিত্র ৮.৬ দেখো

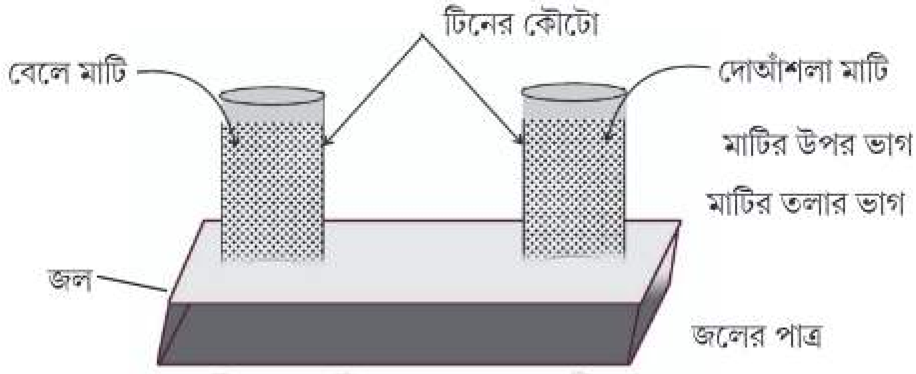

চিত্র ৮.৫ মাটির জল অবশোষণ পরীক্ষণ

প্রশ্ন ১০: এই পরীক্ষায় তুমি দেখবে যে মাটির ওপরের স্তর ভিজে হয়ে গিয়েছে। এমন কেন হল লেখো। এই প্রক্রিয়াকে কী বলে লেখো।

এই বিষয়ে তোমার সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো। ওপরের পরীক্ষায় মাটির ভেতর দিয়ে জল তলার থেকে ওপরে ওঠার প্রক্রিয়াকে শোষণ বলে।

৮.৮ মাটির জল শোষণ ক্ষমতা

মাটির জল শোষণ ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্যে নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করণীয়।

আবশ্যকীয় উপকরণ: বিকার, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, ড্রপার, গ্রাম ওজন নিক্তি, মাপের গ্লাস।

বিকারের উপর ফানেল রেখে দেখো যেন সেটা তলায় কিছুটা ঝুলে থাকে।

দোআঁশলা মাটির নমুনা ৫০ গ্রাম নাও এবং তাকে গুঁড়ো করো। ফিল্টার কাগজ ভাঁজ করে কোনাকার করে ফানেলের ভিতরে ঢোকাও ও তার ওপর সেই মাটি ঢালো। মাপ গ্লাস বা মাপের নালায় ৫০ বা ১০০ মিলি জল ঢালো। তারপর একটা ড্রপার ব্যবহার করে, এই জলকে ফানেলে থাকা মাটির উপরে খেলিয়ে খেলিয়ে ধীরে ধীরে ফেলো। চিত্র ৮.৭ দেখো। কিছু সময় পর তুমি দেখবে ফানেল দিয়ে জলের ফোঁটা বিকারের মধ্যে পড়ছে। এখান থেকে কত পরিমাণে জল বিকারে পড়ছে তা খাতায় লেখো।

মাটির ওজন = ৫০ গ্রাম

মনে করো মাপের গ্লাসের জলের পরিমাণ = U মিলি

চিত্র ৮.৬ জলশোষণ পরীক্ষণ

বিকারে পড়ে থাকা জলের আয়তন = V মিলি

মাটি দ্বারা শোষিত জলের পরিমাণ = U - V মিলি

শোষণ জলের ওজন = (U - V) গ্রাম (১ মিলিগ্রাম জলের ওজন ১ গ্রাম)

শতকরা শোষণের পরিমাণ $= \frac{U - V}{50} \times 100$

তুমি মাটির ভিন্ন ভিন্ন নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করো এবং ফলাফল আলোচনা করো। আলোচনা দ্বারা নিম্নোক্ত দুটি প্রশ্নের উত্তর খাতায় লেখো।

- কোন মাটিতে খুব তাড়াতাড়ি জল শোষণ হয় ?
- কোন মাটিতে খুব কম জল শোষণ হয় ?

৮.৮ মাটি ও ফসল:

আমরা জানি যে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা ও মাটির ভেতরে বায়ুর চলাচল প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের অভিবৃদ্ধির জন্যে আবশ্যক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। জৈবিক পদার্থ ও হ্যুমাসের উপস্থিতি দ্বারা মাটির উর্বরতা, জলধারণ ক্ষমতা, তথা বায়ু চলাচল পরিমাণ বেড়ে থাকে, আমরা পড়েছি যে মাটির মুখ্য উপাদান বালি, পলি ও কাদা। তাদের উপস্থিতি অনুপাতের বিভিন্নতা নিয়ে, মাটির প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। মাটির প্রকার অনুসারে কোন মাটি কোন ফসলের জন্যে উপযুক্ত তা নির্ধারণ করা হয়। তলার সারণীর অনুধ্যান করো।

সারণী ৮.৪ মাটির কিসম, বালির পরিমাণ ও জলধারণের ক্ষমতা

মাটির কিসম	বালির পরিমাণ	জল ধারণ ক্ষমতা
বেলে	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন
মটাল	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক
দোরমা	মধ্যম	মধ্যম

যেহেতু বিভিন্ন ফসল, তরিতরকারি ইত্যাদি বিভিন্ন মাটিতে চাষ করা হয়, এসো সে বিষয়ে আলোচনা করব, তলার সরণী অনুধ্যান করো।

সারণী ৮.৫ মাটির কিসম ও ফসল

মাটির কিসম	কোন কোন ফসলের জন্যে ইহা উপযুক্ত
বেলে	চিনাবাদাম, লাল আলু, আলু, থাম আলু
এঁটেল	ধান, আখ, গম, পাট,
দোআঁশলা	ধান
জলকারা দোআঁশলা	গম
দোআঁশলা পলি মাটি	মকা
গভীর দোআঁশলা	আখ
কালো মাটি	কাপাস

কুমড়ো, শিম, শসা, ঝিঙে, ঢেঁড়স, বেগুন, সজনে ডাঁটা, উচ্ছে ইত্যাদি তরিতরকারি সাধারণত সবরকমের মাটিতে হয়ে থাকে।

তোমাদের জন্যে কাজ: ৮.১০

শসা, তরমুজ, কলা, নারকেল, মুলো ও শাক ইত্যাদি ফসল সাধারণত কোন প্রকার মাটিতে চাষ হয় তা চাষি তোমার বসতির অন্য বয়স্ক ব্যক্তি তথা, বাবা, মা এদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সারণী প্রস্তুত করো।

তোমাদের গ্রামের চাষ জমিতে চাষিরা বছরের মধ্যে একাধিক ফসল চাষ করে কি? এ বিষয়ে তোমার সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো। আলোচনা থেকে যা জানলে তা নিম্ন সারণীর মতো খাতায় এঁকে পূরণ করো।

মাটির ধরন	মুখ্য ফসল	অন্যান্য ফসল
দোরমা	ধান	কপি ও অন্যান্য তরিতরকারি

৮.৯ : মৃত্তিকা সংরক্ষণ-

আমরা পড়েছি পৃথিবীতে মৃত্তিকার পরিমাণ সীমিত, তথা মৃত্তিকা সৃষ্টির জন্যে হাজার হাজার বছর লেগে যায়। যেহেতু সব ধরনের ফসলের জন্যে মৃত্তিকা নিতান্ত আবশ্যক, মৃত্তিকার অবক্ষয় ঘটলে এ পৃথিবীর জীবেদের বাঁচার জন্যে খাদ্য পাওয়া ক্রমে কষ্টকর হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে মৃত্তিকা অবক্ষয় হয়ে থাকে। মৃত্তিকা অবক্ষয়ের মুখ্য প্রাকৃতিক কারণ জল ও বায়ু। বৃক্ষ নিজের শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকাকে বেঁধে রাখে এবং অবক্ষয় বন্ধ করে। তাই আমাদের গাছ না কেটে নতুন বৃক্ষ রোপণ করা উচিত।

প্রশ্ন ১১ : যে যে কৃত্রিম প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকার অবক্ষয় ঘটছে, তার মধ্যে থেকে দুটো কারণ লেখো।

কী শিখলে:

— মাটির সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্ক আছে।

— মাটির উপাদানের মধ্যে বালি, কাঁকর, জৈবিক পদার্থ অন্তর্ভুক্ত।

— বেলে, এঁটেল, দোআঁশলা মাটির জলধারণের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন।

— মাটির জল শোষণ ও জলধারণ ক্ষমতা তার কণিকার মধ্যে থাকা ছিদ্রের উপরে নির্ভর করে।

— মাটির জল শোষণ ক্ষমতা জানা আবশ্যক।

— মাটির স্তরের ওপর মাটি ছিদ্রযুক্ত ও এর মধ্যে হ্যুমাস অধিক থাকে বিভিন্ন যৌগপূর্ণ।

— বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষের জন্যে মাটিতে পার্থক্য দেখা যায়।

— মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্যে যোজনা প্রস্তুত করা উচিত।

অভ্যাস

১. সর্বাধিক জলধারণ ক্ষমতা থাকা মাটি কোনটি?

(ক) বেলে মাটি

(খ) কর্দম

(গ) দো-আঁশলা মাটি

(ঘ) এঁটেল মাটি।

২. উর্বর মাটির ওপর স্তরে কোনটি থাকে?

(ক) পাথর

(খ) কাঁকর

(গ) বালি

(ঘ) হ্যুমাস

৩. 'ক' স্তম্ভে থাকা শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত 'খ' স্তম্ভের শব্দকে সংযোগ করো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
প্রথম স্তর	হ্যুমাস্ অধিক
দ্বিতীয় স্তর	কেঁচোর গর্ত
তৃতীয় স্তর	পাথর ও নুড়ির সংখ্যা বেশি
চতুর্থ স্তর	লবণের পরিমাণ বেশি
	গাছের পাতা

৪. মাটি কীভাবে সৃষ্টি হয় বর্ণনা করো।

৫. বেলে, দোআঁশ, এঁটেল মাটির গঠন ও বিশেষতা লেখো।

৬. মাটির পরিচিত্রণ করে স্তর দর্শাও।

৭. মৃত্তিকা অবক্ষয়ের চারটি কু-পরিণতি লেখো।

৮. মৃত্তিকা সংরক্ষণ কেমনভাবে করা যেতে পারে লেখো।

৯. ইট ব্যবহার করে ঘর তৈরি করার দ্বারা আমাদের পরোক্ষে কী প্রকার ক্ষতি হচ্ছে?

১০. তোমার বাগানের শিম, ঢেঁড়স ও উচ্ছে গাছ লাগানো হয়েছে ও সেখানে ভালো ফসল ধরছে। তাই তোমার বাগানের মাটি কোন প্রকারের মাটি হয়ে থাকবে লেখো।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

কোন মাস ঋতুতে কোন কোন ফসল তোমার গ্রামের চাষের জমিতে চাষ করা হয়, তার তথ্য সংগ্রহ করো। বিশেষ করে বর্ষা ঋতুতে চাষ হওয়া ফসলের তালিকা করো।

●●●

নবম অধ্যায়

জীবনের জন্যে শ্বাসক্রিয়া : প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বসন

গরমের দিনে, বিক্রমের বাৎসরিক পরীক্ষা চলছিল। অনেকগুলি শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার দরুন অনেকে ছাত্রাবাস ছেড়ে বাড়ি চলে গেছিল। সে তার ঘরে একা হয়ে গিয়েছে।। সে দিন ছিল শেষ পরীক্ষা। সকাল ৭টায় আরম্ভ হবে। তার ঘুম ভাঙল দেরিতে। তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শীঘ্র নিত্যকর্ম শেষ করে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রকোষ্ঠে দৌড়াল। পৌছনোর সময় মাত্র পাঁচ মিনিট থেকেও আরও কম ছিল। ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন এত জোরে জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিছে। বিক্রম সব কথা বলল। কিন্তু তার মনে একটা নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি হল। দৌড়নোর জন্যে তার নিশ্বাস প্রশ্বাস কেন দ্রুত হল ? এমন কি সকলের হয় ? এর দ্বারা কোন কার্য সাধিত হয় ? যদি আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসের কারণ বুঝতে পারব তবে বিক্রমের প্রশ্নের সমাধান করতে পারব। নিশ্বাস, প্রশ্বাস শ্বাসতন্ত্রের বায়ুচলাচল প্রক্রিয়া। ইহা শ্বসনের এক অংশ। আমাদের জীবনের জন্যে ইহা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকাকালীন শ্বসন প্রক্রিয়া চালু রেখে থাকে। এই শ্বসন বিষয়ে এখন আলোচনা করব।

৯.১ শ্বসনের আবশ্যকতা:

আমরা জানি যে প্রত্যেক জীব অসংখ্য কোষ নিয়ে গঠিত। তাই কোষকে জীব শরীরের মৌলিক গাঠনিক ও ক্রিয়াত্মক একক বলা হয়। জীব শরীরের প্রত্যেক কোষ কিছু না কিছু কার্য করে থাকে। সেগুলি পোষণ, পরিবহন, উত্সঙ্কন ও প্রজনন হতে পারে। এ সব কাজের জন্যে শক্তির আবশ্যক হয়ে থাকে। এমনকি আমরা যখন খাচ্ছি, শুচ্ছি, বসছি, লেখাপড়া করছি, তখনও শক্তি খরচ হয়। তবে এ সমস্ত কার্যের জন্যে অবশ্যক শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছি। তুমি বলতে পারবে কি তোমার মা তোমাকে নিয়মিতভাবে খাওয়াদাওয়া করতে কেন বলেন ?

খাদ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। শ্বসনে সেই শক্তি খাদ্যের থেকে নির্গত হয়। সেইজন্যে জীবজগৎ খাদ্য আবশ্যক করে থাকে। প্রশ্বাস দ্বারা আমরা বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু গ্রহণ করি। বায়ুতে অম্লজান থাকে। রক্ত এই অম্লজানকে শ্বাসতন্ত্রের থেকে নিয়ে শরীরের সমস্ত কোষে পৌছে দেয়। কোষের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের অম্লজান খাদ্যকে সরলীকৃত করে অঙ্গারকাম্ল ও জলে পরিণত করে। তার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও উৎপন্ন হয়ে থাকে। কোষে খাদ্যের বিঘটন ঘটে শক্তি জাত প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলা হয়। জীবমণ্ডলের সমস্ত জীবেদের ক্ষেত্রে কোষীয় শ্বসন সম্পাদিত হয়ে থাকে।

যদি খাদ্যের বিঘটন অম্লজান দ্বারা হয় তবে তাকে বায়ুশ্বসন বলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অম্লজানের অভাবে খাদ্যের বিঘটনও হতে পারে। ইহাকে অবায়ু শ্বসন বলা হয়। গ্লু-কোজের মতন শর্করা জাতীয় পদার্থ শ্বসন দ্বারা অঙ্গারকাম্ল, জল ও শক্তিতে পরিণত হয়ে থাকে।

$$\text{গ্লু কোজ} \xrightarrow{\text{অম্লজানের/সহায়তায়}} \text{অঙ্গারকাম্ল + জল + শক্তি}$$

তোমরা জানো কি ? ইস্টের মতন কিছু শক্তি অণুবীজ আছে যারা অম্লজানকে একদম শক্তি উৎপন্নের জন্যে ব্যবহার করে না। অম্লজান বিনা তারা বেঁচে থাকতে পারেও তাদের অবায়ুজীবী বলা হয়। তারা অবায়ু শ্বসন দ্বারা

শক্তি পেয়ে থাকে। অম্লজানের অনুপস্থিতিতে গ্লুকোজ বিখণ্ডিত হলে, সুরাসার অঙ্গারকাম্ল ও শক্তিতে পরিণত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া নিম্নমতে হয়ে—

$$\text{গ্লুকোজ} \xrightarrow{\text{অম্লজানের/অনুপস্থিতিতে}} \text{সুরাসার} + \text{অঙ্গারকাম্ল} + \text{শক্তি}$$

> ইস্ট এককোষী জীব। অম্লজান অনুপস্থিতিতে তাদের শ্বসন হয়। এবং এই প্রক্রিয়ায় সুরাসার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই জন্যে ইহা বিভিন্ন প্রকার মদজাতীয় পানীয় প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নির্গত অঙ্গারকাম্লকে পাউরুটি প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। অঙ্গারকাম্ল থাকার জন্যে পাউরুটি স্পঞ্জের মতন নরম হয়ে থাকে।

আমাদের মাংসপেশি কোষেরও অবায়ু শ্বসন ক্ষমতা আছে, কিন্তু ইহা খুব কম সময়ের জন্য সম্ভব। কঠিন ব্যায়াম, দৌড়ানো, (চিত্র ৯.১), সাইকেল চালনা হাঁটা আদি কাজ ঘণ্টা ঘণ্টা করে করলে শরীরের শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়, সেই সময়ে শক্তি সৃষ্টির জন্যে অম্লজান পাওয়া সীমিত হলে, মাংসপেশি কোষের মধ্যে অবায়ু শ্বসন হয়ে শক্তি পাওয়া যায়।

$$\text{গ্লুকোজ} \xrightarrow[\text{(মাংসপেশিতে)}]{\text{অম্লজান অনুপস্থিতিতে}} \text{লাক্‌টিক্ অম্ল} + \text{শক্তি}$$

তোমরা কখনো কঠিন ব্যায়াম করে মাংসপেশিতে আকুঞ্চন জনিত ব্যথা (Cramp) অনুভব করেছ কি? এই ব্যথা মাংসপেশীয় কোষে অবায়ু শ্বসন দ্বারা হয়। প্রক্রিয়াটিতে গ্লুকোজ অসম্পূর্ণভাবে বিখণ্ডিত হয়ে লাক্‌টিক্ অম্লে পরিণত হয়। লাক্‌টিক্ অম্ল বহু পরিমাণে কোষে জমা হলে মাংসপেশিতে যন্ত্রণা দেয়। গরম জলের উপচার বা মাংসপেশিতে মালিশ করলে সে স্থানে রক্ত সঞ্চালন ত্বরান্বিত হয়। ফলে মাংসপেশিতে অম্লজান অধিক পরিমাণে এসে পৌঁছে যায় ও লাক্‌টিক্ অম্ল পরিবর্তিত হয়ে অঙ্গারকাম্ল ও জলে পরিণত হয়। যন্ত্রণা কমে যায়।

৯.২ নিশ্বাস প্রশ্বাস

তোমাদের জন্য কাজ ৯.১

(এই কাজটি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হবে)

তোমার নাকের ফুটো ও মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে টেবিলের ওপরে ঘড়ি রেখে লক্ষ করো। কিছুক্ষণ পরে বলো তোমার কেমন লাগছে? কত সময় নাক ও মুখ বন্ধ রাখতে পারলে? তুমি যত সময় নিশ্বাস আটকাতে পারলে, তা তোমার খাতায় লেখো। (চিত্র ৯.২)

তুমি জানতে পারলে যে নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে একজন বেঁচে থাকতে পারবে না। বায়ুকে শরীরের ভেতরে নেওয়াকে প্রশ্বাস ও তাকে ত্যাগ করা প্রক্রিয়াকে নিশ্বাস বলা হয়। ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। জীবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু থাকে।

মিনিট প্রতি একজন যতবার প্রশ্বাস নিশ্বাস নিয়ে থাকে তাকে শ্বসন হার বলে। শ্বসনকালে প্রশ্বাস, নিশ্বাস ক্রম অনুসারে হয়। এটা কি এক জীবের জন্যে নির্দিষ্ট? ইহা কি শরীরের অম্লজানের আবশ্যকতার ওপর নির্ভরশীল? পরবর্তী কার্যদ্বারা এর সমাধান করব।

চিত্র ৯.১: ব্যায়াম করার সময়ে মাংসপেশিতে অবায়ু শ্বসন হতে পারে।

চিত্র ৯.২ নিশ্বাস বন্ধ অবস্থায়

তোমাদের জন্যে কাজ : ৯.২

আমরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি। আমাদের অজান্তে এটা চলতে থাকে। যদি তুমি চেষ্টা করো তবে তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের হার তুমি নিজেই জানতে পারবে। প্রতি মিনিটে কতবার প্রশ্বাস নিচ্ছ ও কতবার নিশ্বাস ছাড়ছ তা নির্ণয় করো। তোমরা যতবার প্রশ্বাস নিচ্ছ, ঠিক ততবার নিশ্বাস ছাড়ছ কি? দ্রুত হাঁটা বা দৌড়ানোর পরে, তোমার মিনিট প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের হার বের করো। এসব কাজের পর সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে পুনর্বার প্রশ্বাস নিশ্বাসের হার নির্ণয় করো। নিম্নে প্রদত্ত সারণী অনুসারে নিজের বন্ধুদের বিভিন্ন অবস্থায় মিনিট প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের হার নির্নয় করো।

সারণী ৯.১ বিভিন্ন অবস্থায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হারের পরিবর্তন

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার—

সহপাঠীদের নাম	বসে থাকা অবস্থায়	১০ মিনিট দ্রুত হাঁটার পর	১০০ মিটার দৌড়ানোর পর	বিশ্রামরত অবস্থায়

একজন লোক যখন অধিক কার্য করে তখন তার অধিক শক্তির দরকার হয়। তাই সে দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। ফলে শরীরের কোষের অধিক শক্তি আবশ্যক হয়। এর জন্যে খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং অধিক শক্তি শরীরের কোষ থেকে পায়। তোমরা এখন বলতে পারবে কি অধিক শারীরিক কার্য করলে, আমাদের কেন তাড়াতাড়ি খিদে পায়?

তোমরা জানো কি?

বিশ্রাম নেওয়ার সময়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মিনিট প্রতি ১৫–১৮ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকে। কঠিন পরিশ্রম করার সময় তার মিনিট প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের হার ২৫ বার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। পরিশ্রম করার হেতু আমরা কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি তা নয় বরং আমরা দীর্ঘ প্রশ্বাস নেওয়ার দ্বারা অধিক অম্লজান গ্রহণ করে থাকি।

তোমাদের জন্যে কাজ ৯.৩:

চিত্র ৯.৩-তে বিভিন্ন কার্য দেখানো হয়েছে। কোন অবস্থায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার সর্বাধিক এবং কোন অবস্থায় সবথেকে কম তা তোমার খাতায় লেখো। নিজের অনুভূতির থেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যেক ছবিকে ক্রম অনুসারে সংখ্যা দাও।

চিত্র ৯.৩ বিভিন্ন কাজের সময়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হারের ভিন্নতা

৯.৩ আমরা কীভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিই?

এখন আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া কীভাবে চালু থাকে, জানব। আমরা দুটি নাকের ফুটো দিয়ে বায়ু গ্রহণ করি। প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে বায়ু নাকের ফুটো দিয়ে নাসারন্ধ্রে যায়। পরে শ্বাসনালি দিয়ে এটা ফুসফুসে পৌঁছায়। বক্ষগহ্বরে ফুসফুস অবস্থিত (চিত্র ৯.৪)। বক্ষাস্থি বা পাঁজরা হাড়ে ঘিরে আছে। বক্ষগহ্বরের তলার ভাগে এক বড় মাংসল অংশ থাকে। তা হল মধ্যচ্ছদা। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে বক্ষাস্থি ও মধ্যচ্ছদার চলন ঘটে থাকে।

প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে বক্ষাস্থি ওপরে ফুলে ওঠে। ঠিক সে সময়ে পেটে মাংসপেশি সংকুচিত হওয়ার জন্যে মধ্যচ্ছদা তলার দিকে চেপে গিয়ে সমতল হয়ে যায়। বক্ষগহ্বরের আয়তন সাধারণ অবস্থা থেকে প্রায় কুড়ি শতাংশ বেড়ে যাওয়ার দ্বারা ফুসফুসের ভেতর বায়ু প্রবেশ করে।

উদরীয় মাংসপেশির প্রসারণ হলে মধ্যচ্ছদা তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। বক্ষাস্থি তলার দিকে ও ভেতরের দিকে চলে আসে। তাই বক্ষগহ্বরের আয়তন কমে যায় ও তার মধ্যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে বায়ু ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যায় (চিত্র ৯.৫)। আমাদের শরীরের এই চলন ক্রিয়া আমরা চাইলে অনুভব করতে পারব। দীর্ঘ প্রশ্বাস নাও। তলার পেটে হাত রাখো। চলন অনুভব করো। তুমি এর থেকে কী শিখলে?

তুমি জানো কি?

- ধূমপান ফুসফুসকে নষ্ট করে। ধূমপান কর্কট রোগেরও কারণ হতে পারে। তাই একে বর্জন করা নিতান্ত জরুরি।
- আমাদের চারদিকে থাকা বায়ুতে বিভিন্ন প্রকারের অ-দরকারি ক্ষতিকারক পদার্থ যথা ধুলো, ধোঁয়া, পরাগরেণু ইত্যাদি আছে। আমরা যখন প্রশ্বাস নিই, নাকের ফুটোয় থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম দ্বারা তা নাসারন্ধ্রে আটকে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এই পদার্থগুলি নাকের ভিতরে চলে যায়। তার পরে তা নাকে নানা যন্ত্রণা দিয়ে থাকে ও আমাদের সেইজন্যে হাঁচি হয়। আমাদের হাঁচি হওয়ার দরুন প্রশ্বাস বায়ুতে জমে থাকা বাহ্য অ-দরকারি পদার্থকে বার করে দিয়ে থাকি। ফলে ধূলিকণা মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে।

মনে রাখো:
তোমার হাঁচার সময়ে নাকে রুমাল ব্যবহার করা উচিত। ফলে যে ক্ষতিকারক পদার্থ তোমার নাক থেকে বেরিয়ে আসছে। তাকে কেউ প্রশ্বাস নেবে না।

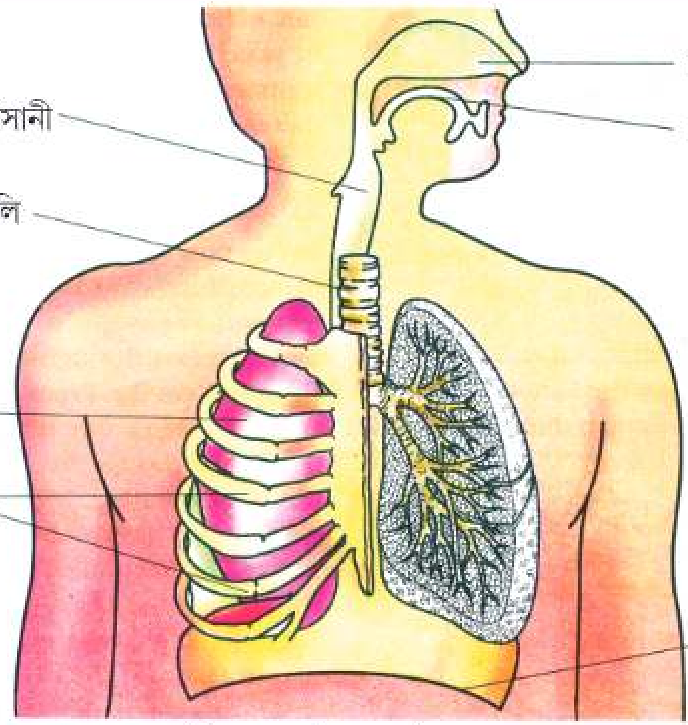

চিত্র: ৯.৪ মানুষের শ্বাসযন্ত্র

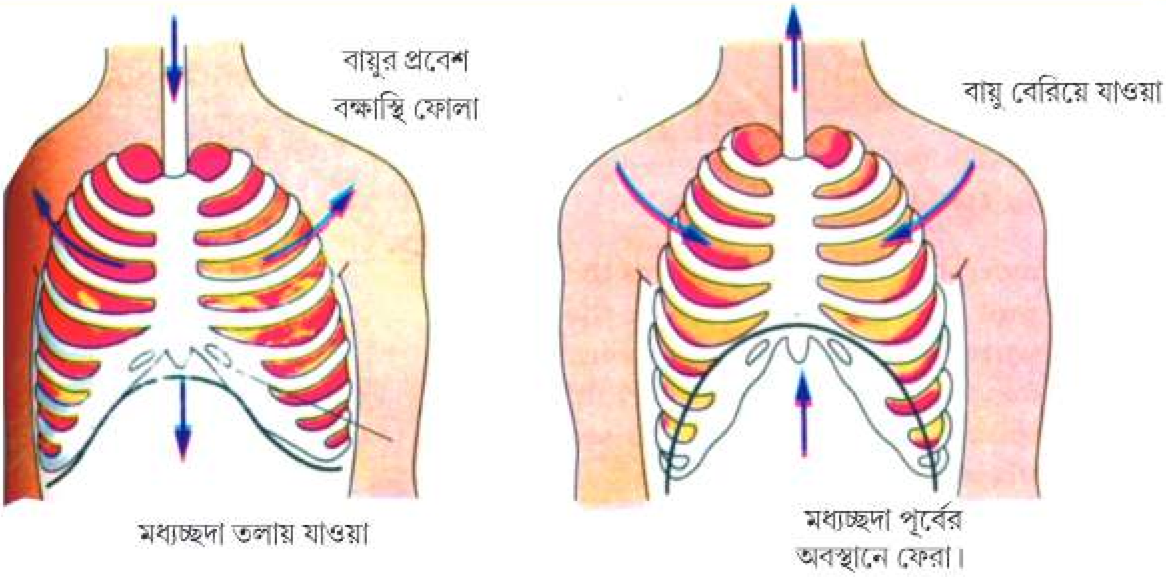

চিত্র: ৯.৫: মানুষের শ্বাসক্রিয়া

তোমাদের জন্যে কাজ ৯.৪:

দীর্ঘশ্বাস নাও, তোমার শরীর চওড়া একটা ফিতের সাহায্যে মাপো, ইহাকে সারণী ৯.২-তে লেখো, শ্বাস ছাড়ো। বর্তমান আবার বুকের চওড়া মাপো। শিক্ষক শিক্ষায়ত্রীকে দেখাও। কোন সহপাঠী নিজের বুক সকলের থেকে বেশি ফোলাতে পেরেছে (চিত্র ৯.৬)।

চিত্র ৯.৬ বুকের মাপ

সারণী ৯.২ কতক সহপাঠীদের বুকের আকারের ওপর নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রভাব

বক্ষের আকার (সেন্টিমিটার)

সহপাঠীর নাম	প্রশ্বাসে	নিশ্বাসে	পার্থক্য

তোমাদের জন্যে কাজ: ৯.৫

চিত্রে দেওয়ার মতন একটা চওড়া প্লাস্টিকের বোতল নাও। তার তলার ভাগ কেটে বের করে দাও। ওপরের মাথায় থাকা ছিপিতে এমন একটা ফুটো করো যেন তার মধ্যে একটা কাচের নল ঢুকতে পারবে। নলের অগ্রভাগ দুভাগ হওয়া দরকার (চিত্র ৯.৭)। প্রত্যেক ভাগের আগে ফোলানো না হওয়া একটা বেলুন লাগাও। বোতলের খোলা তলার ভাগে রবার বেল্ডের সাহায্যে একটা রবার বা প্লাস্টিকের খণ্ড বাঁধো। বোতলটিকে বায়ু মুক্ত করে ছিপি বন্ধ করো।

তলার ভাগে লেগে থাকা রবার বা প্লাস্টিকের আবরণকে তলার দিকে টানো। বোতলের ভেতরে থাকা বেলুনকে দেখো, তার পর সেই তলার আবরণকে ওপরের দিকে ঠেলে ও বেলুনকে লক্ষ করো। বেলুনের কিছু পরিবর্তন দেখছ কি?

বেলুনের যে পরিবর্তন ঘটল আমাদের প্রশ্বাস ও নিশ্বাস নেওয়ার সময়ে ফুসফুসের ঠিক সেই পরিবর্তন ঘটে।

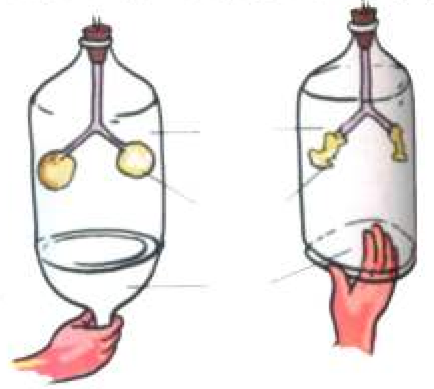

চিত্র: ৯.৭ নিশ্বাস প্রশ্বাস দর্শানোর নমুনা

৯.৪ আমরা নিশ্বাসে কী ছেড়ে থাকি?

তোমাদের জন্যে কাজ: ৯.৬

একটা পরিষ্কার পরীক্ষানালী কিংবা কাচ, প্লাস্টিকের বোতল নাও। তার ছিপিতে একটা ফুটো করো এবং তাকে নালী বোতলের খোলা মুখে লাগাও। সদ্য প্রস্তুত চুনজল পরীক্ষানালীতে ঢালো। একটা প্লাস্টিক নালী সেই ফুটো দিয়ে এমন ভাবে ঢোকাও যেন সেটা চুনের জলের মধ্যে ডুবে যাবে। এমন প্লাসিটেক নালীটিকে ধীরে ধীরে ফোকো। চুনজলের কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছ কি?

তোমরা জানো যে আমরা যে বায়ু প্রশ্বাসে নিই ও নিশ্বাসে ছাড়ি তার মধ্যে বিভিন্ন গ্যাস মিশে থাকে। তবে আমাদের নিশ্বাসে কী থাকে? খালি অঙ্গারকাম্ল না অঙ্গারকাম্লর সঙ্গে অন্য গ্যাস? তুমি যদি একটা আয়নার ওপর তোমার নিশ্বাস ফেলো, দেখবে জলকণার একটা আস্তরণ এর ওপর পড়েছে। এই জলবিন্দু কোথা থেকে এল?

চিত্র ৯.৮ নিশ্বাস বায়ুর প্রভাব।

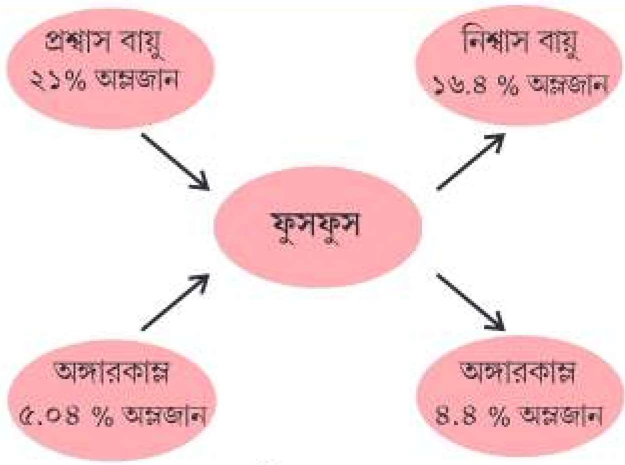

চিত্র ৯.৯

প্রশ্বাস ও নিশ্বাস বায়ুতে যথাক্রমে অম্লজান ও অঙ্গারকাম্লের পরিমাণ

৯.৫ প্রাণীদের শ্বসন:

হাতি, সিংহ, ছাগল, গোরু, ভেড়া, টিকটিকি, সাপ ও পাখিদের মানুষের মতন ফুসফুস আছে। তারা মানুষের মতন শ্বাসক্রিয়া করে। তবে অন্য প্রাণীরা কীভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেয়? তাদের কি মানুষের মতন ফুসফুস আছে? এসো অনুধ্যান করব।

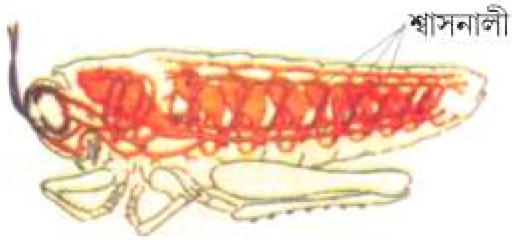

চিত্র ৯.১০: আরশোলার শ্বাসযন্ত্র

আরশোলা: আরশোলার শরীরে ছোট ছোট রন্ধ্র থাকে ইহাকে স্পাইরাকল্((ম্বস্থত্ব৺ত্র) বা শ্বাসরন্ধ্র বলা হয়। অন্য কীটপতঙ্গদেরও সেই রকম শ্বাসরন্ধ্র আছে। বায়ু চলাচলের জন্যে তাদের অনেকগুলি শ্বাসনালী আছে। বায়ুশ্বাসনালী দিয়ে শ্বাসরন্ধ্রে গিয়ে থাকে। সেখানে তার শরীর কোষিকাগুলির দ্বারা বিসরিত হয়। সেরকম শরীরের কোষিকাগুলির থেকে শ্বাসক্রিয়ার পর বায়ু নির্গত হয়ে শ্বাসরন্ধ্র দ্বারা বেরিয়ে আসে।

কেঁচো: কেঁচোর চামড়া জলজলে এবং লালাযুক্ত এর ভেজা চামড়ার ভেতর দিয়ে অঙ্গারকাম্ল ও অম্লজান সহজে বিনিময় হয়ে থাকে।

ব্যাঙ: মানুষের মতো ব্যাঙেরও দুটো ফুস্‌ফুস্ আছে। তাছাড়া ব্যাঙ তার ভেজা ও মসৃণ চর্ম সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া করে থাকে।

৯.৬: জল জীবের শ্বসন:

আমরা জলের মধ্যে ডুবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারব কি? অনেক জীব আছে যাদের জলই ঘর। তবে তারা কীভাবে নিশ্বাস নেয়? ও শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

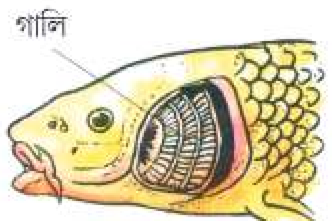

চিত্র: ৯.১০ মাছের শ্বাস অংশ

মাছ জলে থাকে। জলে থাকা দ্রবীভূত অম্লজানকে মাছ কানকো দ্বারা ব্যবহার করে। ধমনী দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত গালিতে এসে থাকে তাই সেখানে অম্লজান ও অঙ্গারকাম্লজানের আদান প্রদান হয়। তুমি এখন বলতে পারবে কি মাছকে জল থেকে নিয়ে এসে ডাঙায় রাখলে, সে কেন অল্প সময়ের মধ্যে মরে যায়?

৯.৭ উদ্ভিদের শ্বসন

অন্য জীবদের মতন উদ্ভিদেও শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তারা বায়ুর থেকে অম্লজান নিয়ে থাকে এবং অঙ্গারকাম্ল বায়ু ছেড়ে থাকে। উদ্ভিদের কোষে গ্লুকোজ বিখণ্ডিত হয়ে অঙ্গারকাম্ল ও জলে পরিণত হয়ে থাকে। উদ্ভিদের প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে আবশ্যকতা অনুযায়ী অম্লজান গ্রহণ ও অঙ্গারকাম্ল নির্গত করে থাকে।

তাছাড়া উদ্ভিদের পাতায় সূক্ষ্মকণা থাকে? যাকে স্তোম্ বলা হয়। তুমি যদি একটা পিটুনিয়া (ঞ্চত্রঠঔঙ্কথ) পাতাকে আতসকাচে দেখবে তবে স্তোম্গুলি সহজেই দেখতে পারবে। অম্লজান ও অঙ্গারকাম্লের বিনিময় স্তোমের দ্বারা হয়ে থাকে।

তোমাদের জন্যে কাজ:

উদ্ভিদের শ্বসন পরীক্ষণ:

৯.১১ চিত্র অনুসারে একটা কোনিকাল ফ্লাস্ক ও ১০ গ্রাম গজামুগ কিংবা ফুলের কুঁড়ি নাও। একটা ছোট পরীক্ষানালীতে কস্টিক পটাস নিয়ে সুতোয় বেঁধে ফ্লাস্কের ভেতর ঝোলাও। একটা বক্রনল নাও তার একটা মাথা কোনিকাল ফ্লাস্কের ভেতরে ঢোকাও, অন্য অগ্রভাগটিকে একটা বিকারে রঙিন জল রেখে তার ভেতরে ডোবাও। সমস্ত অংশ এখন বায়ুরুদ্ধ মুক্ত হওয়া দরকার।

এরকম আর এক পরীক্ষায় গজামুগ নিও না। ফ্লাস্ক খালি রাখো। ইহাকে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা বলা হবে।

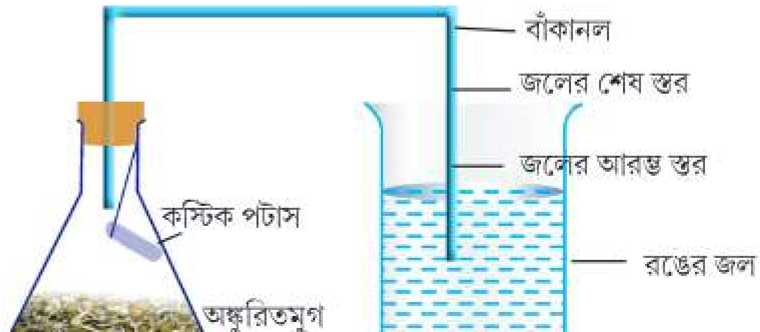

চিত্র ৯.১২ উদ্ভিদের শ্বসনের পরীক্ষণ

দেখবে, যার মধ্যে গজামুগ আছে, তার বক্রনালীতে রঙিন জলের স্তর বাড়ছে। জল রঙিন হয়ে থাকায় তুমি সহজেই জলের স্তর বেড়ে যাওয়া বুঝতে পারবে, যেখানে গজামুগ নেই, সেখানে কোনও পরিবর্তন হবে না।

তুমি জানো শ্বসনে অম্লজান ব্যবহার হয় এবং অঙ্গারকাম্ল উৎপন্ন হয়। সেই অঙ্গারকাম্ল কস্টিক পটাস দ্বারা শোষিত হলে ফ্লাস্কের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করে তাকে ভরণ করার জন্যে বক্রনালীতে বক্রনালীর রঙিন জলের স্তর বৃদ্ধি হয়।

উদ্ভিদের অন্য কোষেদের মতন, মূল কোষেদের শক্তির জন্যে অম্লজানের আবশ্যকতা আছে। মূল মৃত্তিকাস্থ বায়ুস্থলীর থেকে (air space) বায়ুগ্রহণ করে, তাকে শ্বসন ক্রিয়ায় ব্যবহার করে। এখন তোমরা বলতে পারবে কি আমরা যদি একটা টব-এ বাড়তে থাকা উদ্ভিদকে অধিক জল দিই, তবে তার কী পরিবর্তন দেখবে?

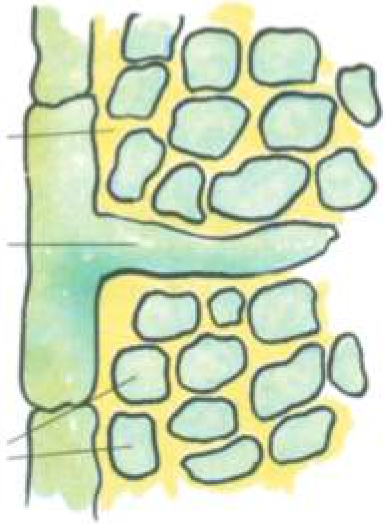

চিত্র ৯.১৩ মূল মৃত্তিকার থেকে বায়ুসংগ্রহ

কী শিখলে:

- জীবের জীবনের জন্যে শ্বাসক্রিয়া অপরিহার্য। এর দ্বারা খাদ্যে থাকা সঞ্চিত শক্তিকে জীব ব্যবহার করে থাকে।
- আমরা প্রশ্বাসে নেওয়া অম্লজান দ্বারা গ্লুকোজ সরলীকৃত হয়ে অঙ্গারকাম্ল ও জলে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্যে শক্তি জাত হয়ে থাকে।
- প্রত্যেক জীবের কোষে গ্লুকোজ বিঘটন ঘটে থাকে (কোষীয় শ্বসন)।
- অম্লজান ব্যবহারে যদি খাদ্যের বিঘটন হয় তবে তাকে বায়ু শ্বসন বলা হয়। যদি অম্লজানে অনুপস্থিতিতে এই শ্বসন হয় থাকে, তবে তাকে অবায়ু শ্বসন বলা হয়।
- কঠিন ব্যায়াম করার সময়ে আমাদের মাংসপেশি অম্লজান জোগান কমে গেলে খাদ্যের বিঘটন অবায়ু শ্বসন দ্বারা হয়ে থাকে।
- নিশ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে শ্বসনের অংশবিশেষ। এর দ্বারা জীব অম্লজান গ্রহণ করে এবং অঙ্গারকাম্ল যুক্ত বায়ু ত্যাগ করে। জীবদের শ্বসন তন্ত্র দ্বারা অঙ্গারকাম্ল ও অম্লজান যথাক্রমে নির্গমিন ও গ্রহণ করে।
- প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে ফুসফুস ফুলে যায়, এবং নিশ্বাস ছাড়ার সময়ে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।
- অধিক শারীরিক কার্য করলে শ্বাসক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।
- গোরু, মোষ, কুকুর এবং বেড়ালের মতো প্রাণীদের শ্বাসতন্ত্র ও শ্বাসক্রিয়া মানুষের মতন।
- ভেজা চামড়ার সাহায্যে কেঁচো শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। মাছের কানকোর সাহায্যে ও কীটপতঙ্গের শ্বাসরন্ধ্র দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।
- উদ্ভিদদের শ্বাসতন্ত্র থাকে না। কিন্তু সমস্ত কোষ দ্বারা শ্বসনকার্য সাধিত হয়ে থাকে। মৃত্তিকাস্থ বায়ুকে উদ্ভিদের শিকল ব্যবহার করে থাকে। পাতায় খুব সূক্ষ্ম রন্ধ্র থাকে। তাকে স্তোম্ বলা হয়। উদ্ভিদ কোষে গ্লুকোজের বিঘটন অন্য জীবদের মতন হয়ে থাকে।

অভ্যাস

১. প্রতিযোগিতার পর খেলোয়াড়রা কেন দ্রুত ও দীর্ঘশ্বাস নিয়ে থাকে?

২. বায়ু ও অবায়ু শ্বসনের মধ্যে থাকা সমানতা ও অসমনতাগুলি লেখো।

৩. যখন ধূলিকণা পূর্ণ বায়ু প্রশ্বাসে নিই, আমাদের হাঁচি কেন হয়?

৪. তিনটি পরীক্ষানালী নাও। তার তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত জল ভর্তি করো ও ক, খ, গ ভাবে চিহ্নিত করো। 'ক' পরীক্ষানালীতে একটা জ্যান্ত শামুক রাখো, 'খ'-তে একটা জলজ উদ্ভিদ রাখো। 'গ'-তে একটা জ্যান্ত শামুক ও জলজ উদ্ভিদ উভয় রাখো। কোন পরীক্ষানালীতে অঙ্গরকাম্লর পরিমাণ অধিক হবে?

৫। ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(ক) আরশোলার শরীরে বায়ুচলাচল কাব দ্বারা হয়?
(i) ফুসফুস (ii) কানকো (iii) শ্বাসরন্ধ্র (iv) চর্ম

(খ) কঠিন পরিশ্রম করলে মাংসপেশিতে কোনটির মাত্রা বেড়ে যায়?
(i) লক্‌টিক অম্ল (ii) অম্লজান (iii) গ্লুকোজ (iv) জল

(গ) একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তি বিশ্রাম নেওয়ার সময়ে মিনিট প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের হার কতবার হয়?
(i) ৯-১২ (ii) ১৫-১৮ (iii) ২১-২৪ (iv) ৩০-৩৩

(ঘ) নিশ্বাসের সময় পাঁজরার হাড় কীভাবে ফোলে?
(i) বাইরের দিকে (ii) তলার দিকে (iii) ওপর দিকে ((iv) কোনো দিকে নয়।

৬. 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দ বেছে মেলাও?

'ক'	'খ'
ইষ্ট	কেঁচো
মধ্যচ্ছদা	কানকো
চর্ম	সুরাসার
পাতা	বক্ষগহ্বর
মাছ	ফুসফুস ও চর্ম
ব্যাঙ	শ্বাসনালী স্তোম্

৭. উক্তিটি ঠিক থাকলে ' ✓ ' ভুল থাকলে 'X' দাও।

(ক) কঠিন পরিশ্রমের সময়ে একজনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের হার কমে যায়।
(খ) ব্যাঙ ফুসফুস ও চর্ম উভয়ের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া করে থাকে।
(গ) উদ্ভিদের শেকড়ে স্তোম্ থাকে।
(ঘ) শ্বাসনের জন্যে মাছের ফুসফুস আছে।
(ঙ) প্রশ্বাসের সময় বক্ষগহ্বর ফুলে যায়।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

একটা ছোট মোমবাতি মার্বেল খণ্ডের ওপরে জ্বালো। একটা কাচের গ্লাস ঢেকে দাও। একটা ছোট ব্যাঙ তার ভেতরে রাখো। কী হচ্ছে দেখো।

●●●

দশম অধ্যায়

উদ্ভিদের বংশ বিস্তার

তোমরা দেখে থাকবে, ধানের বীজ বুনলে ধানগাছ ওঠে। একটা আমগাছের থেকে আর একটা আমগাছ সৃষ্টি হতে পারে। সেরকম আমাদের চারদিকে যত পশুপাখি আছে বা উদ্ভিদ আছে তারা তাদের মতন একটি জীবন সৃষ্টি করে থাকে। ইহাকে প্রজনন বলা হয়। এর দ্বারা সে জাতের উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশবিস্তার হয়। উদ্ভিদরা সাধারণত তিনটি উপায়ে হয়। যথা— অঙ্গীয়, অলিঙ্গী ও লিঙ্গীয় জনন দ্বারা বংশ বিস্তার করে থাকে।

১০.১ বংশবিস্তার প্রক্রিয়া

তোমাদের জন্য কাজ:

তোমরা তোমাদের বাগানে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষলতা দেখে থাকবে। সেগুলি নাম লেখো। তাদের বিভিন্ন অংশগুলির কার্য লেখো। সেগুলি বংশবিস্তারে সাহায্য করে কি?

সারণী ১০.১ উদ্ভিদ ও তাদের বিভিন্ন অংশ ও কার্য

উদ্ভিদের নাম	কাণ্ড ও তার কার্য	পাতা ও তার কার্য	শেকড় ও তার কার্য	ফুল ও তার কার্য	বংশবিস্তারের অঙ্গ
উদাহরণ আদা	মাটির তলায় থাকে। ওপরে বেড়ে পাতা বেরিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ বংশ বিস্তার করে।	কাণ্ডের থেকে বেরোয় ও আলোক বিশ্লেষণ করে	সাদা	মাটির তলায় জল ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ শোষণ	কাণ্ড

অধিকাংশ উদ্ভিদের শেকড়, কাণ্ড ও পাতা থাকা লক্ষ করে থাকবে। সেগুলি উদ্ভিদের একটা একটা অঙ্গ। এই অঙ্গগুলির দ্বারা আর একটা উদ্ভিদ সৃষ্টি হলে তাকে অঙ্গীয় জনন বলব। অনেক উদ্ভিদ কিছুদিন বাড়ার পর তাতে ফুল ধরে। উদাহরণস্বরূপ ধানগাছটিকে দেখো। বর্ষাকালে ধান রোপণ করা হয়। কিছুদিন বাড়ার পর আশ্বিন মাসে ধানে ফুল ধরে। তারপর ধানগাছ থেকে বীজ বের হয়। পৌষ মাসের সময় ধান পাকলে আমরা ধানগাছ কেটে নিয়ে ধান সংগ্রহ করি। ওই ধান হল আমাদের মুখ্য খাদ্য।

তোমরা এখন বলো ফুলের প্রধান কাজ কী? সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল হচ্ছে প্রজননের অঙ্গ।

এই ফুল দ্বারা উদ্ভিদের লিঙ্গীয় জনন হয়। ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকতে পারে। কিংবা পুংকেশর অথবা গর্ভকেশর থাকতে পারে, কুমড়ো ফুলের মতো।

তোমাদের জন্যে কাজ ১০.২ :

নিম্নলিখিত ফুলগুলিকে সংগ্রহ করো এবং তার পুংকেশর ও গর্ভকেশর বের করে দেখাও।

জবা, গোলাপ, কলা, বেগুন, সরষে ও কুমড়ো ফুল।

তোমরা বর্ষাকালে, জুতো ব্যবহার না করে রেখে দিলে সেগুলিতে ছাতা ধরে যাওয়া দেখে থাকবে। সেরকম কতক উদ্ভিদ আছে যার অঙ্গীয় ও লিঙ্গীয় অংশ ছাড়া অন্য কতক বিশেষ উপায়ে বংশ বিস্তার করে থাকে। তা হল অলিঙ্গীয় জনন। এখানে রেণুর মতো কতক বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে বংশ বিস্তার হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ ১০.৩ :

তোমার জেনে থাকা ১০টি বিভিন্ন গাছলতার নাম তোমার খাতায় লেখো। তাদের কোন অংশের থেকে নতুন গাছ হয় লেখো।

১০.২ অঙ্গীয় জনন : উদ্ভিদের মুল, কাণ্ড ও পাতার মতো অঙ্গীয় অংশ থেকে এক নতুন উদ্ভিদ জাত হলে তাকে অঙ্গীয় জনন বলা হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ :

একটা চাঁপা ও কাগজ ফুলের গাছের ডাল কাটো। সেই কাটা অংশকে নিয়ে মাটিতে পোঁতো। আবশ্যক মতো জল দাও। লক্ষ করো সেই গাছের থেকে শেকড় বেরোতে কত দিন লাগছে। সেরকম কতদিনে নতুন পাতা বেরোচ্ছে লক্ষ করো।

তোমরা স্কুলের বাগানে মানিপ্ল্যান্টের গিঁটের কাছ থেকে একটা অংশ নিয়ে লাগাও। সেখান থেকে নতুন গাছ কতদিনে বাড়ছে নির্ধারণ করো।

তোমাদের জন্যে কাজ ১০.৫ :

বাজার থেকে পুরনো আলু এনে ঘরে কিছুদিনের জন্যে রেখে দিলে তার থেকে অঙ্কুর বেরোনো তোমরা দেখে থাকবে। একটা আলুকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলে, সেখানে চোখ থাকা তুমি দেখতে পাবে। সেই চোখের কাছ থেকে কেটে আলু খণ্ডকে মাটিতে পুঁতে আবশ্যক পরিমাণ জল দিলে নতুন গাছ বেরোনোর জন্যে কতদিন লাগছে তোমার খাতায় লেখো। একটুকরো পেঁয়াজ এনে বালিতে পোঁতো। জল দাও। কতদিনে শেকড় বেরোচ্ছে ও কতদিনে সবুজ পাতা বেরোচ্ছে লক্ষ করো। খাতায় লেখো এ দুটি হল রূপান্তরিত কাণ্ড। সেরকম আর কোন কাণ্ড থেকে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে যদি জেনে থাকো তবে লেখো। কীভাবে সেই উদ্ভিদটি লাগানো হয়, দু-লাইনে লেখো।

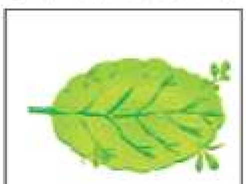

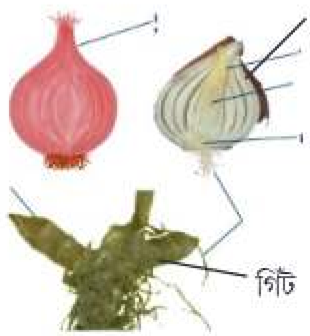

চিত্র ১০.১ অঙ্গীয় প্রজনন (আলু, পেঁয়াজ, অমরীপুই, মানি প্লেন, চাঁপা, ডাল চিত্র)

অমরীপুই গাছের মুকুল তার অগ্রভাগে থাকে। উদ্ভিদটির পাতা যদি মাটিতে পড়ে, তবে প্রত্যেক মুকুল থেকে নতুন উদ্ভিদ বড় হয়। এখানে পাতা অঙ্গীয় জননে সাহায্য করল।

কতক উদ্ভিদের মূল থেকে নতুন একটি গাছ বেরিয়ে থাকে। উদাহরণ হল রাঙা আলু ও ডালিয়া ইত্যাদি।

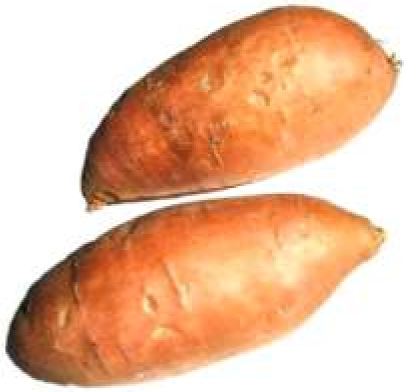

চিত্র ১০.২ রাঙা আলুর

এ তো গেল সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গীয় জননের সাহায্যে বংশ বিস্তার। অনেক অপুষ্পক উদ্ভিদ আছে যাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। আমরা তাদের দেখার জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করি। অনেক কবক ও শৈবাল এই শ্রেণীর। তাদের কাণ্ড, পাতা বা মূল থাকে না। কিন্তু তাদের সাধারণত অঙ্গীয় জননের সাহায্যে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। সেগুলির মধ্যে দুটি হল: কলিকন ও বিখণ্ডন।

কলিকন: ইস্ট একটা এককোষী কবক, উপযুক্ত পোষণ ও পরিবেশ পেলে এটা খুব কম সময়ের মধ্যে নিজের বংশ বিস্তার করে থাকে।

চিত্র ১০.৩ ইস্টের কলিকন (Yeast Budding)

তোমাদের জন্যে কাজ:

একটা বাসি পাউরুটি নাও। তার মধ্যে চার পাঁচ ফোঁটা জল দাও। একটা বেলজার ঢাকা দাও। বেলজার না থাকলে একটু অন্ধকার স্থানে একে রাখো। দু তিন দিন পরে সে পাউরুটিটিকে ভালো করে দেখো। তোমার খাতায় লেখো। অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকলে, সেখানে পাউরুটিটিকে দেখো, কী দেখলে নিজের খাতায় লেখো।

ইস্টকোষের নতুন কলিকা বেড়ে থাকা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখতে পারবে। তারা মাতৃকোষের থেকে আলাদা হয়ে গেলে, নতুন ছত্রাক সৃষ্টি করে থাকে।

বিখণ্ডন: তোমরা তোমাদের গ্রামের পুকুরের জলে সবুজ আস্তরণ দেখে থাকবে। এর কারণ হল শৈবাল জল ও উপযুক্ত শোষণ পেলে শৈবালরা দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং বিখণ্ডন দ্বারা বংশবিস্তার করে। প্রত্যেক বিখণ্ডিত অংশে নতুন শৈবাল বাড়ে। খুব কম সময়ে সারা পুকুরটি শৈবাল আস্তরণে ভরপুর হয়ে যায়।

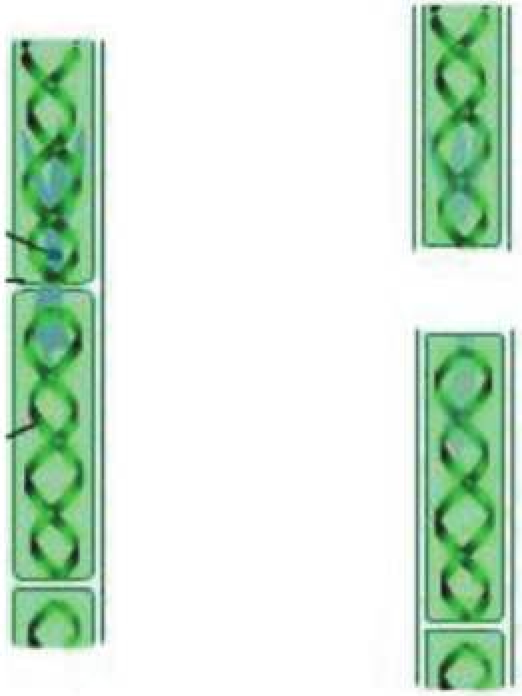

চিত্র ১০.৪ স্বাইরোগা এরা (এক শৈবালের) বিখণ্ডন

১০.৩ অযৌন জনন

এই প্রক্রিয়ায় প্রজনন গুণ থাকা এক প্রকার বিশেষ একক সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাকে রেণু বলা হয়। রেণুগুলি চলনক্ষম হয়ে থাকলে সেগুলিকে চলরেণু (Zoospore) বলে। অনেক ছত্রাক বা শৈবাল চলরেণু দ্বারা বংশবিস্তার করে থাকে।

চিত্র ১০.৫ চলরেণু

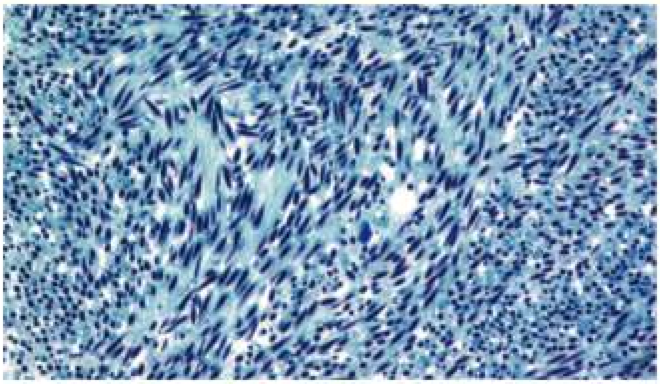

চিত্র ১০.১ বাহ্যরেণু

১০.১ যৌন জনন (লিঙ্গীয় জনন)

যৌন জননের একককে যুগ্মজ বলা হয়। পুং যুগ্মক ও স্ত্রী যুগ্মকের মিলনে যুগ্মজ জাত হয়। যুগ্মকগুলির মিলন হল সমায়ন শৈবাল, ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ মস্, ফার্ন ইত্যাদি অপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণত অঙ্গীয় বা অলিঙ্গীয়জনন বহুবার হওয়া দেখা যায় কিন্তু অযৌন জনন জীবনকালে মাত্র কয়েকবার হওয়া দেখা যায়।

সপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণত অঙ্গীয় ও যৌন জনন দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা আগের শ্রেণীতে ফুলের বিষয়ে পড়েছ। উদ্ভিদের প্রজনন অংশ ফুলে থাকে, পুংকেশর ও গর্ভকেশর চক্র যথাক্রমে উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ।

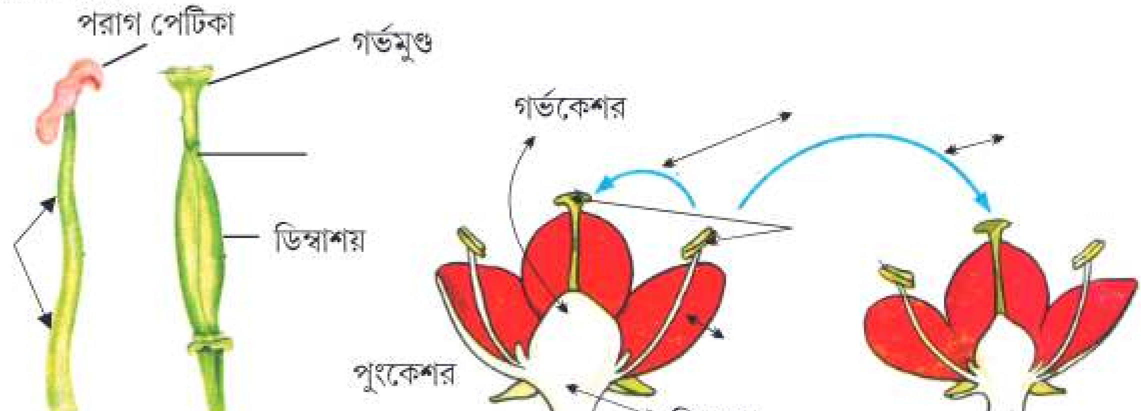

চিত্র ১০.৭ পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্র

তোমাদের জন্যে কাজ ১০.৭

একটা সরষে জবা কুমড়োর ফুল নাও তার জনন অঙ্গকে আলাদা করো পুংকেশর ও গর্ভকেশরকে ভালো করে দেখো ও তার বিভিন্ন অংশের নাম লেখো।

কুমড়ো ফুলের খালি পুংকেশর চক্র বা গর্ভকেশর চক্র দেখো। দু'রকমের ফুল একটা কুমড়ো গাছে থাকার দরুন একে একবাসী উদ্ভিদ (Monocious) বলা হয়। সরষে ও জবা ফুলে উভয় পুংকেশর ও গর্ভকেশর একটা ফুলে থাকে তাকে দ্বিলিঙ্গী (Bisexual) বলা হয়। কিন্তু একটা খেজুর ও তালের মতো গাছে কেবল ছেলে ফুল বা মেয়ে ফুল হওয়া দেখে থাকবে। এগুলি দ্বিবাসী (Dioccious) উদ্ভিদ।

পরাগদানী ও পুংদণ্ডকে নিয়ে, পুংকেশর গঠিত। গর্ভকেশর, গর্ভমুণ্ড (Stisma) গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় (Overy) নিয়ে গঠিত। ডিম্বাশয়ে ডিম্বক থাকে। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রী যুগ্মক বা ডিম সৃষ্টি হয়।

১০.৫ পরাগায়ন বা পরাগসংযোগ:

ফুলে পরাগরানী হতে পরাগরেণু এক জানের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর হওয়াকে পরাগায়ন পরাগসংযোগ বলা হয়। পরাগরেণুর ওপরের আবরণ শক্ত হওয়ায় স্থানান্তের সময় এর কিছু ক্ষতি হয় না পরাগায়ন সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

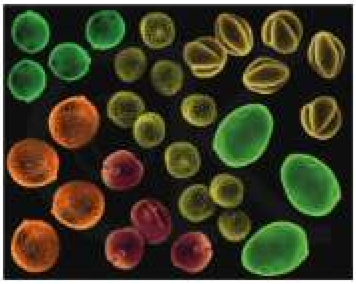

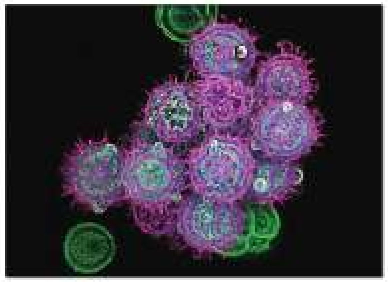

চিত্র ১০.৮ পরাগরেনু (Pollen Grain)

পরাগায়ন দুপ্রকার। যথা: স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন । একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন বলা হয়। স্ব-পরাগায়নে একটা ফুল বা সেই গাছের অন্য এক ফুলে জড়িত থাকায়, এখানে পরাগরেণু কম নষ্ট হয়ে থাকে। আবার এ প্রক্রিয়ায় সমায়ন ও নতুন অপত্য জাতের সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ: চিনা বাদাম, ছোলা ও মটর ফুল।

একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে, তাকে পর-পরাগায়ন বলে। পর-পরাগায়ন দ্বারা সুস্থ সবল আপত্য জাত হয়ে থাকে। এর দ্বারা উন্নত সংজীবতাপূর্ণ, বীজ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ খেজুর ফুল।

পরাগবেণুর চলন ক্ষমতা না থাকায় সেগুলি বিভিন্ন মাধ্যমে পরাগরানীর থেকে কলিকা শীর্ষ বা গর্ভমুণ্ডে বাহিত হয়ে থাকে। তুমি দেখে থাকবে মৌমাছি মধু শোষণের জন্যে একটা ফুল থেকে অন্য ফুলে যায়। ফলে তাদের শরীরে পরাগরেণু লেগে পরাগায়ন হয়ে থাকে। সে রকম বায়ু, জল, কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুদের সাহায্যে পরাগায়ন হয়ে থাকে। জীবজন্তুদের সাহায্যে পরাগয়ন হোয়ে থাকে

মৌমাছি

চিত্র ১০.৯ বিভিন্নপ্রকার পরাগ সংগম (১)

চিত্র ১০.৯ বিভিন্ন প্রকার পরাগ সংগম (২)

তোমাদের জন্যে কাজ: ১০.৮

১. নিম্নলিখিত উদ্ভিদদের পরাগায়ন কোন মাধ্যমে হয়? ধান, মক্কা, সরষে, গাঁদা ফুল।

২. একই রকমের মাধ্যম থেকে পরাগন করা ফুল ও উদ্ভিদদের মধ্যে কী সমানতা আছে তার তালিকা প্রস্তুত করো।

১০.৬ নিষিক্তিকরণ

সপুষ্পক উদ্ভিদের স্ত্রীকেশর চক্রের ডিম্বকের ভ্রূণাশয় থাকে। ভ্রূণাশয়ে একটা ডিম্বকোষ, দুটি সহায়ক কোষ, তিনটি পাতকী কোষ এবং দুটি মেরুন্যস্থিকোষ সংযুক্ত থাকে।

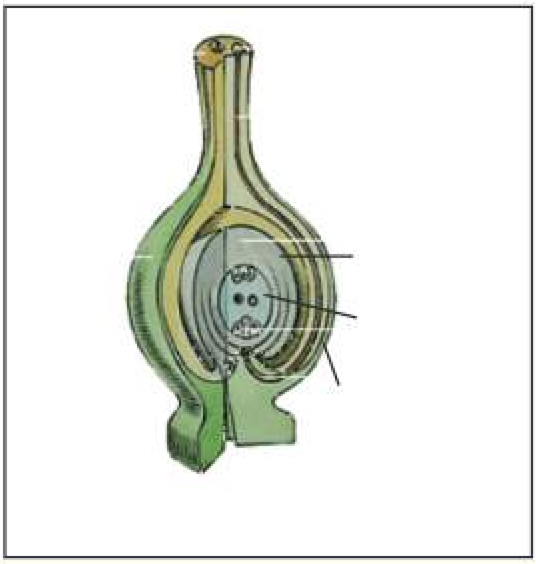

পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পড়ার পর দুটি কোষে বিভক্ত হয়। তা হল পরাগনালী ও জনন কোষ। পরাগ নালীর থেকে নালিকা বেরিয়ে শলাকার মধ্য দিয়ে ডিম্বকের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সময় জনন কোষ দুটি পুংগ্যামেটে বিভক্ত হয় সেখান থেকে একটা ডিম্বকোষের সঙ্গে সমায়ন করে বা নিষিক্ত করণ হয়। পুংগ্যামেট ও ডিম্বাণুর মিলনকে নিষিক্ত করণ বা দ্বিসমায়ন বলা হয়।

ফলে যুগ্মক সৃষ্টি হয়। যুগ্মক বাড়লে ভ্রূণ হয়ে ও ভ্রূণের থেকে নতুন উদ্ভিদ বাড়তে পারে।

অন্য এক পুংযুগ্মক দুই মেরুনাস্টি কোষের সঙ্গে মিলন হয়ে ভ্রূণপোষ (ক্ক্রন্থব্রস্প্মখন্দ) হয়। এই ভ্রূণকোষ যুগ্মস্থকে বাড়িয়ে ভ্রূণ হওয়ার জন্যে সাহায্য করে থাকে। সপুষ্পক উদ্ভিদের এই সমায়ন প্রক্রিয়াকে দ্বিসমায়ন ও সংযোজন বলা হয়। দ্বিনিষিক্ত করণের পর ডিম্বকটি বিচিতে পরিণত হয় ও ডিম্বাশয়টি বেড়ে ফলজাত হয়।

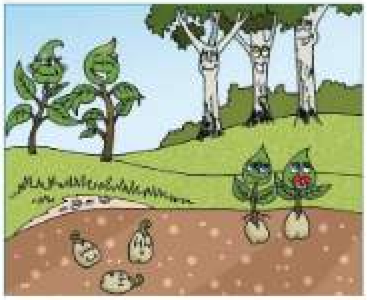

কী শিখলে ?

- জীব মাত্রেই বংশবিস্তার করে থাকে।
- উদ্ভিদরা অঙ্গীয়, অলিঙ্গী, লিঙ্গীয় জনন দ্বারা বংশবিস্তার করে থাকে।
- অপুষ্পক উদ্ভিদ বিখণ্ডন ও কলিকন দ্বারা অঙ্গীয় জনন করার সময় সপুষ্পক উদ্ভিদরা কাণ্ড, মূল ও পাতার সাহায্যে অঙ্গীয়জনন করে থাকে।
- অপুষ্পক উদ্ভিদের অলিঙ্গীজনন চলরেণু ও বাহ্যবেণনু দ্বারা হয়ে থাকে।
- সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ হল ফুল।
- এই ফুল একলিঙ্গী ও উভয়লিঙ্গী হতে পারে। তাছাড়া একবাসী ও দ্বিবাসী উদ্ভিদ আছে।
- পরাগরেণু পরাগ পটিকায় সৃষ্টি হয় এবং ডিম্বক ডিম্বাকোষের মধ্যে থাকে।
- পরাগয়ন দ্বারা পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর হয়ে থাকে।
- পরাগায়ন দুপ্রকার—স্বপরাগায়ন ও পরপরাগায়ন। স্বপরাগায়নে একটা উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকার সময় পরপরাগায়ন সেরকম জাতের দুটো উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট।
- বায়ু, জল, কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর দ্বারা পরাগায়ন হয়ে থাকে।
- পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেট (যুগ্মক) মিলন থেকে নিষিক্তকরণ হয়ে থাকে।
- সপুষ্পক উদ্ভিদের দ্বিসমায়ন ও ত্রিসংযোজন হয়ে থাকে।
- নিষিক্তকরণ ডিম্বকে যুগ্মক বলে। যুগ্মক থেকে ভ্রূণ বেড়ে নতুন সপুষ্পক উদ্ভিদ হয়।

অভ্যাস

১. বন্ধনীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(নিষিক্তকরণ, পরাগায়ন, স্বপরাগায়ন, অঙ্গীয়, মেরুন্যাস্থি, উভয়লিঙ্গী)

(ক) উদ্ভিদ মূল বা কাণ্ডের থেকে নতুন উদ্ভিদ একটা জাত হলে তাকে — জনন বলা হয়।

(খ) একটা ফুলের পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকলে তাকে — ফুল বলা হয়।

(গ) পরাগরানীর থেকে গর্ভমুণ্ডকে পরাগরেণুর স্থানান্তরকে — বলে।

(ঘ) পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেটের মিলন দ্বারা — প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

(ঙ) ভ্রূণকোষ ডিম্বকের — থেকে বৃদ্ধি পায়।

২. উদাহরণ সহিত বিভিন্ন প্রকার অঙ্গীয় জনন বর্ণনা করো।

৩. লিঙ্গীয় জনন বলতে কী বোঝায়?

৪. একটা সম্পূর্ণ ফুলের নামাঙ্কিত চিত্র করো।

৫. স্বপরাগায়ন ও পরপরাগায়ন বোঝাও।

৬. সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষিক্তকরণ কীভাবে হয়?

৭. 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দ মেলাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
চোখ	শৈবাল
বিখণ্ডন	হস্ত
ডিম্বক	পরাগরেণু
কলিকা	আলু
পুংযুগ্মক	বিজ, ভ্রূণ

৮. কোনটা ঠিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দর্শাও।

(ক) সপুষ্পক উদ্ভিদের জনন অঙ্গ ফুল।

(খ) পুংযুগ্মক ও স্ত্রীযুগ্মক মিলনকে পরাগায়ন বলে।

(গ) অমরী পুঁই শাকের প্রজনন অঙ্গ কাণ্ড।

(ঘ) চলরেণুর সাহায্যে কতক অপুষ্পক উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

(ঙ) শেকড়ের সাহায্যে রাঙাআলুর বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

৯। নিম্ন প্রদত্ত উদ্ভিদের বংশবিস্তার কীভাবে হয়?

উদ্ভিদ	**বংশবিস্তর**
ধান	
গম	
মুগ	
অড়হর	
আলু	
পেঁয়াজ	
রাঙাআলু	
কলা	
গোলাপ	

১০। অঙ্গীয় ও লিঙ্গীয় জনন উদ্ভিদটিকে কীভাবে সাহায্য করে থাকে।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

বাগান থেকে ধুতরা, জবাফুল, রজনীগন্ধা, সরষে ফুল এনে, তার বিভিন্ন অংশকে বের করে স্লাইডে দেখে সেগুলির নামাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন করো।

●●●

একাদশ অধ্যায়

গতি ও সময়

১১.১ গতি:

অনেক আগে পড়েছ যে একটা বস্তু গতি করার সময়, তার গতি সরলরৈখিক, বৃত্তীয়, দোলন, আবর্তী হতে পারে অথবা এদের মধ্যে একাধিক রকমের গতির সংমিশ্রণও হতে পারে।

নীচের মতো একটা সারণী তোমার খাতায় তৈরি করো এবং সেখানে দেওয়া প্রত্যেক বস্তুর গতি কোন ধরনের তা নির্দিষ্ট স্থানে লেখো।

সারণী ১১.১ গতিশীল বস্তুর উদাহরণ

গতিশীল বস্তুর নাম	গতির প্রকার সরলরৈখিক / বৃত্তীয় / আবর্ত / দোলন
একটা সোজা রাস্তায় মার্চপাস্ট করে যাওয়া সৈন্যদের সমূহ গতি।	
একটা সোজা রাস্তায় যাওয়া সাইকেলের চাকার গতি।	
একটা সোজা রাস্তায় যাওয়া সাইকেলের চালকের পকেটে থাকা কলমের গতি।	
সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি।	
দুটি খুঁটির মধ্যে টান করে বাঁধা সরু তারের ওপর চলতে থাকা পিঁপড়ের গতি।	
নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরা পৃথিবীর গতি।	
একটি মেয়ে দোলনায় দোলা অবস্থায় তার গতি।	
ঘড়ির সেকেন্ড কাঁটার গতি।	

প্রশ্ন ১: সারণীতে দেওয়া নির্দিষ্ট গতিশীল বস্তুদের মধ্যে কোন কোন বস্তুর গতি একাধিক প্রকার বস্তুর গতির সংমিশ্রণ।
তোমার উত্তর, তোমার সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করো। দরকার মনে করলে শিক্ষকের সাহায্য নাও।

১১.২ দ্রুত অথবা ধীর গতি

আমরা জানি, কিছু বস্তু অন্য কিছু বস্তুর তুলনায় দ্রুততর গতিতে গতি করে থাকে। যেমন সাধারণত মোটরগাড়ি গোরুর গাড়ির থেকে দ্রুততর গতিতে গতি করে থাকে। অন্য পক্ষে সেই একটা বস্তু বিভিন্ন সময়ে ধীর অথবা দ্রুতগতিতে গতি করে থাকে।

প্রশ্ন ২. একটা বড় মোটরগাড়ি সাধারণত কোন কোন অবস্থায় ধীরগতিতে গতি করে থাকে বলো।

প্রশ্ন ৩. তলায় দেওয়া গতিশীল বস্তুগুলিকে ধীর গতির থেকে দ্রুত গতি ক্রমে সাজিয়ে লেখো।
জেট, উড়োজাহাজ, শামুক, সাইকেল, ট্রেন, অন্তরীক্ষ মাইল, ট্রাক্টর, পিঁপড়ে।

তবে কোন বস্তুটি দ্রুতগতিতে ও কোন বস্তুটি ধীরগতিতে গতি করছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে নির্ধারণ করা যায় দেখব এসো।

তোমাদের জন্যে কাজ : ১১.১

নীচে দেওয়া চিত্র ১১.১-এ একদিকে যাওয়া কয়টি গতিশীল যানের একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের অবস্থিতি দেওয়া হয়েছে তাকে দেখো। এখন চিত্র ১১.২-কে অনুধ্যান করো। সেই চিত্রে সেই বস্তুদের অল্পক্ষণ পড়ে থাকা অবস্থিতি দেওয়া হয়েছে। যানগুলিকে চিহ্নিত করে কোন যান দ্রুততম গতিতে ও কোন যানটি ধীরতম গতিতে যাচ্ছে বলো।

চিত্র দুটিকে নিরীক্ষণ করো। তুমি দেখবে যে এক সময়ের অন্তরালে যে যানটি অধিক দূরত্ব অতিক্রম করছে, তা অপেক্ষাকৃত দ্রুততর গতিতে যাচ্ছে বলে আমরা বলে থাকি। এটা এক পরীক্ষা সিদ্ধ উপায়। তুমি তোমার ঘর থেকে সাইকেলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেলে, ঠিক সেই সময়ে তোমার ঘরের সামনে থেকে টাউন বাস একটা বেরোল। দশ মিনিট পর তুমি নিশ্চয়ই বাসের থেকে কম দূরত্ব অতিক্রম করে থাকবে। তাই বাসটি যে তোমার থেকে দ্রুততর গতিতে গতি করেছে এতে সন্দেহ নেই।

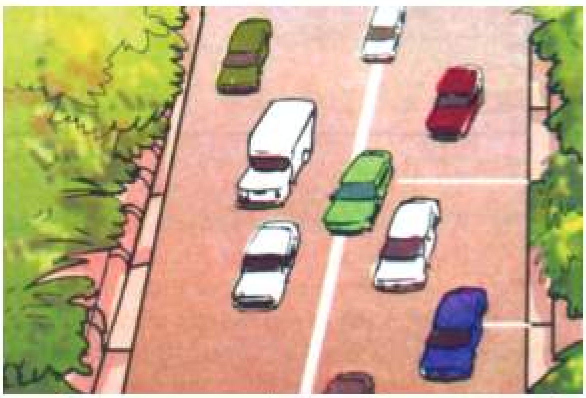

চিত্র ১১.১ রাস্তার একটা দিকে গতি করা যানবাহনের একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের চিত্র।

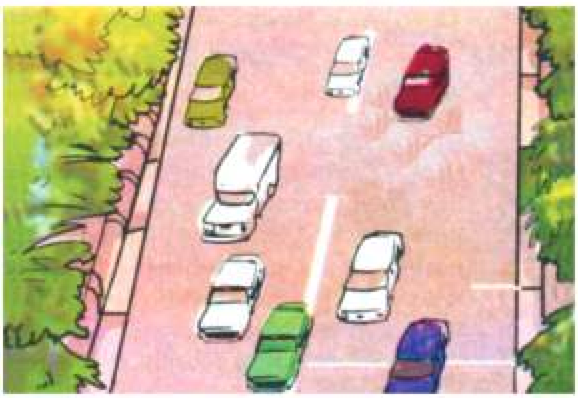

চিত্র ১১.২, চিত্র ১১.১-এ দর্শন হয়ে থাকা যানবাহনের অবস্থিতির কিছু সময় পরের দৃশ্যচিত্র।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ক্ষিপ্রগামী যানের বেগ অধিক। তোমরা টেলিভিশনের সোজা প্রসারণ হওয়া আন্তর্জাতিক খেলাধুলো প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে থাকবে। সেখানে যে প্রতিযোগী এই নির্দিষ্ট ১০০ মিটার দূরত্ব সব থেকে কম সময়ে অতিক্রম করে, তাকেই সব থেকে ক্ষিপ্রগামী বলে ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন ৪: টেলিভিশনে প্রসারিত হয়ে থাকা এবং তুমি দেখে থাকা কয়টি আন্তর্জাতিক খেলাধূলা প্রতিযোগিতার নাম বলো।

১১.২ বেগ:

ওপরে দেওয়া উদাহরণের সবথেকে ক্ষিপ্রগামী প্রতিযোগীর বেগ সব থেকে অধিক বলে বলা হয়। তুমি এবং তোমার বন্ধু দুটো আলাদা বাসে ভুবনেশ্বর থেকে পুরী গেলে। ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর দূরত্ব ৬০ কিমি। তোমার বাস এই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যে ধরো দেড় ঘণ্টা সময় নিল। অন্য পক্ষে তোমার বন্ধুর বাস পুরীতে পৌঁছনোর জন্যে ২ ঘণ্টা সময় নিল। অতএব কোন বাসটি অধিক ক্ষিপ্রগামী ? তুমি গিয়ে থাকা বাসটি অধিক ক্ষিপ্রগামী, অর্থাৎ তার বেগ অধিক।

মনে রাখ: একক সময়ে একটি বস্তু যত দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে সে বস্তুর বেগ বলা হয়। তবে দূরত্বের একক মিনিটে হলে ও সময়ের একক সেকেন্ডে হলে বেগের মিটার সেকেন্ড বলে।

$$\text{বেগ} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$ ও ইহার একক মিটার/ সেকেন্ড

প্রশ্ন ৫: উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্ততে তুমি গিয়ে থাকা বাসের বেগ কত ? তোমার বন্ধু গিয়ে থাকা বাসের বেগ কত ? এই বেগ গণনা করার সময় কোন্ একক ব্যবহার করলে ?

অলিম্পিক খেলায় ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগীদের বেগকে প্রকাশ করার জন্য সময়ের কোন্ একক ব্যবহার করা হয়, বলতে পারবে কি ? প্রশ্ন ৫-এর উত্তর হিসেবে তুমি নিশ্চয় নির্ণয় করে থাকবে যে তুমি গিয়ে থাকা বাসের বেগ ঘণ্টা প্রতি ৪০ কিলোমিটার। তুমি কোনোদিন বাসে বসে থাকলে লক্ষ করে থাকবে যে, বাসটি কোনোদিন সমান গতিতে গতি করে না। তবে তুমি গিয়ে থাকা বাসে গতি ঘণ্টা প্রতি ৪০ কিমি, এর অর্থ কী ? একটু ভেবে দেখো তো ? তাহলে তুমি জানতে পারবে যে এখানে বাসটির যে বেগ তুমি গণনা করলে, তা সত্যিকারের বাসের গড় বেগ। তাই আমরা জানলাম একটা বস্তুর

$$\text{গড় বেগ} = \frac{\text{গতি করে থাকা মোট দূরত্ব}}{\text{গতির জন্য নেওয়া মোট সময়}}$$

প্রশ্ন ৬: একটা স্থির বস্তুর বেগ সমীকরণ (১১.৩) ব্যবহার করে নির্ণয় করো।

এই পুস্তকে আলোচনার সময় আমরা সবসময় 'হারাহারি বেগ' পরিবর্তে বেগই ব্যবহার করব। হারাহারি বেগ ও বেগের বিষয় অধিক আলোচনা নবম শ্রেণীতে করা হবে।

ওপরের আলোচনার থেকে আমরা জানলাম যে,

- সাধারণত একটা বস্তু গতি করার সময় যদি তার বেগ পরিবর্তিত হয়, এমন গতিকে অসমগতি (নন ইউনিফর্ম মোশান বলা হয়।
- যদি কোনো ক্ষেত্রে এক সরলরেখায় গতি করতে থাকা একটা বস্তুর বেগ অপরিবর্তিত থাকে তবে তেমন গতিকে সমগতি (Uniform Motion) বলা হয়।

- একটা বস্তুর বেগ গণনা করার জন্যে বস্তুটি গতি করে থাকা মোট দূরত্ব এবং সেই গতির জন্যে বস্তুটি নিয়ে থাকা মোট সময় নির্ণয় করা দরকার।

এখান থেকে আমরা জানলাম যে বস্তুর গতি বিষয়ে সবিশেষ জানার জন্যে আমাদের সময় মাপন প্রণালী শিখতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা দূরত্ব কিভাবে মাপা হয় পড়েছি। এখন এসো সময় কিভাবে মাপা হয় পড়ব।

১১.৩ সময়ের মাপ:

ভেবে দেখো, তোমার কাছে যদি একটা ঘড়ি না থাকত এবং তোমাকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করত, 'এখন কটা বাজে?' তাহলে তুমি কি কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারতে? যখন ঘড়ি ছিল না, তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা দিনের নির্দিষ্ট সময় বা বেলাকে কিভাবে প্রকাশ করতেন জানো? তাদের দ্বারা সাধারণভাবে ব্যবহৃত কিছু উক্তি নীচে দেওয়া হল।

— রাদ চলে গেলে আমরা মধুপুর গ্রামে যাব।

— বোরা ফেরার বেলায় পুকুরে চান করলে শরীর খারাপ হবে।

— খুব ভোরে বেরিয়ে গেলে স্নানের সময়ে পুরী পৌঁছে যাব।

— বেলা থাকতে থাকতে হাট থেকে ফিরে আসবো।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১১.২

দিনের কোনো নির্দিষ্ট সময়কে প্রকাশ করার জন্যে, তোমাদের অঞ্চলে যদি কেউ কেউ এমন উক্তি ব্যবহার করে, তা লক্ষ করো ও তোমার বন্ধু তথা মা বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করো।

আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা প্রাকৃতিক ঘটনার নির্দিষ্ট অন্তরালে পুনরাবৃত্তিকে ব্যবহার করে, সময়-মাপন উপায় বের করেছিলেন। যথা একটা সূর্যোদয় থেকে তার পরবর্তী সূর্যোদয়কে একটা দিন বলে তারা বলা আরম্ভ করলেন।

প্রশ্ন ৭. কোন্ কোন্ ঘটনার পুনরাবৃত্তিকে ব্যবহার করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'মাস' ও 'বছর'-এর অবধি নির্ণয় করেছিলেন? তুমি তোমার নাড়ির স্পন্দন ব্যবহার করে সময় মানতে পারবে কি?

আমরা জানি যে একটা দিনের থেকে রাত অবধি সময় জানার জন্যে ঘড়ি ব্যবহার করা হয়। যেমন তোমার স্কুলে কার্য করার সময় অবধি সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত, কেবল ঘড়ি দেখে নির্দিষ্ট করা হয়।

পুরাকালে ব্যবহৃত কিছু সময় মাপক যন্ত্র ঘড়ির ছবি চিত্র ১১.৩-তে দেওয়া হল। এই যন্ত্র, ঘড়িগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হত। তুমি যদি কোনোদিন দিল্লি যাও তা হলে

চিত্র : দিল্লির জন্তর-মন্তরে থাকা সূর্য ঘড়ি

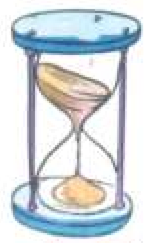

বালুকা ঘড়ি

জল ঘড়ি

চিত্র ১১.৩ : পূর্বকালে ব্যবহৃত কতক সময় মাপক যন্ত্র।

সেখানে জন্তর-মন্তরে থাকা সৌর ঘড়ি দেখতে পাবে। তা না হলে ভুবনেশ্বরে এসে সেখানে থাকা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্রে সৌর ঘড়ি তথা বালুকা ঘড়িও দেখতে পাবে।

প্রশ্ন ৮ : (ক) সৌরঘড়ি যন্ত্রচালিত নয় কিংবা সেখানে কোনো ঘণ্টা কাঁটা, মিনিট কাঁটা নেই। তার দ্বারা সময় জানার জন্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করা হয়?
(তোমার সাথী ও শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করো।)

(খ) বালুকা ঘড়ির উপর পাত্রে থাকা বালি তলায় নেমে আসার পর, সেই বালুকা ঘড়িকে পুনর্বার কিভাবে ব্যবহার করা হয়?

তুমি দেখে থাকা কিছু ঘড়ির ছবি ১১.৪-এ দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ১১.৪: কয়েকটি সাধারণ ঘড়ির ছবি।

একটা ঘড়ির কার্য করার প্রণালী এক জটিল ক্রিয়া, তবে সময় মাপার জন্যে প্রত্যেক ঘড়িতে বস্তুর দোলন গতি বা আবর্তী গতিই সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েছি যে সরল দোলকের গতি, দোলন গতির সব থেকে সাধারণ উদাহরণ।

তোমার জন্যে কাজ ১১.৩ :

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া চিত্র ১১.৫ (ক) মতো একটা সরল দোলক স্থাপন করো। ঘরের মধ্যে থাকা সব পাখা বন্ধ করার সাথে সাথে জানালা, কপাট বন্ধ করো। তা না হলে বাইরের হাওয়া দোলকের দোলনকে প্রভাবিত করবে। সরল দোলকের সুতোর দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিটার নাও। সুতোর থেকে ঝুলতে থাকা ছোট, ভারী (সাধারণ গোলাকার) বস্তুকে গোলক বা বব্ (Bob) বলা হয়। দোলকের মধ্যস্থিতিকে (স্থিতি ০) চিহ্নিত করার জন্যে শ্রেণীগৃহের মেঝেতে দাগ দাও।

চিত্র ১১.৫ (ক) ঝুলে থাকা এক সরল দোলক।

চিত্র ১১.৫ (খ) দোলন সময়ে সরল দোলকের বব-এর বিভিন্ন অবস্থিতি।

এখন দোলকের বব্‌কে (চিত্র ১১.৫ (খ) একটা পার্শ্বে (স্থিতি A) টেনে ছেড়ে দাও। তুমি দেখবে তা দোলন করে মধ্যস্থিতি 'O'-কে অতিক্রম করে অপরপার্শ্বে (স্থিতি খ) যাবে। তার পরে আবার দোলন করে স্থিতি 'A' -তে ফিরে আসবে। এভাবে বব্ নিরন্তর গতি করে চলবে। বব্ এই গতিকে দোলনগতি বলা হয়। বব্‌টি স্থিতি 'A'-এর থেকে স্থিতি 'B' -কে গিয়ে আবার স্থিতি 'A' তে ফিরে আসতে যত সময় নেয়, তা এই নির্দিষ্ট সরল দোলন সময় (Period of oscillation) বলা হয়।

প্রশ্ন ৯: ববটি মধ্যস্থিতি 'O'র থেকে স্থিতি 'A' তে গিয়ে, সেখানে স্থিতি 'B' তে ফিরে, তার পরে স্থিতি 'O' এ পৌঁছতে যত সময় নেয়, তা কি এক দোলন সময়?

দোলকের দোলন সময় মাপার জন্যে একটা বিরাম ঘড়ি (Stop Watch) দরকার। তবে বিরাম ঘড়ি না থাকলেও হাতঘড়ি ব্যবহার করে দোলন সময় মাপা যেতে পারবে। বব্‌টিকে একদিকে অল্প টেনে রাখো। সুতোটি যেন টান টান হয়ে থাকে সেদিকে যত্নশীল হও। তারপর বব্‌টিকে না ঠেলে কেবল আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও। দোলকটি ২০ বার দোলন করার জন্যে কত সময় নিল তা মাপ। তলায় দেওয়া সারণীটি তোমার খাতায় এঁকে সেখানে তোমার মাপাঙ্কটি লেখো। কিভাবে লিখবে তা দেখানো হয়েছে। তুমি খুব কমে তিনবার এভাবে পরীক্ষা করে মাপাঙ্ক নাও। তুমি লক্ষ্য করো যে বব্-এর বিস্তাপনে সামান্য পরিবর্তন হলেও দোলকের দোলন সময় বিশেষ কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না।

সারণী ১১.২ সরল দোলকের দোলন সময়

ক্রমিক নং	সুতোর দৈর্ঘ্য	২০ বার দোলনের জন্য সময়	দোলনের সময়
১	১০০ সেমি	৪৩ সে.	২.১৫ সে.
২			
৩			

সুতোর একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জন্যে সরল দোলকের দোলন সময় অপরিবর্তিত থাকায় সময় মাপনের জন্যে ঘড়ির দোলকের ব্যবহার করা হয়। আজকাল ডিজিটাল ঘড়িগুলোয় অণুর দোলন সময়কে ব্যবহার করে সময় মাপা হচ্ছে।

মনে রেখো: যে সরল দোলকের দোলন সময় ২ সেকেন্ড, তাকে সেকেন্ড দোলক বলা হয়, অর্থাৎ চিত্র ১১.৬ (খ)-তে যদি ববটি (A) এর থেকে (B) তে যাওয়াতে ১ সেকেন্ড নেয়, তাহলে তা সেকেন্ড দোলক।

সরল দোলকের জন্ম ঐতিহাস

সুতোর নিদিষ্ট দৈর্ঘ্যের জন্যে একটা সরল দোলকের দোলন সময় যে এক ধ্রুবাঙ্ক, এ সত্যের আবিষ্কারের পেছনে একটা ইতিহাস ভিত্তিক সুন্দর গল্প আছে। তুমি বৈজ্ঞানিক গালিলিও (A.D 1564-1642)র নামের সহিত পরিচিত থাকবে। কথিত আছে একবার গালিলিও একটা চার্চে প্রার্থনাসভায় বসেছিলেন। উনি লক্ষ করলেন যে চার্চের ছাদের থেকে শেকলের সাহায্যে ঝুলতে থাকা একটা ল্যাম্প বিস্তাপনে দোলন করছে। ওনার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও বুদ্ধি ব্যবহার করে, তিনি একটা সরল পরীক্ষা করলেন। তিনি তাঁর নাড়ির স্পন্দনকে ব্যবহার করে এই দোলক (সরল দোলক নয়) এর দোলন সময় নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন। তিনি এই পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে গোলকটির দোলন সময় অপরিবর্তিত থাকছে। তিনি নিজের পরীক্ষাগারে ফিরে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সূতো নিয়ে সরল দোলকের দোলন সময় এর বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সুতোর নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জন্যে একটা সরল দোলকের দোলন সময় এক ধ্রুবাঙ্ক।

এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দোলক ঘড়ি পরবর্তী সময়ে তৈরি করা হল। চাবি দোওয়া ঘড়ি এই দোলক ঘড়ির এক রূপান্তর মাত্র।

১১.৩: সময়ের একক

সময়ের মৌলিক একক সেকেন্ডে সংক্ষেপে (সে.) লেখা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের বৃহত্তর একক রূপে মিনিট (মি.) বা ঘণ্টা (ঘ.)কেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে আবশ্যক অনুসারে সময়ের অন্যান্য এককও ব্যবহার হওয়ার উদাহরণ আছে। যথা (ক) তোমার বয়স কত? বলে জিজ্ঞাসা করলে তুমি সাধারণভাবে উত্তর দেবে.....বারো বছর। এখানে বয়সকে প্রকাশ করার জন্যে 'বছর'-কে একক রূপে ব্যবহার করা হল। নিজের বয়সকে কেউ এত ঘণ্টা, এত মিনিট বলে না। (খ) সে রকম তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ''তুমি তোমার ঘর থেকে স্কুলে আসতে কত সময় নাও? তুমি তোমার আসার জন্যে লাগা সময়কে নিশ্চয়ই 'বছর' এবং মাসে প্রকাশ করবে না।

প্রশ্ন ১০: একটা দিনে কত সেকেন্ড আছে এবং একটা বছরে কত ঘণ্টা আছে?

১১.৪ বেগের একক:

আমরা সমীকরণ (১১.১)-এ পড়েছি যে বেগ $= \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ । তাই বেগের মৌলিক একক মিটার সেকেন্ড বা মি সে। যেমন মহাশূন্যে আলোকের বেগ 3×10^8 মি সে। তবে বেগ প্রকাশ করার জন্যে অন্য এককও ব্যবহার করা হয়।

এই অধ্যায়ের আরম্ভে বর্ণিত ঘটনার তোমার যাত্রা করে থাকা বাস-এর বেগ৪০ কিমি / ঘণ্টা। নৌসঞ্চালন ক্ষেত্রে বেগের একক হচ্ছে নট্ (Knot)। ১ নট্ = ১ সমুদ্রী মাইল / ঘণ্টা। ১.১৫২ মাইল / ঘণ্টা।

মনে রাখো: ১ সমুদ্রী মাইল (Nautical mile) = ১.১৫২ মাইল এবং ১ মাইল ১.৬ কিমি।

কৃত্রিম উপগ্রহকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠানোর জন্যে যে রকেট ব্যবহার করা হয় তার বেগ ১১.২ কিমি সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটা কচ্ছপের গতি প্রায় ৪৮ সেমি সে.। শামুকের গতি কচ্ছপের গতির থেকে ও কম। সাবণী ১১.৩-তে কয়েকটি জানাশোনা জীবদের দ্রুততম বেগের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই সারণীটি তোমার খাতায় আঁকো এবং প্রত্যেক জীবের বেগ সেমি সে. এককে হিসেব করে সারণীটির শেষ স্তম্ভয় লেখো।

সারণী ১১.৩- কয়েকটি জীবদের দ্রুততম বেগ

ক্রমিক নং	জীবের নাম	কিমি /ঘণ্টা এককের বেগ	মি /সে একক-এর বেগ
১	চিল	৩২০	$\frac{৩২০\times১০০০}{৬০\times৬০} = ৮৮.৮$
২	চিতা বাঘ	১১২	
৩	নীল তিমি মাছ	৪০-৪৬	
৪	খরগোষ	৫৫	
৫	গুন্ডুচি ইঁদুর	১৯	
৬	নেংটি ইঁদুর	১১	
৭	মানুষে (দৌড়লে)	৪০	
৮	কচ্ছপ	.২৭	
৯	শামুক	০.০৫	

একটা বস্তুর বেগকে ব্যবহার করে আর দুটি উপাদেয় সমীকরণ লিখতে পারা যাবে। বস্তুর বেগ জানা থাকলে সেই বস্তু এক প্রদত্ত সময় অবহিতে যত দূরত্ব অতিক্রম করবে তা হল,

অতিক্রান্ত দূরত্ব = বেগ × অতিক্রান্ত সময় ...(১১.২)

সেরকম বস্তুর বেগ জানা থাকলে বস্তুটি এক দণ্ড দূরত্বকে যতটা সময়ে অতিক্রম করবে তা হল সময় = দত্ত দূরত্ব /বেগ

মোটর গাড়ি বাস স্কুটার ইত্যাদিতে যাত্রা করার সময়ে তোমরা দেখে থাকবে যে এই যানবাহনদের বিভিন্ন মিটার থাকে। সেখান থেকে একটা মিটারে যানের গতিবেগ দেখানো হয় সেখানে কিমি ঘণ্টা লেখা হয়ে থাকে। এই মিটারকে বেগমিটার (Speedo meter) বলা হয়। একটা বেগ মিটারের ছবি চিত্র ১১.৬ মোটর গাড়ির ড্যাশ বোর্ডে থাকা বেগমিটারের চিত্র

যান গতি করার সময় সেই বেগমিটারের সূচক ঘণ্টাকে লক্ষ করলে যে কোনো মুহূর্তে যানের গতিবেগ জানা যাবে। এই যানগুলিতে অন্য এক মিটারও লেগে থাকে, যা যানটির যাত্রা করে থাকা দূরত্ব কিলোমিটারে দেখানো হয়।

চিত্র: ১১.৬ মোটর গাড়ির ড্যাশ বোর্ডে থাকা বেগমিটারের চিত্র

অনেক সময়ে বেগমিটারেই এক আয়তাকার থাকায় এই মিটার থাকে ও তার নীচে কিমি লেখা হয়ে থাকে। চিত্র ১১.৬টি দেখো। এই মিটারকে ওডোমিটার (Odometer) বলে।

তোমাদের জন্যে কাজ ১১.৪ :

স্কুলের মাঠের সমতল জায়গায় চক্ বা গুঁড়ো চুন ব্যবহার করে একটা দাগ টানো। তুমি এই দাগের থেকে ১ বা ২ মি দূরে দাঁড়াও। তুমি একটা বল নিয়ে বলটিকে গড়িয়ে দাও। যেন তা তুমি টেনে থাকা দাগের প্রতি লম্বভাবে গতি করবে। তোমার বন্ধুকে বলো বলটা যখন দাগটিকে অতিক্রম করল সে সময়টি নিজের ঘড়ি দেখে লিখে রাখবে। বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে যখন স্থির হল, সে সময়টিকেও লিখে রাখার জন্যে তোমার বন্ধুকে অনুরোধ করো। এখন বলটি যেখানে এসে স্থির হল, আঁকা হয়ে থাকা সরলরেখার থেকে সে বিন্দুটির দূরত্ব স্কেল বা মাপ ফিতের সাহায্যে নির্ণয় করো। তোমার বন্ধুদের বলে তাদের দ্বারাও এই পরীক্ষা করাও। তারপর সারণী ১১.৪ তোমার খাতায় এঁকে প্রত্যেক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বলটির বেগ নির্ণয় করো।

সারণী ১১.৪: গড়ানো হওয়া বলের বেগ নির্নয়

ক্রমিক নং	ছাত্রের নাম	বল গতি করে থাকা দূরত্ব মিটারে	গতির জন্যে সময় সেকেন্ডে	বেগ = দূরত্ব (মি) / সময় (সে)
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				

১১.৪ গ্রাফ

ধরে নেওয়া যাক তুমি একটা মোটর গাড়িতে একটা দূর জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছ। তুমি মোটর গাড়ির সামনের সিটে বসেছ। গাড়ি চলবার পর তুমি প্রত্যেক আধ ঘণ্টায় ওডোমিটারের মানাঙ্ককে একটা খাতায় লিখে রাখো পরে সেই তালিকাকে ব্যবহার করে তুমি ঘর থেকে কখন কত দূরে ছিলে তা নির্ণয় করো। মনে করো এ পরীক্ষার থেকে তুমি নিম্নলিখিত সারণীটি সৃষ্টি করলে।

সারণী ১১.৫ ঘণ্টার সময় ও গতি করে থাকা দূরত্ব

ক্রমিকনং	সময় পূর্বাহ্ণ	ওডো মিটারের মাপঙ্ক	ঘর থেকে গতি করে থাকা দূরত্ব
১	৮.০০	৪৩৭৮৩	০ কি.মি
২	৮.৩০	৪৩৮০৩	২০ কি.মি
৩	৯.০০	৪৩৮২৩	৪০ কি.মি
৪	৯.৩০	৪৩৮৪৩	৬০ কি.মি
৫	১০.০০	৪৩৮৬৩	৮০ কি.মি

এখন যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করা হয় "পূর্বাহ্ণ" ৯.৪৮-এ তুমি ঘরের কাছ থেকে কত দূরে ছিলে? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কষ্ট হতে পারে। তুমি যদি তোমার শিক্ষককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে উনি বলবেন যে এ প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করার জন্যে সময়-দূরত্ব গ্রাফ অঙ্কন করা একটি উপায়।

এসো গ্রাফ অঙ্কন ও ব্যবহারের বিষয়ে অল্প কিছু জানব। টেলিভিশনে এক দিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচের সোজা প্রসারণ দেখার সময় তুমি লক্ষ করে থাকবে যে বিভিন্ন ওভারে ব্যাটসম্যানরা কত কত রান করেছেন, তা মাঝে মাঝে টেলিভিশন পর্দায় গ্রাফের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়। চিত্র ১১.৭-এ এমন একটা গ্রাফ-এর ছবি দেওয়া হয়েছে। এই রকম গ্রাফ্ কে বারগ্রাফ্ বলা হয়।

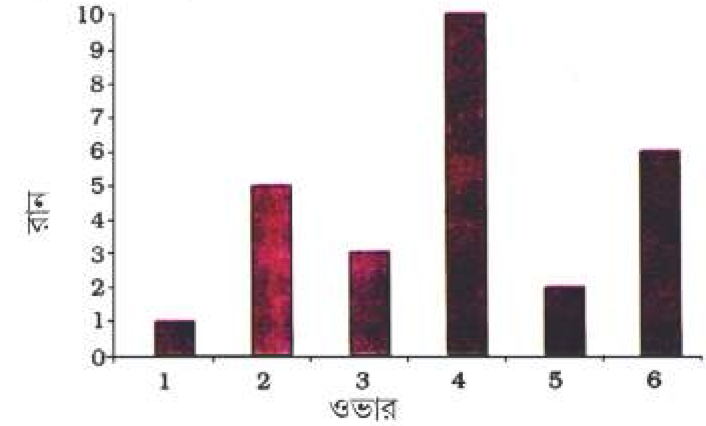

চিত্র: রান ওভার ১১.৭ একটা ক্রিকেট টিম প্রত্যেক ওভারে করে থাকা রান-এর করা গ্রাফ

অন্য এক শৈলী ব্যবহার করে বায়ুতে থাকা বিভিন্ন উপাদানের অনুপাতিক পরিমাণ চিত্র ১১.৮-এ দেখানো হয়েছে। এমন গ্রাফকে পাইচার্ট (Pie-chart) বলা হয়।

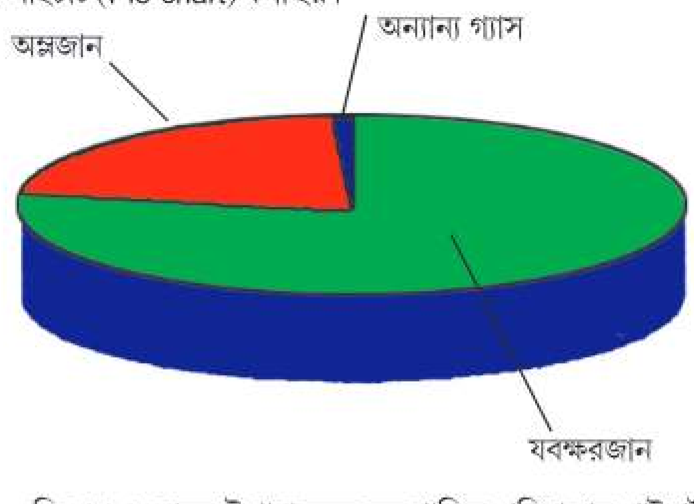

চিত্র ১১.৮ বায়ুর উপাদানদের অনুপাতিক পরিমাণের পাইচার্ট

সেরকম একজন মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ওজন বাড়ার তথ্যকে একটা গ্রাফের সাহায্যে চিত্র ১১.৯য়ে দর্শানো হয়েছে। এমন গ্রাফকে রেখা গ্রাফ বলা হয়।

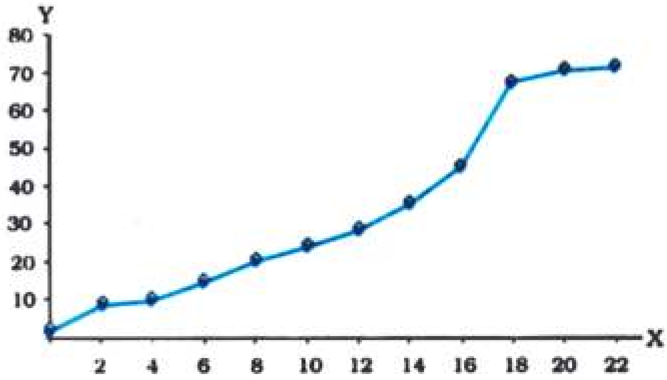

চিত্র ১১.৯ একজন লোকের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ওজনে ঘটা পরিবর্তনের রেখাগ্রাফ

একটা গতিশীল বস্তুর সময়-দূরত্ব গ্রাফও একটা রেখা গ্রাফ। এসো এমন গ্রাফ কীভাবে আঁকা হয় আলোচনা করব।

১১.৫ গতিশীল বস্তুর সময়-দূরত্ব গ্রাফ

সারণী ১১.৫ ব্যবহার করে গতি করে থাকা সময় ও গতি করে থাকা দূরত্বর একটা নতুন সারণী তৈরি করো। খাতায় তৈরি করে থাকা এই সারণীকে নীচে দেওয়া সারণী ১১.৬ সহিত মেলাও। দেখবে নীচের সারণীতে পূর্বাহ্ন ৮.০০-কে শূন্য সময় লেখা হয়েছে। কারণ আমরা সেই সময়েই সময় দেখা আরম্ভ করব।

সারণী ১১.৬ গতি করে থাকা সময় ও অনুরূপ দূরত্ব

ক্রমিক নং	গতি করে থাকা সময়	ঘরের কাছ থেকে অতিক্রম করে থাকা দূরত্ব (কিমি)
১	০	০
২	৩০ মিনিট	২০
৩	১ ঘণ্টা	৪০
৪	১ ঘণ্টা ৩০ মি	৬০
৫	২ ঘণ্টা	৮০

তোমাদের জন্যে কাজ ১১.৫

গ্রাফ অঙ্কন করার জন্যে একটা গ্রাফ কাগজ নাও। চিত্র ১১.১০ যেমন দর্শানো হয়েছে তোমার গ্রাফ কাগজে সেরকম পরস্পর নকশা হয়ে দুটি সরলরেখা অঙ্কন করো চিত্র ১১.১০ অনুসারে একটার নাম x'ox অন্যটির নাম y'oy রাখো। এই দুটি সরলরেখার ছেদ বিন্দু (O)কে মুল বিন্দু (Origin) বলা হয়। অ১দ্রঅ ও।১দ্রাকে অক্ষ বলা হয়।

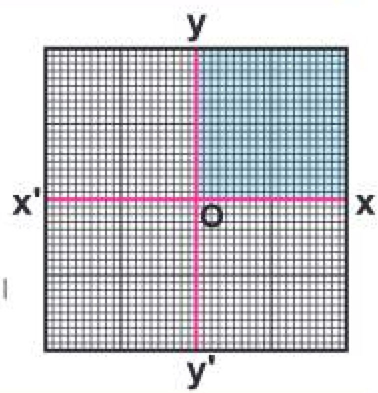

চিত্র ১১.১০ একটা গ্রাফ কাগজে X ও Y অক্ষ

মূল বিন্দুর ডানদিকে অ-এর মূল্য যুক্তাত্মক ও বাঁয়ে বিযুক্তাত্মক হয়ে থাকে সেরকম মূলবিন্দুর ওপর দিকে ক্ষএর মূল্য যুক্তাত্মক ও নীচের দিকে বিযুক্তাত্মক হয়ে থাকে। এই সময় ও দূরতার গ্রাফ-এর জন্যে আমরা চিত্র ১১.১০ক্ষএ থাকা কেবল স্থায়িত্ব অংশই ব্যবহার করব। যা গ্রাফ কাগজের মাত্র এক চতুর্থাংশ কারণ সময় দূরতার মূল্য সবসময়ে যুক্তাত্মক হয়ে থাকে।গ্রাফ এর জন্যে যে দুটি রাশিকে নেওয়া হবে তার মধ্যে থেকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র রাশি (Independent Variable) কে অ-অক্ষরেও নির্ভরশীল রাশি (Dependent Variable)-কে y-অক্ষরে নেওয়া হয়।

এখন সারণী ১১.৬ থাকা তথ্য সম্বন্ধীয় গ্রাফ অঙ্কন করার জন্যে নিম্নলিখিত ক্রমিক পদক্ষেপ অবলম্বন করো।

- একটা গ্রাফ কাগজ নিয়ে তার ওপর দুটি পরস্পর লম্ব হয়ে থাকা সরললেখা এমনভাবে টানো যেন তার ছেদবিন্দু গ্রাফের বামপার্শ্বে নিম্নে থাকবে। তাহলে পুরো গ্রাফ কাগজটি আমরা ব্যবহার করতে পারব। ১১.১০-এ দেখানো অনুসারে সে দুটি অক্ষকে দ্রঅ ও দ্রা নাম দাও। ও ছেদবিন্দু (যা বর্তমান গ্রাফের মূলবিন্দু হবে) এর নাম দ্র রাখো। যেহেতু সময়-দূরত্ব ক্ষেত্রে সময় স্বতন্ত্র রাশি তাই তা দ্রঅ বা অক্ষ অক্ষ ওপর প্রতিপাদিত হবে। যেহেতু দূরতা নির্ভরশীল রাশি, তা দ্রা বা া অক্ষর ওপর প্রতিপাদিত হবে।

- বর্তমান প্রত্যেক রাশিকে তাদের জন্যে নির্ধারিত অক্ষে প্রতিপাদিত করার জন্যে একটা করে স্কেল ঠিক করো। এ ক্ষেত্রে যেহেতু মোট সময়সীমা ২ ঘণ্টা এবং ৫টি অন্তরালে আমরা মাপাঙ্ক নিয়েছি। তাই সময়ের জন্যে নিম্নোক্ত স্কেলটি যথোচিত হবে।

  সময় : ১০ মিনিট = ১সে.মি. ১১.৪

  অথবা ১৫ মিনিট = ১ সে. মি

  সেরকম যেহেতু গতি করে থাকা মোট দূরত্ব ৮০ কি.মি এবং ৫টি অন্তরালের আমরা মাপাঙ্ক নিয়েছি, তাই দূরতার জন্যে নিম্নোক্ত স্কেলটি যথোচিত হবে।

  দূরতা: ২০ কি.মি = ২ সে.মি ...১১.৫

  অথবা ১০ কি.মি = ১ সে.মি

- এই স্কেল ব্যবহার করে সময় ও দূরতার জন্যে উদ্দিষ্ট অক্ষগুলিতে দাগ দিয়ে, দাগের কাছে নির্দিষ্ট রাশির মূল্যাঙ্ক লেখো। এর জন্যে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া চিত্র ১১.১১-কে লক্ষ্য করো। দেখবে, আমরা সময় অক্ষে ঘণ্টা, মিনিট যথা ১ ঘণ্টা ৩০ মি. না লিখে তাকে ৯০ মিনিট লিখেছি।

প্রশ্ন ১১: সারণী (১১.৪) ও (১১.৫)-এ থাকা তথ্যকে ব্যবহার করে x- অক্ষয় ১ মি.মি কত সময়কে ও y- অক্ষয় ১ মি.মি দূর তাকে প্রতিপাদিত করে গণনা করো।

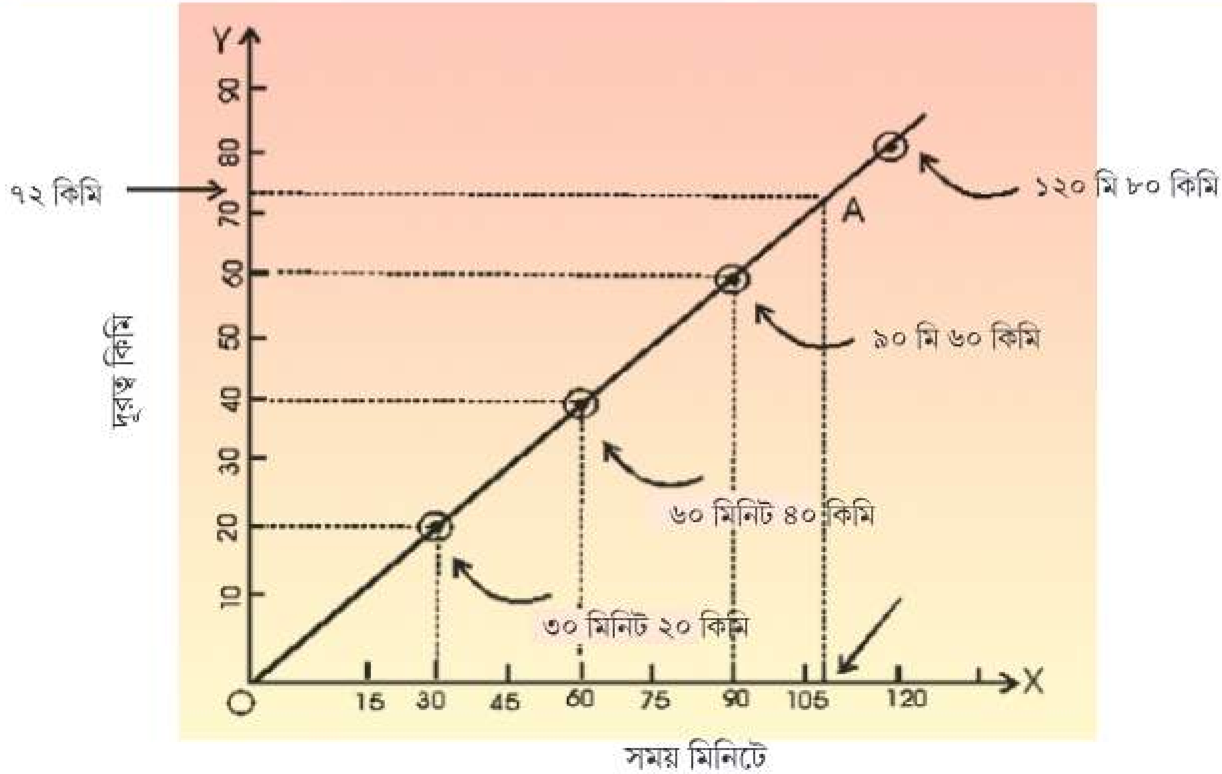

চিত্র ১১.১১ গ্রাফ তৈরি করার উদাহরণ

- এখন সারণী ১১.৬-এর থেকে সময় ও দূরতার জন্যে একটা একটা সেটে থাকা মূল্যদ্বয়কে ব্যবহার করে, গ্রাফে একটা করে বিন্দু উপস্থাপন করতে হবে। ক্রমি নং ১এ সময় ও দূরতার মূল্যদ্বয় হল (০,০) মূল বিন্দু 'O' তে উভয় x ও y এর মূল্য ও (০,০)। তাই মূল বিন্দু '০' তোমার আঁকতে থাকা সময় দূরতা গ্রাফের এক বিন্দু। এখন সারণী ১১.৬ এর তার পর ক্রমিক নং ২ এর সময় ও দূরতার মূল্যদ্বয় হল (৩০ মি, ২০ কি.মি) গ্রাফের এই বিন্দুটি উপস্থাপন করার জন্যে প্রথমে x-অক্ষে ৩০ মি দাগটি বিন্দুটি চিহ্নিত করো। এই বিন্দু দিয়ে y-অক্ষ এর সহিত সমান্তরাল, করে একটা সরলরেখা অঙ্কন করো। সেরকম, ইক্ষ্ম অক্ষের ২০ কি. মি দাগটি বিন্দুটি চিহ্নিত করো। এই বিন্দু দিয়ে x-অক্ষের সহিত সমান্তর করে একটা সরলরেখা অঙ্কন করো। এই দুই সরলরেখা, যেখানে পরস্পরকে ছেদ করল, সেই বিন্দুই গ্রাফ-এর (৩০ মি, ২০ কি.মি) মূল্যদ্বয়ের উপস্থাপিত বিন্দু। এই প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করে, বাকি ক্রমিক নং থাকা সময় ও দূরত্ব সেট্-এর মূল্যদ্বয় গ্রাফ-এ প্রতিপাদিত করো। এ সমস্ত বিন্দুকে একটা একটা ছোট বৃত্তের দ্বারা আবৃত করে চিহ্নিত করাও চিত্র ১১.১১ দেখো।

- এখন গ্রাফ সৃষ্টি করে থাকা বিন্দুগুলিকে সংযোগ করো। এ ক্ষেত্রে দেখবে সময়-দূরত্ব গ্রাফটি একটা সরলরেখা। তবে সব ক্ষেত্রে গ্রাফটি সরলরেখা নাও হতে পারে। তুমি যে গ্রাফটি অঙ্কন করলে তা চিত্র ১১.১১-এ দর্শানো হয়েছে।

- সময়-দূরত্ব গ্রাফটি যদি সরলরেখা হয় তবে বস্তুটি এক সমান বেগে গতি করছে বলে জানা যায়। যদি গতিশীল বস্তুর বেগ সমান না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সময়-দূরত্ব গ্রাফ আর সরলরৈখিক গ্রাফ হয় না।

১১.৬ গ্রাফের জন্যে স্কেল বাছায় যত্ন

তোমাদের জন্যে কাজ-এ গ্রাফ-এর জন্যে কেমন স্কেল নেবে, সে বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে গ্রাফের জন্যে স্কেল নির্দিষ্ট করার সময় এই বইতে যা দেওয়া হয়েছে কেবল সেই স্কেল নেবে। প্রতি গ্রাফের জন্যে তোমাকে নিজেই স্কেল কী হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিতে হবে।

প্রশ্ন ১২: তুমি যে গ্রাফ আঁকলে সেখানে l-অক্ষের দূরতার স্কেল যদি ১ কি.মি ১ সে.মি নেব তা হলে কী অসুবিধা হবে? যদি গ্রাফ কাগজের আকার ২০ সে.মি × ২৫ সে.মি, তবে তুমি এঁকে থাকা গ্রাফের জন্যে অন্য কোনো স্কেলও ব্যবহার করতে পারবে?

গ্রাফের জন্যে স্কেল বাছার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি ধ্যান দিলে গ্রাফ আঁকায় বিশেষ অসুবিধা হবে না।

- গ্রাফ আঁকতে থাকা প্রত্যেক রাশির সারণীতে থাকা সর্বোচ্চ মূল্য ও সর্বনিম্ন মূল্য কত?
- রাশিদের মধ্যবর্তী (Intermediate) মূল্য কত তাও লক্ষ করতে হবে, এবং এমন স্কেল নিতে হবে, যাতে কি এই মধ্যবর্তী মূল্যগুলি সহজে অক্ষগুলোতে নির্ণয় করতে পারা যাবে।
- এমন স্কেল বাছবে, যেন গ্রাফ কাগজটি প্রায় পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারা যাবে।

১১.৭ গ্রাফের উপাদেয়তা

সারণী ১১.৫ পরে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল -পূর্বাহ্ণ ৯.৪৮এ তোমার ঘরের কাছ থেকে কত দূরে থাকবে? তুমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে অসুবিধা অনুভব করেছিলে। এখন এসো দেখব তুমি এঁকে থাকা গ্রাফকে ব্যবহার করে এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে জানতে পারবে।

উপায়—

- পূর্বাহ্ণ ৯.৪৮ পর্যন্ত গতি সময়ের অবধি হল (৯.৪৮-৮.০০) =১ ঘ ৪৮ মি =১০৮ মি
- x-অক্ষে এই মাপাঙ্কটি দাগ দাও। (চিত্র ১১.১১ দেখো)
- এই দাগের মধ্য দিয়ে l-অক্ষের সঙ্গে সমান্তর করে একটা রেখা অঙ্কন করো।
- ইহা গ্রাফকে 'A' বিন্দুতে ছেদ করুক।
- 'A' বিন্দু দিয়ে অক্ষ্মঅক্ষের সঙ্গে সমান্তর করে একটা রেখা অঙ্কন করো।
- ইহা y-অক্ষকে B-বিন্দুতে ছেদ করুক।
- B বিন্দুর মূল্য ৭২ কি.মি।
- তাই পূর্বাহ্ণ ৯.৪৮-এ তুমি ঘর থেকে ৭২ কি.মি দূরে ছিলে।

সারণী ১১.৫ পরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রশ্নের উত্তর এখন গাণিতিক উপায়ে নির্ণয় করো। দেখবে তোমার উত্তর গ্রাফ থেকে পাওয়া উত্তরের সঙ্গে সমান।

এই তথ্যই গ্রাফ-এর আবশ্যকতা তথা, উপাদেয়তা প্রমাণ করছে।

কী শিখলে ?

- একক সময়ে একটা বস্তু গতি করে থাকা দূরতাকে বস্তুর বেগ বলা হয়। এবং তা মি / সে এ প্রকাশ করা হয়।
- একটা বস্তু গতি করে থাকা দূরতাকে গতি করে থাকা সময়ে ভাগ করলে। তা বস্তুর গড় বেগ দিয়ে থাকে। বেগের মৌলিক একক মি /সে।
- বিভিন্ন গতিশীল বস্তুর মধ্যে কোন্‌টা ক্ষিপ্রতর বা ক্ষিপ্রতম জানার জন্যে আমাদের বেগ সাহায্য করে থাকে।
- সময় মাপার জন্যে দোলন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সরল দোলনের দোলন গতি ব্যবহার করে সাধারণত ঘড়ি তৈরি করা হয়।
- একটা বস্তুর গতিকে সময়-দূরতার গ্রাফ দ্বারা উপস্থাপন করা হয়।
- এর সমান বেগে গতি করা বস্তুর সময়-দূরতা গ্রাফ এক সরল রৈখিক গ্রাফ।
- গতিজনিত অনেক প্রশ্নের সমাধান করার গ্রাফ সাহায্য করে।

অভ্যাস

১. নীচে দেওয়া প্রত্যেক গতি কোন প্রকার গতি সরলরৈখিক, বৃত্তাকার, দোলন আবৃত্তি বা একাধিক গতির সংমিশ্রণ লেখো।

(ক) তুমি সোজা রাস্তায় দৌড়ানোর সময়ে তোমার হাতের গতি

(খ) একটা বৈদ্যুতিক ঘড়িতে হাতুড়ির গতি (ঘণ্টা বাজার সময়)

(গ) বৃষ্টি হওয়ার সময়ে সোজা রাস্তায় যাওয়া একটা কারের সামনের কাচের ওয়াইপারের গতি।

(ঘ) বাতাসের সামনে থাকা কাগজের তৈরি চরকির গতি।

(ঙ) একটা বিদ্যুৎচালিত খেলনার বাজনা বাজানোর সময় খেলনার হাতের গতি।

(চ) একটা সোজা পোলের ওপর দিয়ে যাওয়া একটা ট্রেনের গতি।

২. তুমি দেখে থাকা তথা সরলরৈখিক গতি করা একটা বস্তুর নাম লেখো।

৩. চিত্র ১১.১১ ব্যবহার করে কারের বেগ নির্ণয় করো।

৪. সময় অনুসারে একটা কার গতি করে থাকা দূরতার সাবণী নীচে দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	সময়-পূর্বাহ্ণ	ঘরের কাছ থেকে গতি করার দূরত্ব
১	৮.০০	০ কিমি
২	৮.৩০	২০ কিমি
৩	৯.০০	৬০ কিমি
৪	৯.৩০	৯০ কিমি
৫	১০.০০	১২০ কিমি

তুমি আগের থেকে এঁকে থাকা সময়-দূরতা গ্রাফের এই সারণী ব্যবহার করে অন্য এক সময়-দূরতা গ্রাফ অঙ্কন করো।

ক. দুটি গ্রাফের মধ্যে কী প্রভেদ লক্ষ্য করছ?

খ. প্রত্যেক গ্রাফের অক্ষ্মঅক্ষর সহিত আনত কোণ কি সমান?

গ. এই আনত কোণের সঙ্গে বস্তুর বেগর কোন্ সম্পর্ক লক্ষ করছ লেখো।

৫. একটা বস্তুর সময়-দূরতা গ্রাফ তলায় দেওয়া হল। বস্তুটি কোন্ প্রকার গতি করছে লেখো।

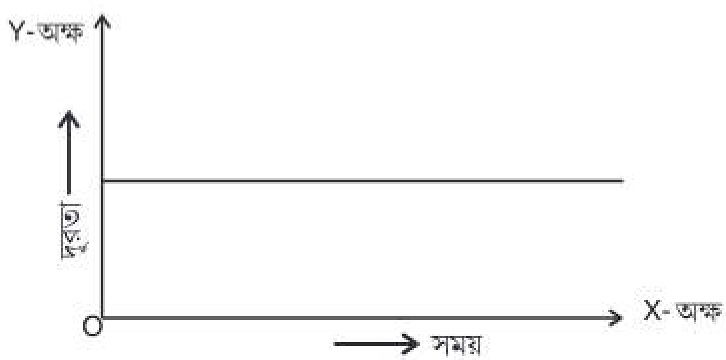

৬. তুমি সাইকেল চালিয়ে যাওয়ায় সময়ে তোমার বেগ ১২ কিমি ঘণ্টা। একটা মৌমাছি ওড়ার সময় তার বেগ ৫মি. সে। তোমার ও মৌমাছির বেগের ভেতর কার বেগ বেশি?

৭. একটা কার ১৫ মিনিট পর্যন্ত ৪০কি ঘণ্টা বেগে গতি করল। তার পর ২০ মিনিট পর্যন্ত ৬০কি ঘণ্টা বেগে গতি করল। এই যাত্রায় কারের মোটামুটি গড়ে বেগ কত?

৮. নিম্নোক্তর মধ্যে ভুল উক্তিগুলি সংশোধন করে তোমার খাতায় লেখো।

ক. সময়ের মৌলিক একক ঘণ্টা।

খ. দুটি শহরের মধ্যে দূরত্ব কিমিতে মাপা হয়।

গ. প্রত্যেক বস্তু গতি করার সময় সাধারণত সমান বেগে গতি করে থাকে।

ঘ. একটা সরল দোলকের দোলন সময় ধ্রু নয়।

ঙ. ট্রেনের বেগ মি ঘণ্টা প্রকাশ করা হয়।

৯. বেগের মৌলিক একক:

ক. কিমি/ মিনিট, খ. মি /মিনিট গ. কিমি ঘণ্টা ঘ. মি /সে।

১০. নীচে চারটি সময় দূরতার গ্রাফ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কোন্‌টা একটা কার-এর অসম গতির সময়-দূরতা গ্রাফ?

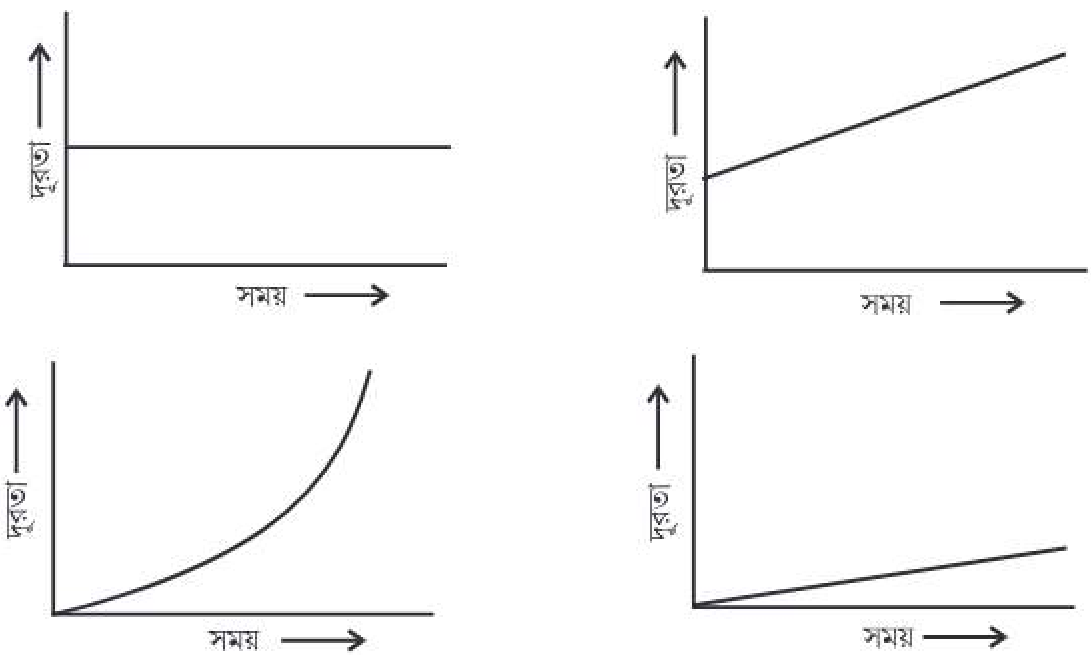

১১. একটা গতিশীল গাড়ির ওডোমিটারের মাপাঙ্ক পূর্বাহ্ণ ০৮.০০টায় ৬৩২১৯.০ কিমি ও পূর্বাহ্ণ ০৮.৩৫য়ে ৬৩৩০৯.০ কিমি। এই সময় অন্তরালে কারের বেগ কিমি মিনিট তথা কিমি ঘণ্টায় প্রকাশ করো।

১২. মনে করো যে চিত্র ১১.২০ ও ১২.২য়ে দর্শানো হয়ে থাকা ফটো দুটি ১০ সে. অন্তরালে নেওয়া হয়েছে যদি ফটোগুলো ১০০ মি দূরতা ১ সেমি রূপে দর্শানো হয়েছে, তবে নীল কারের বেগ নির্ণয় করো।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

- তুমি কোনো পার্কে বেড়াতে গেলে, একটা শিক্ষণীয় পরীক্ষা করতে পারবে। তোমার কাছে একটা ঘড়ি থাকা দরকার। পার্কে থাকা দোলনাকে সামান্য দোলাও, যখন সেখানে কেউ বসেনি, দোলনাটির দোলন সময় নির্ণয় করো। এখন তুমি দোলনার ওপরে বসো। তুমি তোমার বন্ধুকে বলো যে, সে তোমাকে একবার ঠেলে দিয়ে ছেড়ে দেবে। তুমি এখন দোলনার দোলন সময় নির্ণয় করো। তার পরে দোলনায় তোমার বন্ধুকে বসতে বলে পরীক্ষাটি পুনর্বার করো। এই তিনটি দোলন সময়কে তুলনা করে, তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে, তা তোমার খাতায় লেখো।

- একটা সরল গোলকের দৈর্ঘ্য সুতোর দৈর্ঘ্য + বর্তুলাকার বব্-এর ব্যাসার্ধ। এ কথাটি মনে রেখো, এখন গোল গোল আলুকে বব্‌রূপে ব্যবহার করে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য যথা ৮০ সেমি, ৯০ সেমি, ১০০ সেমি, ১১০ সেমি ও ১২০ সেমি বিশিষ্ট পাঁচটি সরল দোলন তৈরি করো। প্রতি দোলকের দোলন সময় নির্ণয় করো। তারপর দোলকের দৈর্ঘ্য ও দোলকের সময় (t) এক সারণী প্রস্তুত করো। এই সারণীকে ব্যবহার করে l-গ্রাফ আঁকো। তারপর এই সাবণী একটা L এবং t^2 সারণী তৈরি করো। এই নতুন সাবণীকে ব্যবহার করে l - t^2 গ্রাফ আঁকো।

  প্রশ্ন: এই নতুন গ্রাফের সাহায্যে সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবে কি? (তোমার সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করো ও তোমার শিক্ষকের সাহায্য নাও।)

- পুরাতন কালের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সময় মাপক যন্ত্র বা ঘড়ি ব্যবহৃত হত, তাদের ওপর একটা সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো। তোমার টিপ্পনীতে নিম্নোক্ত বিষয় থাকা উচিত।

  — যন্ত্র বা ঘড়ির নাম

  — যে দেশে তা প্রথম নির্মিত হয়েছিল সে দেশ বা স্থানের নাম।

  — কোন্ সালে তা তৈরি হয়েছিল?

  — সে যন্ত্রে কোন্ একক ব্যবহার করে সময়ে মাপা যেত।

  — যদি সম্ভব সে যন্ত্র বা ঘড়ির ফটো বা হাতে আঁকা চিত্র।

  — এখন সে ঘড়ি বা যন্ত্র কোন্ মিউজিয়মে দেখতে পাবে।

- স্কুলে বা তোমার ঘরে থাকা একটা দোলক থাকা দেওয়াল ঘড়ি লক্ষ করো। সেই দোলকের দোলন সময় নির্ণয় করো। এই দোলক সেকেন্ড দোলক কি?

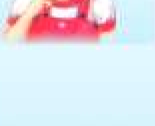

জানলে ভালো:

ভারতের সময় নির্ধারণ সেবা জাতীয় ভৌতিকী প্রয়োগশালা (National Physical Laboratory) থেকে উপলব্ধ হয়ে থাকে। তার কাছে থাকা ঘড়ি এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাপার জন্যে সক্ষম। পৃথিবীর সব থেকে নির্ভুল ঘড়ি আমেরিকার মান ও প্রবিধি বিজ্ঞানের জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institute of Standard and Technology) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এই ঘড়ি দুকোটি বছরে মাত্র ১ সেকেন্ড ভুল দেখিয়ে থাকে।

●●●

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যুৎ স্রোত

১২.১ পূর্ব পঠিত বিষয়:

তুমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিদ্যুৎ বিষয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ সেল বিদ্যুতের উৎস বলে জেনেছ। একাধিক বিদ্যুৎ সেলের সংযোগকে ব্যাটারি বলা হয়। বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহের জন্যে সুপরিবাহী ধাতব তারের আবশ্যকতা আছে। কোনো বিদ্যুৎ পরিপথকে মুদিত বা মুক্ত করতে বিদ্যুৎ সুইচের আবশ্যকতা আছে।

প্রশ্ন ১: একটা বিদ্যুৎ পরিপথের কোন কোন অংশক (Component) আবশ্যক তার এক তালিকা প্রস্তুত করো।

প্রশ্ন ২: সেই অংশদের নিয়ে এক বিদ্যুৎ পরিপথ (পূর্ব শ্রেণীতে আলোচিত বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করে অঙ্কন করবে।

বিদ্যুৎ পরিপথকে চিত্রতে অঙ্কন করে দেখতে হলে , তাতে ব্যবহৃত অংশগুলি দেখতে যেমন ঠিক সেইরকম অঙ্কন করবে । সেই বিদ্যুৎ পরিপথের চিত্র নিম্ন চিত্রর ১২.১ মতো হবে।

(ক)

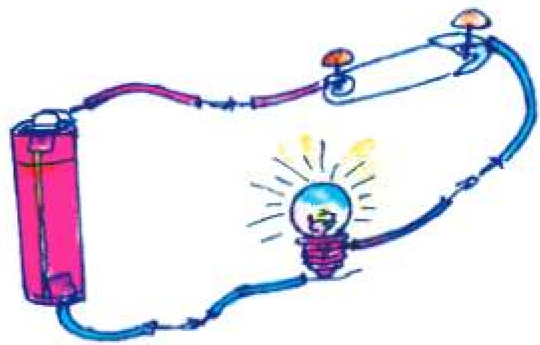

(খ)

চিত্র ১২.১ সরলতম বিদ্যুৎ পরিপথ

এই বিদ্যুৎ পরিপথের চিত্র অঙ্কন করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তাই বৈজ্ঞানিকরা বিদ্যুৎ পরিপথের বিভিন্ন অংশের জন্যে নির্দিষ্ট সংকেত সব ব্যবহার করেছেন। এসো সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করব।

১২.১ বিদ্যুৎ উপাদানের সংকেত

বিদ্যুৎ পরিপথে ব্যবহৃত হওয়া উপাদানগুলি সংকেত সারণী ১২.১-এ দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ উপাদান (অংশকে)	সংকেত
১	বিদ্যুৎ সেল	
২	বিজলি বাতি	
৩	বৈদ্যুতিক সুইচ (মুদিত অবস্থায়) ব্যাটারি	
৪	বৈদ্যুতিক সুইচ (মুক্ত অবস্থায়) ব্যাটারি 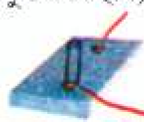	
৫	দুটি সেলকে সংযুক্ত করা হয়েছে।	
৬	বিদ্যুতের তার 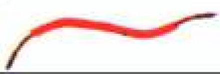	

সারণী ১২.১: বিদ্যুৎ

পরিপথে ব্যবহৃত হওয়া বিভিন্ন উপাদানের

সারণী ১২.১-এ দেওয়া সংকেতগুলিকে মনোযোগ দিয়ে দেখো। এখানে বিদ্যুৎ সেলের সংকেতরূপে দুটি সমান্তরাল রেখা টানা হয়েছে। এই দুটি রেখার মধ্যে একটা বড় অন্যটি ছোট। তোমরা আগে পড়েছ। একটা বিদ্যুৎ সেলের একটা মাথা যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্র এবং অন্য মাথা বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্র। এখানে বিদ্যুৎ সেলের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকা বড় দাগটি যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের সংকেতরূপে এবং ছোট দাগটি বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের সংকেতরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যুৎ সুইচটিকে পরিপথে মুদিত ও মুক্ত অবস্থায় থাকার সংকেত ও চিত্রদ্বারা দর্শানো হয়েছে। সেরকম পরিপথে ব্যবহৃত হওয়া বিদ্যুৎ পরিবাহী তারকে একটা রেখা দ্বারা সূচিত করা হয়েছে।

সাবণী ১২.১-তে একটা ব্যাটারির সংকেত দেওয়া হয়েছে। এই সংকেত পূর্বে আলোচিত কোনো সংকেতের সহিত সামঞ্জস্য আছে, বলতে পারবে কি? এখানে দুটি বিদ্যুৎ সেলের সংকেতকে মিশিয়ে অঙ্কন করা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসা টর্চ, রেডিও, টিভি, রিমোট গাড়িতে একটার থেকে অধিক বিদ্যুৎ সেল ব্যবহৃত হয়। যেখানে একটার থেকে অধিক, বিদ্যুৎ সেল ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যবস্থাকে ব্যাটারি বলা হয়। এখানে একটা বিদ্যুৎ সেলের যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্র, অন্য সেলের বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের সহিত সংযুক্ত হয়ে থাকে।

চিত্র ১২.২ (ক)

চিত্র ১২.২ (খ)

বিদ্যুৎ সেলের সংযোগ

চিত্র ১২.৩ ব্যাটারি

কতকগুলি ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সেলগুলিতে একটার পর একটাকে লাগালাগি করে রাখা হয় না। এখানে দুটো বিদ্যুৎ সেল কাছাকাছি রাখা হয়ে থাকে। কাছাকাছি রাখা বিদ্যুৎ সেলগুলি কীভাবে সংযুক্ত হয়েছে, তা চিত্র ১২.৩-এ দর্শানো হয়েছে। এখানে একটা মোটা পাত কিংবা তারের একটা প্রান্ত একটা সেলের যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের সঙ্গে এবং অন্য প্রান্তটি অন্য এক সেলের বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের সহিত সংযুক্ত হয়ে থাকে। তুমি জানার অসুবিধা না হওয়ার জন্যে বিদ্যুৎ সেলের ওপর যুক্ত ( ) চিহ্ন এবং বিযুক্ত চিহ্ন (-) লেখা হয়ে থাকে।

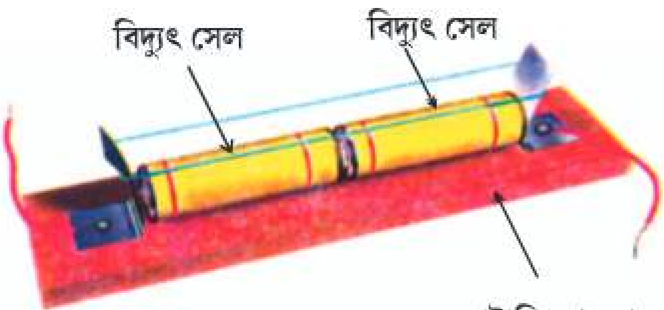

চিত্র ১২.৪

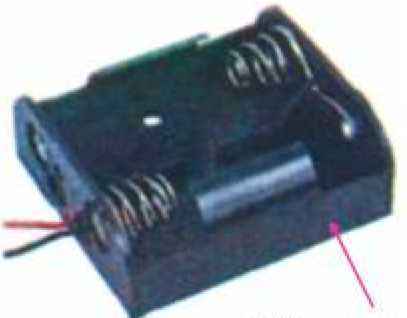

চিত্র ১২.৫

সেল হোলডার বা পরিধানী

তোমার বিভিন্ন কাজের জন্যে বিদ্যুৎ সেলকে ব্যাটারি রূপে ধরে রাখার জন্যে একটা সেল হোলডার বা সেল ধারক-এর আবশ্যকতা থাকে। তুমিও চিত্র ১২.৪-এর মতো একটা সেল হোলডার বা সেল ধারক প্রস্তুত করতে পারবে। এখানে একটা কাঠের পাট্টা, দুটো লোহার স্ট্রিপ বা পাত এবং একটা রবার ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়েছে। এই রবার ব্যান্ড সেল দুটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে।

তুমিও বাজার থেকে সেল ধারক কিনে আনতে পারবে। কিন্তু সেই সেল ধারকে, সেলগুলো ঠিকভাবে সংযুক্ত করবে, যেমন একটার যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্র অন্যটি বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের সহিত সংযুক্ত হয়ে থাকবে। সেল ধারকে থাকা দুটি ধাতব পাতের সহিত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংযোগ করো। ইহা চিত্র ১২.৫-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

এসো আমরা সারণী ১২.১-এ দেওয়া সংকেত ব্যবহার করে এক বিদ্যুৎ বর্তনী অঙ্কন করব।

স্কুটার, বাস, ট্রাক, ট্রাকটার ও ইনভার্টার ইত্যাদির ব্যাটারিও কতক সেলকে নিয়ে গঠিত।

চিত্র ১২.৬ ব্যাটারি চিত্র

তোমাদের জন্যে কাজ: ১২.১

চিত্র ১২.৭
একটা বিদ্যুৎ বর্তনী

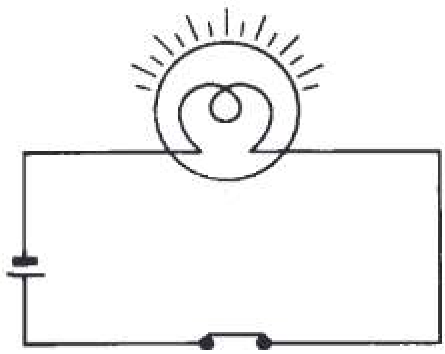

চিত্র ১২.৮
মুদিত তড়িৎ বর্তনী

তুমি ১২.৭-এর মতো উপাদান ব্যবহার করে আগের থেকে সরল বিদ্যুৎ বর্তনী তৈরি করে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে পেরেছিলে। এখানে বৈদ্যুতিক সুইচকে মুদিত করলে আলো জ্বলে ও বিদ্যুৎ সুইচ মুক্ত করলে বিজলিবাতি নিভে যায়।

এই প্রকার সরল বিদুৎ বর্তনীর চিত্র তুমি তোমার খাতায় অঙ্কন করো। আর উপাদানগুলির সংকেত ব্যবহার করে এই বিদ্যুৎ বর্তনীর চিত্র অঙ্কন করো। সেই চিত্রটি বইয়ে থাকা চিত্র ১২.৮-এর মতন হয়েছে কি? সংকেত ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বর্তনী অঙ্কন করা নিশ্চিতরূপে সোজা। তাই সব সময় সংকেত ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বর্তনী অঙ্কন করা হয়।

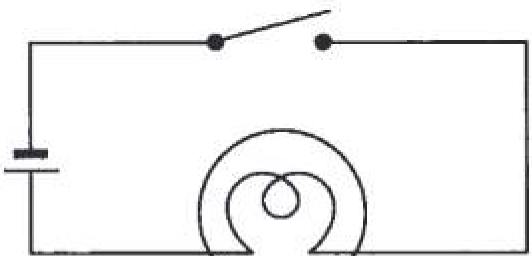

চিত্র ১২.৯ মুক্ত বিদ্যুৎ বর্তনী চিত্র

চিত্র ১২.৯-তে যুক্ত বিদ্যুৎ বর্তনী চিত্র দেওয়া হয়েছে। ইহা চিত্র ১২.৮-এর সহিত সমান কি? এর মধ্যে পার্থক্য দেখছ কি? এ রকম বিদ্যুৎ বর্তনীতে বিজলী আলো জলবে কি? বিদ্যুৎ আলো কেবল বিদ্যুৎ বর্তনীর বিদ্যুৎ সুইচ মুদিত হয়ে থাকলে জ্বলে।

এখান থেকে তোমরা জানলে যে—

- বিদ্যুৎ বর্তনী সুইচ বা কি (Key) যে কোনো স্থানে লাগাতে পারা যাবে।
- বিদ্যুৎ সুইচটি মুদিত অবস্থায় বিদ্যুৎ বর্তনীতে বিদ্যুৎ স্রোত যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের থেকে বিযুক্ত বিদ্যুৎ অগ্রের দিকে প্রবাহিত হয়।
- যখন বিদ্যুৎ সুইচটিকে মুক্ত করা হয়। তখন বিদ্যুৎ স্রোত বর্তনীতে প্রবাহিত হয় না।

সতর্ক সূচনা

- ঘরের মুখ্য বিদ্যুৎ বর্তনীর সহিত সংযুক্ত হয়ে জ্বলতে থাকা বিজলিবাতিকে কোনোদিনও হাতে ধরার চেষ্টা করবে না। কারণ ইহা অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে যার ফলে তোমার হাত পুড়ে যাওয়া সম্ভাবনা থাকে।
- ঘরের মুখ্য বিদ্যুৎ জোগান, জেনারেটার কিংবা ইনভার্টারে পূর্বের মতো বিদ্যুৎ সেল ব্যবহার করতে থাকা পরীক্ষা কোনোদিন করবে না। না হলে বিদ্যুৎ শক বা ধাক্কা খাবে।
- পরীক্ষার সময় কেবল বিদ্যুৎ সেল কিংবা ব্যাটারি ব্যবহার করবে।

চিত্র ১২.১০ একটা বিদ্যুৎ বাল্ব বা বিজলিবাতির চিত্র

চিত্র ১২.১০ বিদ্যুৎ বাল্বে একটা চিত্র ফিলামেন্ট থাকা দেখছ। এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে, ফিলামেন্টটি উত্তপ্ত হয় এবং আলোক প্রদান করে। বিদ্যুৎ বাল্বটি ফিউজ হয়েছে বললে, আমরা বুঝব যে তার ফিলামেন্টটি ছিঁড়ে গেছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুইচ মুদিত থেকেও বিদ্যুৎ বর্তনী মুক্ত হয়েছে, তাই বিদ্যুৎ বাল্বটি জ্বলছে না।

এই বিদ্যুৎ বাল্‌ব অনেক সময় ধরে জ্বললে অত্যধিক উত্তপ্ত হয়। ইহা কেন উত্ত প্ত হয় এসো জানব।

১২.৩ বিদ্যুৎ স্রোতের তাপীয় প্রভাব

তোমাদের জন্যে কাজ ১২.২

একটা বিদ্যুৎ সেল, একট বাল্‌ব, একটা সুইচ এবং কিছু বিদ্যুৎ তার নাও। চিত্র ১২.৯য়ে প্রদর্শিত হওয়ার মতন একটা বিদ্যুৎ বর্তনী তৈরি করো। বিদ্যুৎ সুইচকে মুক্ত অবস্থায় পরিপথে রাখলে বাল্‌বটি জ্বলছে কি? তারপর বাল্‌বটিকে হাতে ধরো। কী অনুভব করছ?

এখন বিদ্যুৎ সুইচকে দু তিন মিনিট মুদিত করে আর একবার বাল্‌বটিকে ছুঁয়ে দেখো। এখন কিছু পার্থক্য অনুভব করছ কি? বিদ্যুৎ সুইচ্‌টিকে মুক্ত করে এরপর বাল্‌বটিকে ছোঁও, কী অনুভব করছ?

তোমাদের জন্যে কাজ ১২.৩

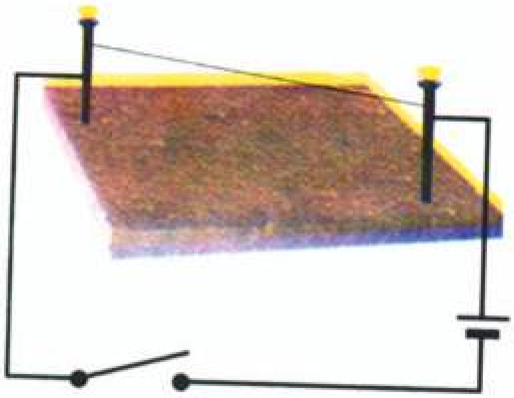

চিত্র ১২.১১

চিত্র ১২.১১-এর মতন একটা বিদ্যুৎ বর্তনী তৈরি করো। এখানে ১০ সেমি লম্বা এক নিক্রোম তারকে দুটি লোহার কাঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে। (এই নিক্রোম তার তুমি বিদ্যুৎ সরঞ্জাম মেরামতির দোকান কিংবা ফেলে দেওয়া অব্যবহৃত হিটার থেকে পেতে পারবে।) বিদ্যুৎ সুইচটি মুক্ত অবস্থায় আছে। এখন এই নিক্রোম তারকে হাতে ধরো। এরপর বিদ্যুৎ সুইচকে দু তিন সেকেন্ডের জন্যে মুদিত কর। পুনরায় সে তারকে ছোঁও (ইহাকে অধিক সময় কোনোদিন ধরবে না)। এখন বিদ্যুৎ সুইচকে মুক্ত করো এবং কয়েক মিনিট পর তারটিকে হাতে ধরো। তোমার অনুভূতি বর্ণনা করো।

নিক্রোম তারটিতে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে তা উত্তপ্ত হয়। ইহাকে বিদ্যুৎ স্রোতের তাপীয় প্রভাব বলা হয়। তুমি ঘরে বা বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হওয়া বৈদ্যুতিক উপকরণগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করো, যেখানে এই বিদ্যুৎ স্রোতের তাপীয় প্রভাব অনুভূত হয়।

১২.১২ বিদ্যুৎ হিটারের চিত্র

রান্না করার সময় সাধারণত কেউ কেউ বিদ্যুৎ হিটার ব্যবহার করেন। সেই হিটারে নিক্রোম ধাতুর এক তার কুণ্ডলী থাকে। বিদ্যুৎ স্রোত এই তার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে কুণ্ডলীটি উত্তপ্ত হয় এবং তাপ প্রদান করে।

তাপের পরিমাণ তার যে পদার্থ থেকে তৈরি তার ওপর নির্ভর করে। আরও তারের দৈর্ঘ্য ও মোটার ওপর নির্ভর করে আমাদের আবশ্যকতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও মোটা তার ব্যবহার করা হয়।

একটা বিদ্যুৎ বাল্‌ব আলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপও দিয়ে থাকে। এই তাপ বিকিরণ দ্বারা শক্তি নষ্ট হয়। এই শক্তি নষ্ট কমানোর জন্যে টিউব লাইট বা সি.এফ.এল এল.ই.ডি (LED) বাল্‌ব ব্যবহার করা উচিত। চিত্র ১২.১৩ দেখো।

কিছু তার এমন ধাতুতে তৈরি যে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে, তা উত্তপ্ত হয়ে গলে যায় এবং ছিঁড়ে যায়, এসো এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করব।

তোমাদের জন্যে কাজ ১২.৪

তোমার জন্যে কাজ ১২.৩-কে আর একবার করব এসো. এখানে একটা বিদ্যুৎ সেলের বদলে চারটি বিদ্যুৎ সেলের একটা ব্যাটারি সংযোগ করো। নিক্রোম তারের বদলে একটা সরু স্টিল তার লাগাও (বাসন মাজার জন্যে ব্যবহৃত স্টিল উল্‌ থেকে একটা তার আনলে হবে)। সেই ঘরে পাখা চলতে থাকলে তার সুইচ্‌কে বন্ধ করো, এখন বিদ্যুৎ বর্তনীর সুইচকে মুদিত করে কিছু সময় অপেক্ষা করো। কী হচ্ছে লক্ষ করো তারটি গলে গেল কি?

স্বতন্ত্রভাবে তৈরি কতক তারে অধিক বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে তারটি সহজে ও তাড়াতাড়ি গলে যায়। এই ধরনের তার বিদ্যুৎ ফিউজরূপে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১২.১৪

ঘরে ব্যবহৃত ফিউজের চিত্র

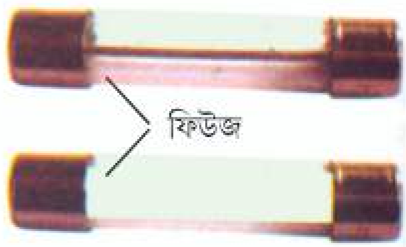

চিত্র ১২.১৫

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত ফিউজ

তোমার ঘরে বা বিদ্যালয়ে কোথায় কোথায় ফিউজ লাগানো আছে তার একটা তালিকা করো। ফিউজ তারের মধ্যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার কিছু হয় না, কিন্তু এই নির্দিষ্ট মাত্রা থেকে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তা উত্তপ্ত হয়ে ছিঁড়ে যায় ফলে বিদ্যুৎ বর্তনীটি মুক্ত হয়ে যায় ও যন্ত্রপাতি সুরক্ষিত থাকে।

সতর্ক সূচনা

- ISI মার্কা থাকা বৈদ্যুতিক উপকরণ ক্রয় করা উচিত।
- ফিউজ লেগে থাকা স্থানে অন্য কোনো ধাতব তার বা বাতি আদৌ ব্যবহার করবে না।
- মুখ্য বিদ্যুৎ বর্তনীর সহিত সংযুক্ত ফিউজের কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা আদৌ করবে না এ বিষয়ে অধিক জ্ঞান আহরণের জন্যে তুমি নিকটস্থ বিদ্যুৎ মেরামতি দোকানে যেতে পারো।

সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর সুপরিবাহী পদার্থের একটা আবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। ইহাকে রোধন বলে। ফলে তারকে হাতে ধরলেও কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু কখনো কখনো বিদ্যুৎ তারের এই রোধন কেটে গিয়ে থাকে। সেই রোধন না থাকা তারের অংশ হাতে ধরলে বিদ্যুৎ ধাক্কা লাগতে পারে। আরও বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতিকে বিদ্যুৎ বর্তনীতে একটা সকেটে সংযুক্ত করলে অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ হেতু সময় সময় তার অধিক উত্তপ্ত হয়ে সেখান থেকে আগুন বেরোতে পারে। আজকাল বাজারে ফিউজের বদলে মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB) ব্যবহৃত হচ্ছে।

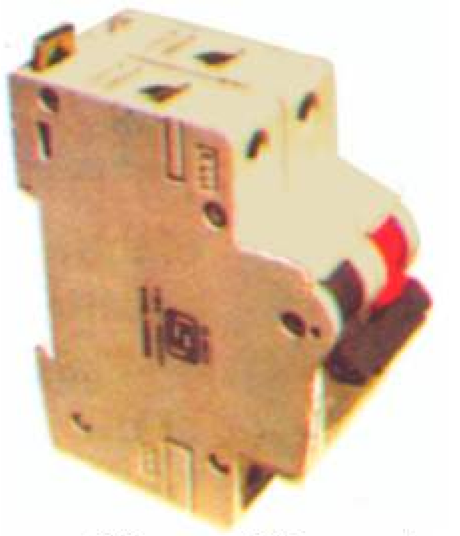

চিত্র১২.১৬ মিনিয়েচর সার্কিট্ ব্রেকার (MCB)

পরিপথে অত্যধিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় ইহা সতত বন্ধ হয়ে যায়। ইহাকে পরে আবার চালু করে বর্তনীকে আবার কার্যক্ষম করা যেতে পারে।

তুমি বিদ্যুৎ স্রোতের তাপীয় প্রভাব কী ও ইহা আমাদের কীভাবে উপকারে লাগে জানলে। এখন এসো বিদ্যুৎ স্রোত অন্য এক প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করব। এটা হচ্ছে চুম্বকীয় প্রভাব।

১২.৪ বিদ্যুৎ স্রোতের চুম্বকীয় প্রভাব—

তোমাদের জন্যে কাজ ১২.৫

একটা দেশলাই খোল সংগ্রহ করো। তার ওপর কয়েকপাক বিদ্যুৎতার জড়িয়ে নাও। এই খোলের মধ্যে একটা সূচী চুম্বক রাখো। খোলের ওপর ঘোরালো তারের শেষ দু মাথাকে বিদ্যুৎ বর্তনীতে চিত্র ১২.১৭-র মতন সংযোগ করো।

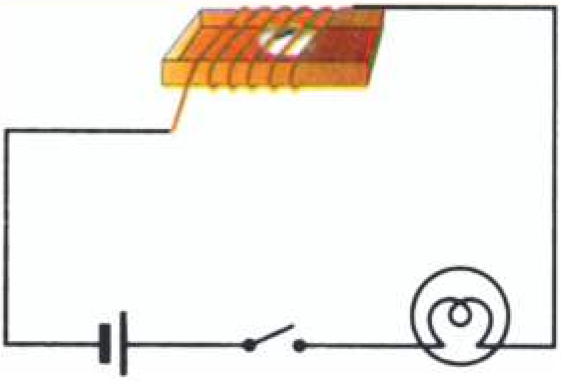

চিত্র ১২.১৭ সূচী কম্পাস ও পরে বিদ্যুৎ স্রোতের প্রভাব।

সূচী চুম্বক কোন্ দিকে থাকছে লক্ষ করো। তার কাছে একটা দণ্ড চুম্বক এনে কী হচ্ছে লক্ষ করো। এরপর দণ্ড চুম্বকটিকে দূরে সরিয়ে দাও। তারপরে বিদ্যুৎ বর্তনীতে সুইচ্‌টিকে মুদিত করলে কী হচ্ছে দেখো। এরকম দু তিন বার সুইচ্ মুদিত ও বন্ধ করে সূচী চুম্বকের গতিকে লক্ষ করো।

সূচী চুম্বক হচ্ছে একটা ছোট চুম্বক। এটা সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিক হয়ে থাকে। এর কাছে একটা চুম্বক আনলে সূচী চুম্বকটি বিক্ষেপিত হয়। আবারও তুমি দেখলে যে বর্তনীতে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময়ে তারটি চুম্বকের মতো কার্য করে। ইহাকে বিদ্যুৎ স্রোতের 'চুম্বকীয় প্রভাব' বলা হয়।

চিত্র ১২.১৮ বৈজ্ঞানিক হান্স ক্রিশ্চিয়ান ও রয়েজ

বৈজ্ঞানিক হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওভার রেজ প্রথমে একটা বিদ্যুৎ বর্তনীর তারে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করে সূচী চুম্বকের বিক্ষেপণ দেখেছিলেন।

আরও বিদ্যুৎ স্রোতকে প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ চুম্বক প্রস্তুত করা হয়। এসো, এ বিষয়ে অধিক জানব।

তোমাদের জন্যে কাজ ১২.৬:

ছয় থেকে ১০ সেমি লম্বা একটা লোহার স্ক্রু এবং ৭৫ সেমি দৈর্ঘ্যের রোধিত বিদ্যুৎ তার সংগ্রহ করো। এই স্ক্রুর গায়ে বিদ্যুৎ তারকে চিত্র ১২.১৯য়ে প্রদর্শিত হওয়া মতো দৃঢ়ভাবে জড়াও এই তারের দু প্রান্তকে বিদ্যুৎ বর্তনীর

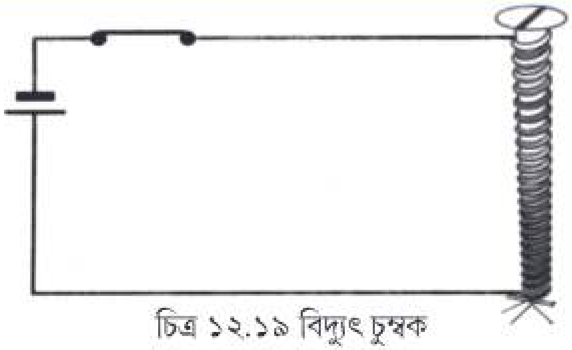

চিত্র ১২.১৯ বিদ্যুৎ চুম্বক

সঙ্গে সংযোগ করো। স্ক্রুর মুখের দিকে কিছু আলপিন রাখো। এখন ওপরের বিদ্যুৎ বর্তনীর সুইচ্‌টিকে মুদিত করলে কী হচ্ছে লক্ষ করো। সে সময়ে স্ক্রুটি পিনগুলোকে আকর্ষিত করবে। সুইচকে মুক্ত করলে কী হচ্ছে লক্ষ করো। এখানে স্ক্রুর ওপরে জোড়ানো হয়ে থাকা তার কুণ্ডলী বিদ্যুৎপ্রবাহের সময়ে চুম্বকের মতো কার্য করছে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হলে, তা আবার তার কুণ্ডলীর রূপে কার্য করছে। এরকম তার কুণ্ডলীকে 'বিদ্যুৎ চুম্বক' বলা হয়।

এই বিদ্যুৎ চুম্বক আবশ্যকতা অনুযায়ী শক্তিশালী করা হয়ে এর সাহায্যে ওজনদার পদার্থ ওঠানো যেতে পারে। ক্রেনের বিষয়ে তুমি আগে পড়েছ, এই ক্রেনের শেষাগ্রে বিদ্যুৎ চুম্বক রাখা হয়ে থাকে। আরও বিদ্যুৎ চুম্বকের ধর্মকে ব্যবহার করে চুম্বকীয় পদার্থ থেকে আলাদা করা যেতে পারে। চোখের ডাক্তাররা চোখে পড়ে থাকা চুম্বকীয় পদার্থকে বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে বের করে দেয়। অনেক রকমের খেলনাতেও এই মূলতত্ত্ব ব্যবহৃত হচ্ছে। তোমার ঘরে ব্যবহৃত হওয়া বৈদ্যুতিক ঘন্টিতেও এমন চুম্বকীয় ব্যবস্থা আছে।

কী শিখলে ?

- বৈদ্যুতিক বর্তনী ব্যবহৃত উপাদানগুলিকে সংকেতের সাহায্যে পরিপ্রকাশ করা যায়।
- যে পথ দিয়ে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হয়, তাকে বিদ্যুৎ পরিপথ বলা হয়। বিদ্যুৎ পরিপথকে সুইচ্‌ ব্যবহার করে মুদিত করা হয়, কিংবা মুক্ত করা হয়।
- কিছু বিদ্যুৎ তারে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে তা উত্তপ্ত হয়, ইহাকে বিদ্যুৎ স্রোতের 'তাপীয় প্রভাব' বলা হয়। এই তাপীয় প্রভাবের অনেক উপযোগিতা আছে।
- স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত কতক বিদ্যুৎ তারে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করলে তা তাড়াতাড়ি গলে, ছিঁড়ে যায়। এই রকম তারের থেকে বিদ্যুৎ ফিউজ তৈরি হয়। এই ফিউজ বিদ্যুৎ বর্তনী ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার থেকে রক্ষা পায়।
- বিদ্যুৎ তারে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে, ইহার চুম্বকীয় প্রভাব অনুভূত হয়ে অন্তরক বা রোধন মুক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারকে কোমল লোহার তার জাড়িয়ে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করলে কোমল লোহাটি বিদ্যুৎ চুম্বকে পরিণত হয়।
- এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় মর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগছে।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো:

(ক) বিদ্যুৎ সেল সংকেত লেখার সময় ছোট রেখাখণ্ড ——— বিদ্যুৎ অগ্রকে বোঝায়।

(খ) বিদ্যুৎ হিটারের সুইচ্‌কে মুদিত করলে ইহা ——— হয়।

(গ) দুই বা ততোধিক বিদ্যুৎ সেল সংযুক্ত হলে তাকে ——— বলা হয়।

(ঘ) বিদ্যুৎ কেটলির ——— অংশটি বিদ্যুৎ স্রোতে প্রবাহিত হলে উত্তপ্ত হয়।

২. ভুল থাকলে সংশোধন করো।

(ক) বিদ্যুৎ বর্তনীতে অধিক মাত্রায় বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হলে ফিউজ তারটি সেরকম থাকে।

(খ) একটা কাঠের বক্সের ওপরে রেখিত বিদ্যুৎ তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করলে তা লোহার গুঁড়োকে আকর্ষণ করবে।

(গ) ব্যাটারির একটা বিদ্যুৎ সেলের যুক্ত বিদ্যুৎ অগ্র অন্য একটি সেলের সহিত সংযুক্ত হয়ে থাকে।

(ঘ) বিদ্যুৎ সেলের সংকেতের বড় দাগটি বিদ্যুৎ অগ্র দর্শিয়ে থাকে।

৩. নিম্ন বিদ্যুৎ অংশগুলির সংকেত লেখো।

(ক) বিদ্যুৎ সেল

(খ) মুক্ত অবস্থায় থাকা বিদ্যুৎ সুইচ্‌

(গ) বিদ্যুৎ বাল্‌ব

(ঘ) বিদ্যুৎ তার

(ঙ) মুদিত অবস্থায় থাকা বিদ্যুৎ সুইচ্‌

(চ) ব্যাটারি

৪. চারটি বিদ্যুৎ সেল একটা কাঠের তক্তার ওপর রাখা হয়েছে। এগুলিকে ব্যবহার করে এক ব্যাটারির বর্তনী অঙ্কন করো।

৫. বিদ্যুৎ স্রোতের যে কোনো দুটি প্রভাবের নাম লেখো।

৬. প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ করো।

(ক) এই বিদ্যুৎ বর্তনীতে বিদ্যুৎ বাল্‌বটি কেন জ্বলছে না?

(খ) এই বিদ্যুৎ বর্তনীতে বাল্‌বটি জ্বলছে চিত্রদ্বারা দর্শাও।

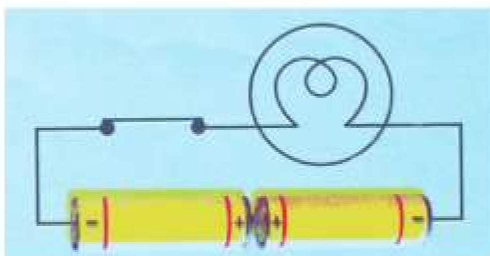

৭. ফিউজ তারের ধর্ম কী হওয়া আবশ্যক?

৮. বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময়ে কেন মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ধাক্কা দেয়?

৯. তোমার ঘরে এসে থাকা ইলেক্‌ট্রিসিয়ান ফিউজ তার বদলে একটা মোটা তামার তার সংযোগ করলে এর সঙ্গে তুমি সহমত কি? তোমার উত্তরের জন্যে ঠিক যুক্তি লেখো।

১০. দুটি দেড় দেড় ভোল্টের সেল, একটা বিজলিবাতি ও একটা সুইচ্ ব্যবহার করে চারটি বিদ্যুৎ বর্তনী নীচে আঁকা হয়েছে। সেগুলি অনুধ্যান করো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুইচ্ মুদিত ও মুক্ত করলে বিজলিবাতির কী হবে লেখো। আবশ্যক হলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করো এবং শিক্ষকের সাহায্য নাও।

(ক)

(খ)

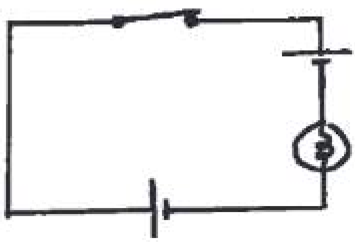

(গ)

(ঘ)

ঘরে করার জন্যে কাজ:

ঘরে চারটি বিদ্যুৎ চুম্বক প্রস্তুত করো। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিদ্যুৎ চুম্বকের যথাক্রমে ২০, ৪০, ৬০ ও ৮০ ঘেরা অন্তরক যুক্ত তার জড়াও। প্রত্যেককে ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত করে পিন গাদার ওপরে রাখো। বিদ্যুৎ বর্তনীকে মুদিত করলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কয়টি করে পিন উঠছে তা খাতায় লিখে রাখো। এর থেকে তুমি কোনো বিদ্যুৎ-চুম্বক অধিক শক্তিশালী জানতে পারবে।

•••

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা

১৩.১ ওড়িশায় হওয়া মহাবাত্যা:

১৯৯৯ সালে অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ তিনদিন ধরে ওড়িশায় ঘটে থাকা প্রলয়ঙ্কারী মহাবাত্যার বিষয়ে তুমি জেনে থাকবে। যদি এ বিষয়ে না জানো তবে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝো। এই বাত্যায় বাতাসের বেগ ঘণ্টা প্রতি ২৬০ কি.মি. ছিল। সমুদ্রের জোয়ার ৯ মিটার উঁচু হয়ে সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে ধেয়ে এসেছিল। ফলে এই বাত্যায় প্রায় ৪৫,০০০ ঘর-বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল এবং সাত লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছিল। ১০ হাজারের বেশি মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল। হাজার-হাজার জীবজন্তু প্রাণ হারিয়েছে। কোটি-কোটি টাকার বন-সম্পদ নষ্ট হয়েছে। আমাদের রাজ্যে কৃষি, গমনা-গমন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। এই মহাবাত্যার সময়ে কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা সংগৃহীত ওড়িশা উপকূলের ফটোচিত্র চিত্র ১৩.১-এ দেখানো হয়েছে। সেটি দেখে শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করো।

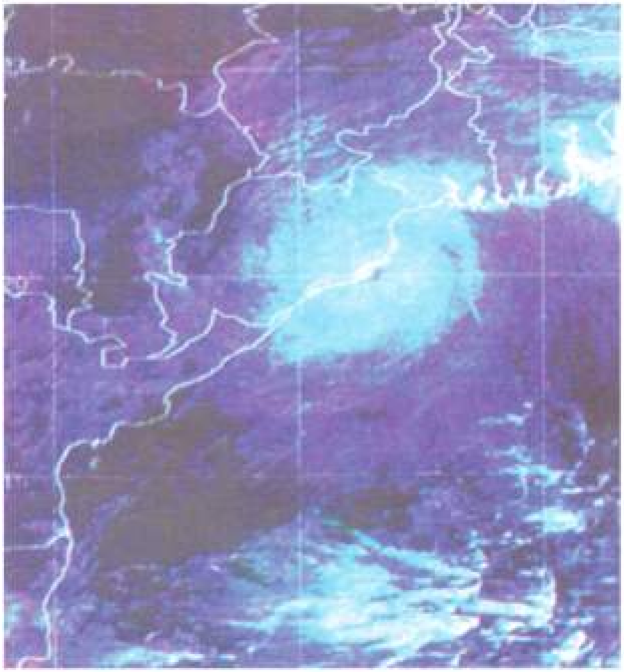

চিত্র ১৩.১: কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা মহাবাত্যা সময়ের সংগৃহীত ওড়িশা উপকূলের ফটোচিত্র।

তাহলে বাত্যা কী? ইহা কীভাবে হয়? এর জন্য কোন কোন কারক দায়ী? এসো এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

১৩.২ বায়ুচাপ দেয়:

সতর্ক সূচনা

এই অধ্যায়ের পরীক্ষাগুলো করার সময়ে কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করতে হলে গুরুজনদের উপস্থিতিতে করা উচিত।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.২:

(ক)

(খ)

চিত্র ১৩.২

(ক) টিনের পাত্রে জল গরম হচ্ছে। **(খ) উত্তপ্ত টিনের পাত্রের উপর ঠান্ডা জল ঢালা হচ্ছে।**

একটা টিনের পাত্রে কিছু জল নাও। পাত্রের মুখকে খোলা রেখে জল ফোটা পর্যন্ত বুনসেন বার্নার স্পিরিট ল্যাম্প দ্বারা উত্তপ্ত করো। পাঁচ থেকে দশ মিনিট জল উত্তপ্ত হওয়ার পরে বায়ু নিরোধক ছিপির সাহায্যে টিনের মুখটিকে ভালোভাবে বন্ধ করো। টিনের পাত্রকে চিমটার সাহায্যে খালি থাকা ধাতব জলের টব কিংবা মুখ ধোয়া বেসিনের উপর রাখো। সঙ্গে সঙ্গে এই টিনের পাত্রের উপরে ঠান্ডা জল ঢালো। কী হচ্ছে লক্ষ করো।

টিনের পাত্রটি ভিতরের দিকে চেপে গিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এমন কেন হল? তুমি যদি টিনের পাত্র না পাও তবে একটা পাতলা প্লাস্টিকের বোতল নাও। তার মধ্যে কিছু গরম জল ঢালো। সঙ্গে সঙ্গে ওই বোতলের ছিপিকে বন্ধ করো। জলের ট্যাপ খুলে ওই বোতলকে সেখানে ধরো। কী হচ্ছে দেখো।

এসো, তোমার কিছু পূর্ব অনুভূতিকে এখানে মনে করব। তুমি কোন্ ঋতুতে ঘুড়ি ওড়াও? এই ঘুড়ি ওড়ানোর সময় তোমার পিছন দিক থেকে আসা বাতাস ওই ঘুড়িকে ওড়াতে সহায়ক হওয়ার কথা জানো নিশ্চয়। সেরকম নৌকাতে যাওয়ার সময়ে যদি বাতাস পিছন দিক থেকে বয় তবে নৌকায় কাত মারায় সুবিধা হয়। ঘর থেকে সাইকেলে বাতাসের বিপরীত দিকে প্যাডেল করে আসার সময়ে তুমি কষ্ট অনুভব করো নাকি? সাইকেলের চাকায় থাকা টিউবে বাতাস ভরে তুমি সাইকেলের চাকাকে চালাও। আর টিউবে অধিক বায়ু ভরে দিলে তা মাঝে মাঝে ফেটে যায়। তবে এই টিউবে মধ্যে থাকা বায়ুর কার্য কী?

এ সব ঘটনার থেকে তুমি জানলে যে, বায়ু চাপ প্রয়োগ করে। এই বায়ুর চাপের জন্যে গাছের পাতা, পতাকা, ব্যানার ইত্যাদি ফড়ফড় করে ওড়ে। তোমার অনুভূতির থেকে আর কয়েকটি এরকম ঘটনার বিষয়ে বন্ধুদের সহিত আলোচনা করো।

এখন তুমি বলতে পারবে কি টিনের পাত্রটি কেন ভেতর থেকে চ্যাপ্টা হয়ে গেল? টিনের পাত্রের উপর ঠান্ডা জল ঢালার ফলে, টিনের পাত্রের ভেতরের বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হল। ফলে টিন পাত্রের ভেতরের চাপ অনেক হ্রাস হল। এবং বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপ তার থেকে অধিক হওয়ায় টিনের পাত্রটি ভেতরের দিকে চেপ্টে গেল।

১৩.৩ অধিক বেগে বাতাস বইলে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.২:

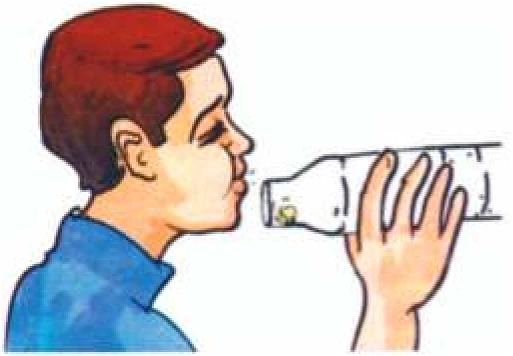

চিত্র ১৩.৩ বোতলের ভেতর ফুঁক দেব

একটা বড় মুখওয়ালা প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ করো, একটা কাগজকে পাকিয়ে চেপে একটা বল তৈরি করো। এই কাগজবলটি খালি বোতলের মুখের থেকে ছোট আকারের হওয়া উচিত। চিত্র ১৩.৩-এ দর্শানো হয়ে থাকার মতো বোতলটিকে ধরে তার মুখের কাছে কাগজবলটি রাখো এখন বোতলের খোলা মুখে খুব জোরে ফুঁ দাও। কী হচ্ছে লক্ষ করো। অধিক জোরে ফুঁ দিলেও কাগজের বলটি বোতলের ভেতরে কেন যাচ্ছে না?

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.৩

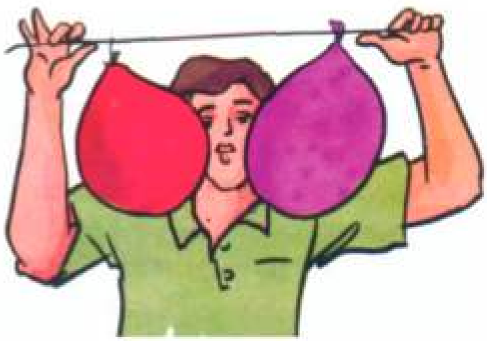

চিত্র ১৩.৪ দুটো বেলুনের মধ্যে ফুঁক দেব

সমান আকৃতির দুটি বেলুন সংগ্রহ করো। এই দুটি বেলুনে অল্প অল্প জল ভর্তি করো। দুটো বেলুনকে এখন ফুঁকে ফোলাও এবং এই অবস্থায় উভয়ের মুখকে দৃঢ়ভাবে বাঁধো। এই দুটো বেলুনকে একটা তার কিংবা সরু লাঠি দিয়ে ৮-১০ সেমি দূরে ঝুলিয়ে রাখো। এই দুটো বেলুনে থাকা ফাঁকা স্থান জোরে ফোঁকো। কী হচ্ছে লক্ষ করো।

তোমাদের জন্য কাজ ১৩.৪

একটা সাদা কাগজ সংগ্রহ করো। তার থেকে ২০ সে.মি লম্বা এবং ৩ সে.মি চওড়া একটা কাগজখণ্ড (Strip)-কে কেটে বের করো। চিত্র ১৩.৫ প্রদর্শিত হওয়ার মতন মুখের কাছে এই কাগজখণ্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তর্জনী লম্বা ধরে রাখো। এখন এই কাগজ-এর টুকরো ওপরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করো। কী হচ্ছে দেখো।

চিত্র ১৩.৫ কাগজের টুকরোর ওপরে ফুঁক দেব

উপরোক্ত তোমার জন্যে কাজ— ২, ৩ ও ৪ যে সব আলোচনা হল, সে বিষয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা শিক্ষকদের সহিত আলোচনা করো। এই আলোচনায় তোমার কী ধারণা হল?

তোমার জন্য কাজ ১৩.২য়ে যখন বোতলের মুখে অধিক জোরে ফুঁকলে, মুখের কাছে থাকা বায়ু অধিক বেগে গেল। ফলে সে স্থানে বায়ুর চাপ কম হয়ে গেল। বোতলের মুখে বায়ুর চাপ অপেক্ষা তার ভেতরের চাপ অধিক হল। ফলে কাগজবলটি ভেতরে গেল না।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.৩-এ দু-বেলুনের ফাঁকে ফুঁ দেওয়ার সময়ে বেলুন দুটি কাছাকাছি চলে আসে। এটা কী করে হল? বেলুন দুটির মাঝখানে ফোঁকার সময় দুই বেলুনের মধ্যভাগের বায়ুর চাপ কমে যায়। বেলুন দুটির বাইরের দিকের বায়ুর চাপ এর থেকে বেশি হওয়ায় বেলুন দুটি কাছাকাছি চলে আসে।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.৪-এ কাগজখণ্ডকে ফোঁকার সময়ে, তা ওপরে উঠে এল। কাগজখণ্ডের ওপরে বায়ুর চাপ কমে যাওয়ায় তলার স্তরের বায়ু অধিক চাপ প্রয়োগ করে তাকে ওপরের দিকে ঠেলে দিল।

আমরা জানলাম, বাতাসের বেগ বাড়লে বায়ুর চাপ কমে যায়।

বাতাস কীভাবে বয়, এটা কীভাবে বৃষ্টি নিয়ে আসে এবং মাঝে মাঝে এটা কীভাবে ধ্বংসকারী রূপ ধারণ করে। এসো, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করব।

আগের থেকে তুমি জানো, বায়ুর গতিশীলতা হওয়াকে বাতাস বলে। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। বায়ুর চাপে অধিক তারতম্য হলে, বায়ু অধিক বেগে গতি করে। প্রকৃতিতে এই বায়ুর চাপের তারতম্য কীভাবে সৃষ্টি হয়? বায়ুর তাপমাত্রা এর জন্যে দায়ী কি? এসো, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করব।

১৩.৪ বায়ু উত্তপ্ত হলে প্রসারিত হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.৫

নলের মুখে বেলুন বাঁধা হয়েছে　　নলটি গরম জলে　　নলটি ঠান্ডা জলে

চিত্র ১৩.৬ উত্তপ্ত বায়ু ওপরে ওঠা

একটা পরীক্ষানালী সংগ্রহ করো। একটা বেলুনের মুখকে টেনে নলের মুখে লাগাও। একে একটা সুতোদ্বারা দৃঢ় করে বাঁধো। একটা বিকারে কিছু গরম জল নাও। এই গরম জলের ভেতরে পরীক্ষানালীটি কিছু সময়ের জন্যে রাখো। বেলুনের আকারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছ কি? এখন পরীক্ষানালীটিকে সেখান থেকে বের করে আনো ও

কিছু সময়ের জন্যে ঠান্ডা করো। একটা বিকারে বরফের মতন ঠান্ডা জল নাও। এর মধ্যে পরীক্ষানালীটিকে কিছু সময়ের জন্যে রাখো। কিছু সময় পরে বেলুনের আকারে কী পরিবর্তন দেখছ? এই পরীক্ষা থেকে তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, গরম জলে পরীক্ষানালীটি রাখলে বেলুন ফুলে যাচ্ছে। এবং ঠান্ডা জলে রাখলে বেলুন সংকুচিত হচ্ছে। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছে বায়ু উত্তপ্ত হলে প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৩.৬

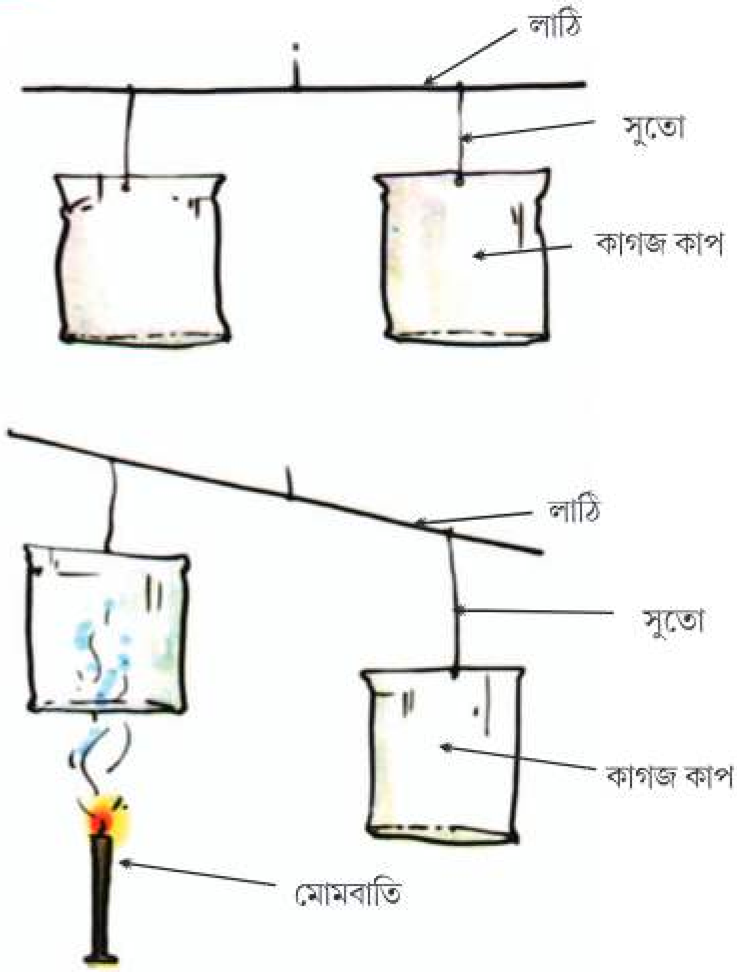

চিত্র ১৩.৭ উত্তপ্ত বায়ু ওপরে ওঠা

সতর্কতা গুরুজনদের উপস্থিতিতে কাজটি করবে। মোমবাতি জালানোর সময় সতর্ক থাকবে।)

সমান আকারে দুটি কাগজের কাপ সংগ্রহ করো। তার মুখ উলটিয়ে সুতোর সাহায্যে চিত্রে দেখানো মতন একটা কাঠের লাঠিতে কিংবা ধাতব রডে ঝোলাও। এই দুটি কাপের মাঝখানটা একটা সুতোর সাহায্যে বাঁধো, যেমন এটা একটা নিক্তির মতো কাজ করে। একটা জ্বলন্ত মোমবাতিকে যে কোনো একটা কাপের নীচে রাখো। কী হচ্ছে লক্ষ করো। উত্তপ্ত হওয়া কাপটি ওপরে উঠে যাবে। এর থেকে তুমি জানবে যে উত্তপ্ত বায়ু ঠান্ডা বায়ুর থেকে হালকা। প্রকৃতিতে এমন ঘটনা সব সময়ে ঘটছে। যেখানে উত্তপ্ত বায়ু ওপরে উঠছে সেখানে বায়ুর চাপ কমে যাচ্ছে এবং তার চারপাশে থাকা ঠান্ডা বায়ু সেইস্থান পূরণ করছে। একে তুমি পরিচলনে পড়েছ।

১৩.৫ বাতাসের স্রোত

পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার তারতম্য হেতু বাতাস প্রবাহিত হয়। এসো এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করব।

(ক) বিষুব রেখা এবং মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রায় তারতম্য

বিষুবরেখা নিকটস্থ অঞ্চল সূর্যের থেকে সর্বাধিক তাপ পেয়ে থাকে। ফলে এ অঞ্চলের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়। এই স্থান পূরণ করার জন্যে প্রায় ১০°-৩০° অক্ষাংশের মধ্যে থাকা ঠান্ডা বায়ু বিষুবরেখা অঞ্চলের দিকে উভয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

মেরু অঞ্চলের বায়ু ৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশ অঞ্চলে থাকা বায়ু অপেক্ষা অধিক ঠান্ডা থাকে এই ৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশ অঞ্চল থেকে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং মেরু অঞ্চলের ঠান্ডা বায়ু এই স্থান পূরণ করার জন্যে এই অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

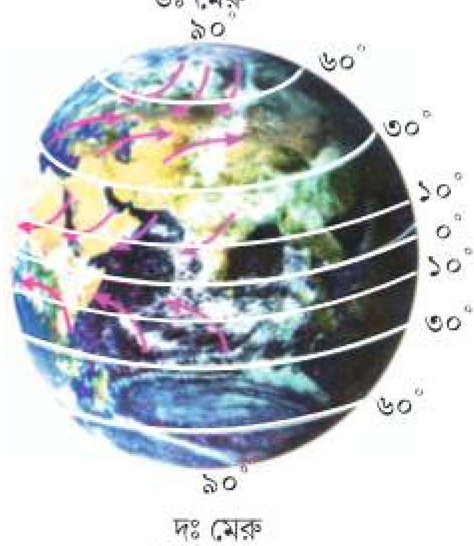

১৩.৮ পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুর প্রবাহ

বায়ু উত্তর-দক্ষিণ দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে কিংবা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হত। কিন্তু পৃথিবীর আবর্তন গতি হেতু এই দিক পরিবর্তন হয়।

(খ) স্থলভাগ ও জলভাগ অসমভাবে উত্তপ্ত হয়:

রোদের দিনে বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থলভাগের বায়ু সেই অঞ্চলে থাকা মহাসাগরের জলভাগ অপেক্ষা তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়ে থাকে। ফলে স্থলভাগ অঞ্চলের বায়ু ওপরে উঠে যায় এবং মহাসাগর অঞ্চল থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে 'মৌসুমী বায়ু' বলা হয়। এই 'মৌসুমী' শব্দটি আরবিক শব্দ 'মউসম্' থেকে আনীত। যার অর্থ ঋতু। কিন্তু শীতের দিনে বায়ুপ্রবাহ এর বিপরীত দিকে হয়। অর্থাৎ এটা স্থলভাগের থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। মহাসাগর থেকে আসা বায়ু অধিক জল ধারণ করে থাকে। ইহা 'জলচক্রের' অংশবিশেষ।

মৌসুমী বায়ু জল ধারণ করে আসে এবং বৃষ্টি করায় শস্য উৎপাদনের জন্যে এটা নিতান্ত আবশ্যক।

বৃষ্টির দিনে চাষি জমিতে কাজ করার সময়ে মেঘ ও বৃষ্টি সম্পর্কিত লোকগীতি গেয়ে থাকে। তাদের কাছে গিয়ে সে সব গান লিখে আনো এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলে গাইতে চেষ্টা করো।

রোদের দিনে রাজস্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবাহে বৃষ্টি হয়। এই বায়ু ভারত মহাসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বয়ে আনে। কিন্তু এই বৃষ্টি সব সময় আরামদায়ক নয়। মাঝে মাঝে অত্যধিক বৃষ্টিপাত আমাদের ক্ষতি করে থাকে। এসো তেমন কয়েকটা প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয়ে এখানে আলোচনা করব।

১৩.৬ বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে ঝড়, বর্ষা ও বাত্যা

তোমরা বর্ষা হওয়ার সময়ে বিদ্যুৎ চমকানো দেখে থাকবে এবং বজ্রপাত শুনে থাকবে। যখন বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়, এখন সেখানে থাকা জলকণাকে ধরে নেয় ফলে ঠান্ডা ও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে। ওপর থেকে আসতে থাকা জলকণাপূর্ণ বায়ুর সহিত নীচের থেকে ওপরে উঠতে থাকা বায়ুর ঘর্ষণ হেতু বিদ্যুৎ ও বজ্র সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে ঝড়বৃষ্টিও হতে পারে। ওপরের শ্রেণীতে তুমি এ বিষয়ে আরও অধিক জানবে।

সতর্কতা:
- বিদ্যুৎ বজ্রপাতের সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার সময় যদি জঙ্গলিস্থানে থাকো, তবে একটা ছোটগাছের গোড়ায় আশ্রয় নেবে।
- কখনও ভূমিতে শুয়ে থাকবে না।
- লোহার বাঁট থাকা ছাতার তলায় ওই সময়ে আদৌ আশ্রয় নেবে না।
- ওই সময়ে জানালার পাশে একদম বসবে না বা দাঁড়াবে না।
- বাস কিংবা কারে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ স্থান।
- জলের ভেতরে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে কাছে থাকা ঘরের ভেতরে চলে আসবে।

এই বিদ্যুৎ বজ্রপাতের সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি কীভাবে বাত্যায় পরিণত হয়, তা তুমি আগের থেকে জানো। এসো এ বিষয়ে অধিক জানব।

তুমি জানো যে জল তরল অবস্থার থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হতে অধিক তাপের দরকার হয়। জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হওয়ার সময়ে তাপ বায়ুমণ্ডলকে ছেড়ে দেয় কি? জল বায়ুমণ্ডল থেকে তাপ গ্রহণ করে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প পুনশ্চ তরল জলে পরিণত হওয়ার সময় এই তাপকে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। ফলে সম্পৃক্ত অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে সেই বায়ু ওপরে উঠে যায় এবং সম্পৃক্ত অঞ্চলের বায়ুর চাপ কমে যায়। তাই ঝড়ের কেন্দ্রের দিকে অধিক বায়ুপ্রবাহ হয়। এই চক্রের পুনারাবৃত্তি হয়। ফলে কেন্দ্রাঞ্চলে খুব কম চাপ বলয় সৃষ্টি হয় এবং তার চারপাশে অধিক বেগে বাতাস ঘুরে বেড়ায়। একে বাত্যা বলে। এর জন্যে বাতাসের বেগ, দিক, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ইত্যাদি কারক দায়ী। আমরা জানলাম সমগ্র ঝড় বৃষ্টি স্বল্প-চাপ জনিত প্রক্রিয়া। বাতাসের বেগ এর জন্যে দায়ী তাই বাতাসের বেগ জানা আবশ্যক। আনিমোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের বেগ মাপা হয়।

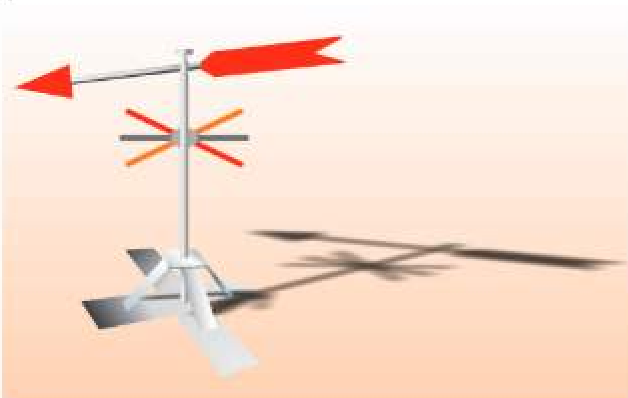

চিত্র ১৩.৯ (ক) বাতাসের দিগদর্শন যন্ত্র

চিত্র ১৩.৯ (খ) আনিমোমিটার

১৩.৭ বাত্যার সময়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ওড়িশায় ১৯৯৯ সালের মহাবাত্যার বিষয়ে আগের থেকে দেওয়া সূচনাকে জনসাধারণ ভ্রূক্ষেপ না করায় ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছিল। এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে এ বিষয়ে সূচনা দেওয়া হয়েছে। এসো এই বাত্যা সম্পর্কিত কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে আলোচনা করব।

- বাত্যার বিষয়ে অগ্রিম সূচনা জনসাধারণকে জানানো এবং সতর্কতামূলক সেবা প্রদান করা।
- জনসাধারণ, বন্দরসমূহ, মৎস্যজীবী, জাহাজ ইত্যাদিকে আগের থেকে সতর্ক সূচনা প্রদান করা।
- পূর্বে নির্মিত বাত্যা আশ্রয়স্থলীতে জনসাধারণকে যথাশীঘ্র আশ্রয় দেওয়া।

জনসাধারণের কর্তব্য:

- টি.ভি, রেডিও এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জলবায়ু বিভাগ জুগিয়ে দেওয়া সতর্ক তথ্যকে (সূচনাকে) অমান্য না করা।
- নিজের আসবাবপত্র, যানবাহন, গৃহপালিত পশুকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত।
- জলপূর্ণ রাস্তায় গাড়ি চলাচল করা অনুচিত।
- স্থানীয় পুলিশ, স্টেশন, অগ্নি নির্বাপক সংস্থা প্রশাসনিক কর্মচারী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ফোন নম্বর কাছে রাখা উচিত।

বাত্যা অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্তব্য:

- সংক্রমিত জল একদম পান করবে না। নিজের পরিবারের জন্যে পানীয়জল অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করে রাখা উচিত।
- ভিজে বিদ্যুৎ সুইচ এবং ভেঙে যাওয়া বিদ্যুৎ খুঁটি স্পর্শ করবে না।
- বাইরে ঘোরা অনুচিত।
- উদ্ধারকারীদের অনাবশ্যক সাহায্য চাইবে না।
- নিজের বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক রেখে চলতে চেষ্টা করবে।

পূর্বে যেমন প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে লোকেরা অধিক সংখ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হত, তেমনি অবস্থা আর নেই।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও রাডার সেবার মাধ্যমে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বেই বাত্যার বিষয়ে অধিক সূচনা গণমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে। সরকারি কলও অধিক সক্রিয় হয়ে প্রশাসনিক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের সজাগ রাখছেন ফলে বনজীবন সুরক্ষিত হতে পারছে।

- রাডার ও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বাত্যা সম্পর্কে পূর্ব সূচনা পাওয়া যাচ্ছে।

ফ্লো চার্ট

দুটি অঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য

↓

বায়ুতে তাপপ্রবাহের পরিচলন প্রক্রিয়া আরম্ভ।

↓

উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠে লঘুচাপ অঞ্চল সৃষ্টি।

↓

উত্তপ্ত বায়ু ওপরে উঠে ঠান্ডা হয় এবং জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে।

↓

মেঘের থাকা বড় বড় জলকণা ভূপৃষ্ঠের বর্ষা এবং বরফরূপে আসে।

↓

জলকণা তলায় পড়তে থাকার সময় তলা থেকে ওপরে উঠতে থাকা বায়ুর ঘর্ষণ হেতু বিদ্যুৎ বজ্রপাত জনিত ঝড় বর্ষা হয়।

কী শিখলে:

- আমাদের চারপাশে থাকা বায়ুর চাপ আছে।
- বায়ু উত্তপ্ত হলে প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়।
- বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে গেলে সে স্থানে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং সে স্থান পূরণ করার জন্যে ঠান্ডা অঞ্চল থেকে বায়ুপ্রবাহিত হয়ে থাকে।
- গতিশীল বায়ুকে বাতাস বলা হয়।
- পৃথিবীপৃষ্ঠে অসমান তাপ সঞ্চারণ হেতু বায়ুপ্রবাহ সম্ভব হয়।
- জলীয় বাষ্প ধারণ করে থাকা বায়ু বৃষ্টি করায়।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) গতিশীল বায়ুকে — বলা হয়।

(খ) পৃথিবীপৃষ্ঠে অসমান তাপ সঞ্চারণ হেতু — প্রবাহ হয়।

(গ) জলীয় বাষ্প ধারণ করে থাকা — বৃষ্টি করায়।

(ঘ) বায়ু — চাপ অঞ্চল থেকে — অঞ্চলে প্রবাহিত হয়।

২. ভুল থাকলে ঠিক করো।

(ক) গরম কালে বাতাস স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়।

(খ) শীতের দিনে বাতাস স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়।

(গ) ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বাত্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. তোমার পাঠ্যপুস্তকে না থাকা দুটি অনুভূতি বর্ণনা করে দেখাও যে বায়ুর চাপ প্রদান করে।

৪. রাস্তার ধারে লাগানো থাকা কাপড়ের তৈরি ব্যানারের বিভিন্ন অংশে ফুটো কেন করা হয়?

৫. একটা স্থানের বাতাসের দিক জানার জন্যে দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৬. তোমার বাবা একটা ঘর কিনতে চাইছেন, সে ঘরে জানালা আছে কিন্তু স্কাইলাইট নেই। এমন ঘর কেনা উচিত কি? কেন বোঝাও।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

১. সমান আকারের দুটো প্লাষ্টিক বোতল সংগ্রহ করো। প্রত্যেক বোতলের মুখে একটা করে বেলুন লাগাও। এর থেকে একটাকে ছাওয়াতে ও অন্যটিকে রোদে রেখে দাও। কিছু সময় পরে কী দেখলে মাথায় লিখে রাখো এবং বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

২. ১৫ সে.মি দৈর্ঘ্য ও ১ সে.মি থেকে ১.৫ সে.মি ব্যাস বিশিষ্ট একটা আলুমিনিয়াম নল সংগ্রহ করো। একটা মাঝারি আকৃতির আলু আনো। একে মাঝখান থেকে দুভাগ করো। যেন প্রত্যেক ভাগের গোলাকার ২ সে.মি হয়। এখন এক ভাগ আলু ওপরে নলের একটা মাথা সোজা রেখে আলুর ভেতর চাপ এবং নালীকে দু-তিন বার ঘোরাও, এর পর নালীটিকে বের করে আনো। তুমি দেখবে যে, আলুর একটা খণ্ড নলের মুখে পিষ্টনের মতন লেগে আছে। নলের অন্য মাথায়ও এভাবে একটা আলুর খণ্ড লাগাও। এর দ্বারা নালীর দুটো মাথা আলুর সাহায্যে পিষ্টনের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এখন নালীর ভেতরে কী আছে? একটা না কাটা পেনসিল নিয়ে, তার সাহায্যে নলের একটা মাথায় লেগে থাকা আলুর খণ্ডকে ঠেলো এবং দেখা কী হচ্ছে। নলের অন্য মাথায় লেগে থাকা আলুর খণ্ডটি বাইরে বেরিয়ে এল কি? এরকম কেন হচ্ছে চিন্তা করে লিখে রাখো এবং বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকের সহিত আলোচনা করো।

সতর্কতা: এই কার্য করার সময়ে সাবধান হবে যেন নলটি আলুকে ফাটিয়ে কারও শরীরে না লাগায়।

●●●

চতুর্দশ অধ্যায়

আলোক

১৪.১. উপক্রম

তোমার ঘরের সব জানালা কপাট বন্ধ থাকা অবস্থায় একটা সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়ে আসা সূর্যালোক বা সূর্যকিরণ তুমি দেখে থাকবে। আরও রাতে টর্চলাইট, স্কুটার, কার, বাস, ট্রাক থেকে আসা আলোর গুচ্ছকে এবং ট্রেনের ইঞ্জিনের সম্মুখভাগে থাকা শক্তিশালী আলোক উৎস থেকে আলোক আসা দেখেছ। তোমাদের মধ্যে যারা পারাদ্বীপ বা গোপালপুর বন্দরে রাতে ঘুরতে গেছ, সেখানে বাতিঘর থেকে আসা শক্তিশালী আলোকগুচ্ছ যে কোনো দিকে ঘুরতে দেখে থাকবে। আরও যারা ভুবনেশ্বর বিমান বন্দরে রাতে গিয়ে থাকবে সেখানে উঁচু টাওয়ারে সেরকম আলোকের গুচ্ছ বেরোতে দেখে থাকবে। এসব অনুভূতির থেকে তুমি কী জানতে পারছ? এসো এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করব।

১৪.১. আলোক এক সরল রেখায় গতি করে।

রাতে রেল ইঞ্জিন থেকে আসা আলো

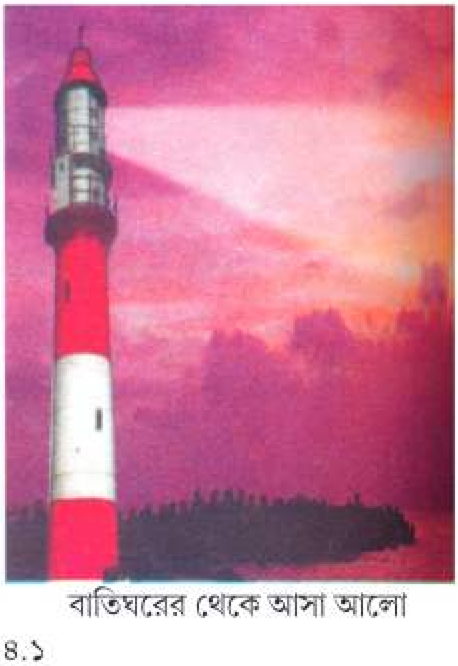
বাতিঘরের থেকে আসা আলো

চিত্র ১৪.১

তোমাদের জন্যে কাজ ১৪.১

একটা সোজা এবং অন্য একটা বাঁকা প্লাস্টিকের নল সংগ্রহ করো। টেবিলের ওপর জ্বলতে থাকা মোমবাতিকে সোজা নল দিয়ে দেখো। আবার বাঁকা নল দিয়ে দেখো তুমি উভয় পরীক্ষার থেকে কী জানলে? তুমি সোজা নল দিয়ে মোমবাতিটিকে দেখতে পেয়ে থাকবে, কিন্তু বাঁকা নল দিয়ে মোমবাতিটিকে একদমই দেখতে পারবে না।

চিত্র ১৪.১

(একটা সোজা নালী এবং বাকাঁ নালীতে মেমবাতির আলোকে দেখা)

এর থেকে তুমি জানলে যে আলোক এক সরলরেখায় গতি করে।

আলোকের গতিপথকে বদলানো যাবে কি?

আলোক মসৃণ পৃষ্ঠের ওপর পড়লে তা কি হয়? এসো সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করব।

১৪.৩ আলোকের প্রতিফলন:

এসো একটা মসৃণ স্টিল প্লেট কিংবা স্টিল চামচ নিয়ে এই পরীক্ষা করব। তুমি দেখবে সে এখানে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ইহা আলোকের গতির দিক্ বদলাতে পারে। জলের পৃষ্ঠও আয়নার মতন কাজ করে এবং আলোকের দিক পরিবর্তন করে। পুকুরের জলে পুকুরের কুলে থাকা গাছ কিংবা পাকাঘরের প্রতিবিম্ব দেখে থাকবে।

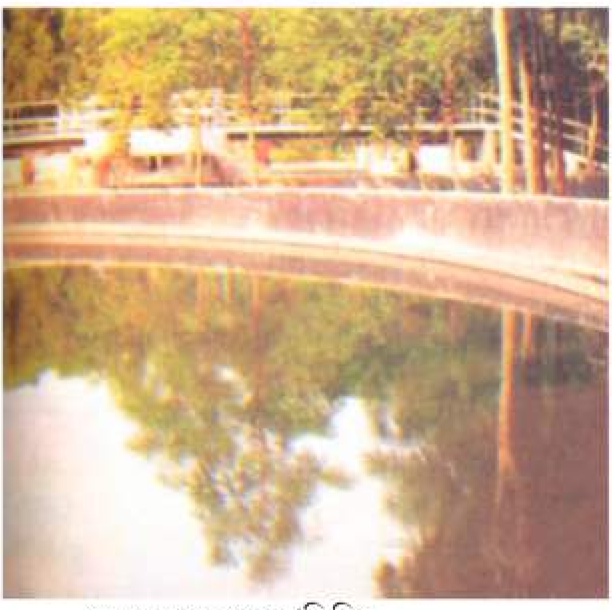

১৪.৩ জলে বস্তুর প্রতিবিম্ব

১৪.৪ জলে সিংহের প্রতিবিম্ব

পঞ্চতন্ত্রের থেকে তোমরা সিংহ, খরগোশের গল্প শুনে থাকবে, এখানে একটা খরগোশ সিংহকে কুয়োর জল সিংহকে দেখতে বলল। সিংহ নিজের প্রতিবিম্বকে জলে দেখে অন্য একটা সিংহ থাকার ধারণা করে নিল।

যে কোন মসৃণ পৃষ্ঠ একটা আয়নার মতন কাজ করে। আয়নার ওপর আলো পড়লে কী হয়? এটা তোমরা পূর্ব শ্রেণীতে পড়েছ।

তোমাদের জন্য কাজ:

১৪.২ একটা সমতল দর্পণ নাও। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সূর্যালোককে দর্পণের সাহায্যে ঘরের দেওয়ালে ফেলো। আয়নার সাহায্যে আলোকের গতিপথের কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে নিজে করে দেখো। আলোক দর্পণের ওপর পড়লে তার গতিপথ পরিবর্তন হয়। একটা পৃষ্ঠের সাহায্যে আলোকের এভাবে দিক পরিবর্তনকে আলোকের প্রতিফলন বলা হয়। এসো সে বিষয়ে অধিক জানব।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৪.৩:

একটা ড্রইং বোর্ড নাও। তার ওপর একটা চার্ট কাগজ লাগাও। চার্ট কাগজের ওপর লম্বাভাবে একটা সমতল দর্পণ রাখো। একটা টর্চের কাচের মুখকে চার্ট কাগজের দ্বারা বন্ধ করো। এই কাগজে তিনটি ছোট রন্ধ্র করো। এখন টর্চের চিত্র ১৪.৫য়ে দেখানোর মতো আলো ফেলো যেন তা ড্রইং বোর্ডে চার্ট কাপজের ওপর পড়ে।

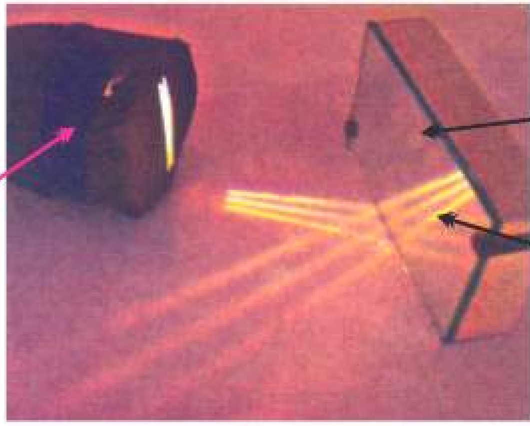

চিত্র ১৪.৫ আয়নার আলোকের প্রতিফলন

এরপর টর্চকে এমন ভাবে রাখো যেন এক কোণ করে সমতল দর্পণের ওপরে আলো ফেলে। এ ক্ষেত্রে তুমি কী লক্ষ করলে? টর্চকে সমতল দর্পণের সম্মুখে এদিক ওদিক করে দর্পণের ভেতর স্লিট (ছোট রন্ধ্র)কে দেখার চেষ্টা করো। দর্পণের এটা আলোকিত স্লিটের প্রতিবিম্ব।

মনে রাখ: তুমি বস্তুকে কীভাবে দেখো? আলোক নিজে অদৃশ্য। কিন্তু আলোক বস্তুর ওপরে পড়লে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে পড়লে তুমি বস্তুকে দেখতে পাও।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৪.৪

এসো অধিক পরীক্ষা করে এ বিষয়ে জানব।

সতর্ক সূচনা: জ্বলতে থাকা মোমবাতিকে সতর্কতার সঙ্গে ধরো। শিক্ষক বা গুরুজনদের উপস্থিতিতে এ কার্যটি সম্পন্ন হওয়া ভালো।

একটা বড় সমতল দর্পণ সংগ্রহ করো। তার সম্মুখে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রাখো। দর্পণের ভেতরে মোমবাতির শিখাকে দেখার চেষ্টা করো। দর্পণের পেছনে দিকে একটা মোমবাতি জ্বলতে থাকা দেখা যাবে।

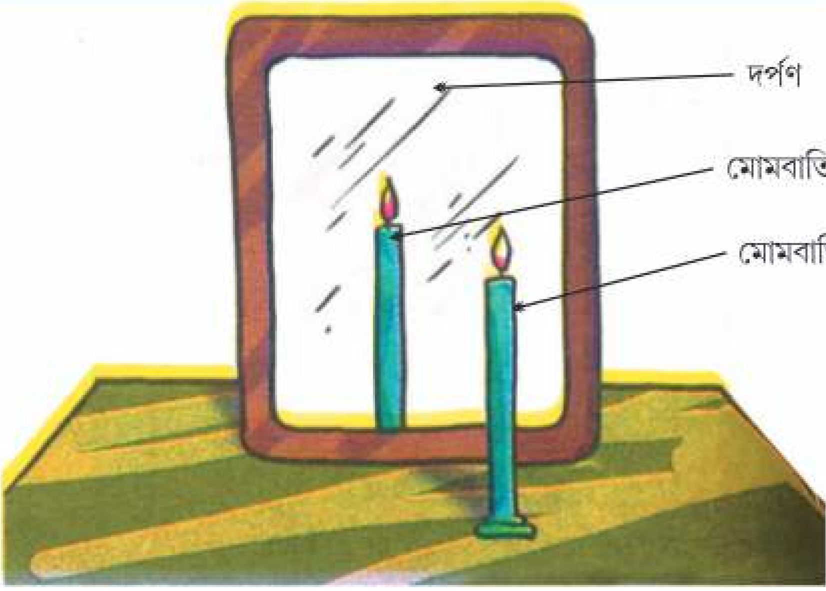

চিত্র ১৪.৩ সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

দর্পণের পেছন দিকে যে মোমবাতি দেখছ, তা দর্পণ সম্মুখে থাকা মোমবাতির প্রতিবিম্ব। এখন মোমবাতিকে বিভিন্ন স্থানে এবং দুরতায় রেখে দর্পণ গঠিত হওয়া প্রতিবিম্বদের লক্ষ্য করো।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বগুলি সোজা কি? মোমবাতির শিখা প্রতিবিম্বর ওপরে আছে কি? এ প্রকার প্রতিবিম্বকে সোজা প্রতিবিম্ব বলা হয়। সমতল দর্পণে গঠিত হয়ে থাকা প্রতিবিম্ব সোজা ও সমান উচ্চতা বিশিষ্ট।

দর্পণের পেছন দিকে একটা সাদা পরদা রাখো। এই পরদায় মোমবাতির প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে কি? তার পরে সাদা পরদাকে দর্পণ ও মোমবাতির মাঝখানে রাখো। পরদায় তুমি প্রতিবিম্ব দেখতে পারবে কি? তুমি কোনো দিনও এই মোমবাতির প্রতিবিম্ব পরদায় ধরতে পারবে না। সমতল দর্পণের গঠিত প্রতিবিম্বকে পরদায় ধরা যায় না। তাই এমন প্রতিবিম্বকে অবাস্তব বা অমদ প্রতিবিম্ব বলা হয়। সমতল দর্পণ থেকে প্রতিবিম্ব কতদুরে সৃষ্টি হয়, এসো সে বিষয়ে জানব।

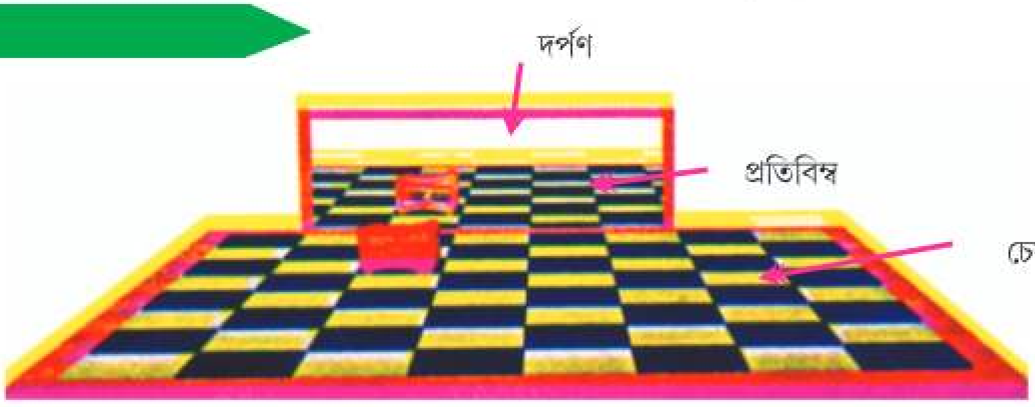

দর্পণ চিত্র ১৪.৭ সমতল দর্পণের প্রতিবিম্ব গঠন

একটা সাদা ড্রইং কাগজে ৬৪ (৪৮ × ৮) বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো। একটা চেস্ বোর্ড নিয়ে এ পরীক্ষা করা যেতে পারে। এর মধ্য ভাগে একটা মোটা দাগ দাও। একটা সমতল দর্পণ এই দাগের ওপর লম্বভাবে রাখো। একটা পেনসিল কাটার দর্পণ থেকে তৃতীয় ক্ষেত্রের ওপর রাখো। দর্পণে গঠিত হওয়া প্রতিবিম্বের স্থান নিরূপণ করো।

বর্তমান কাটারকে চতুর্থ ও পঞ্চম ক্ষেত্রে রেখে তাদের প্রতিবিম্বের স্থান নিরূপণ করো। তুমি এখন পেনসিল কাটারের দর্পণ থেকে দূরতার মধ্যে কিছু সম্পর্ক পাচ্ছ কি?

তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌছবে যে, সমতল দর্পণের প্রতিবিম্বের দর্পণ থেকে দূরত্ব বস্তুর দর্পণ থেকে দূরত্বের সহিত সমান।

১৪.৪ দক্ষিণ না বাম।

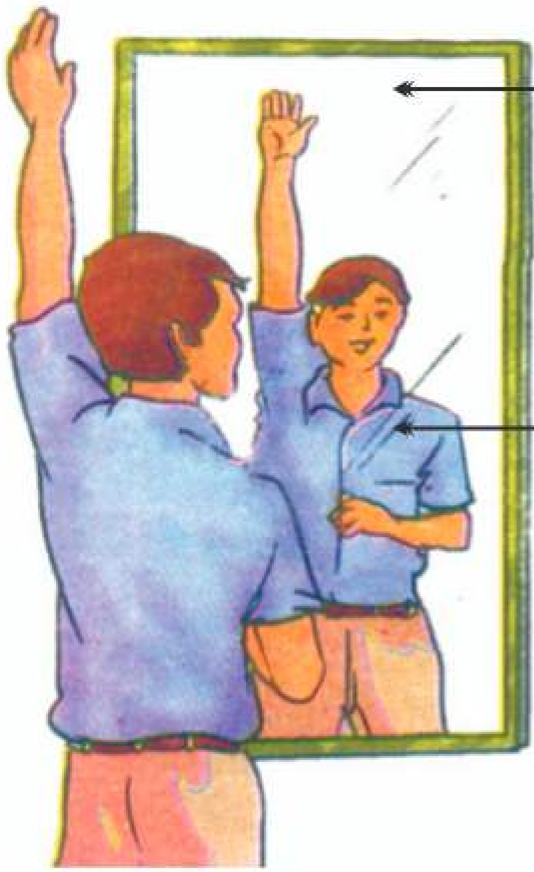

চিত্র ১৪.৮ বাম হাত দক্ষিণ হাতের মতো দেখা যাবে।

তুমি সমতল দর্পণের সম্মুখের দাঁড়িয়ে কোনোদিন নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছ কি? এই প্রতিবিম্ব ঠিক তোমার মত দেখতে কি? তুমি প্রতিবিম্ব ও তোমার মধ্যে একটা কৌতূহলপ্রদ পার্থক্য লক্ষ করেছ কি? এসো সে বিষয়ে এখানে জানব। চিত্র ১৪.৮ দেখো

তোমাদের জন্যে কাজ ১৪.৬:

একটা সমতল দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখো। এখন নিজের বাম হাত ওপরে ওঠালে তোমার প্রতিবিম্বর কোন হাত উঠছে লক্ষ করো। এখন তুমি তোমার দক্ষিণ কান ধরো। প্রতিবিম্বের তুমি কোন কান ধরেছ দেখো। এখান থেকে তুমি জানলে যে তোমার বাম হাতটা দর্পণের ডান হাতের মতো, এবং ডান কান ধরা দর্পণের বাম কান ধরার মতো জানা যায়। কেবল এখানে পার্শ্ব পরিবর্তন হচ্ছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়ানোর সময়ে তোমার প্রতিবিম্বর মাথা কোনোদিন নীচের দিকে থাকে না বা পা কোনোদিন ওপরে ওঠে না।

এখন তুমি P অক্ষরটি একটা কাগজে লিখে দর্পণের সম্মুখে রাখো। এটা কোন ইংরাজি অক্ষরের মতন দেখা যাচ্ছে। ইহা q অক্ষরের মতন জানা যাবে। তোমার নাম কাগজে লিখে দর্পণের সম্মুখে দেখাও। এটা কেমন দেখা যাচ্ছে? তুমি আম্বুলেন্স গাড়ির সম্মুখে 'AMBULANCE' কেমন লেখা যায় তা চিত্র ১৪.৯ দেখো। এটা এমন কেন লেখা হয়। এসো সে বিষয়ে জানব।

চিত্র ১৪.৯ আম্বুলেন্সের চিত্র

তুমি আকস্মিক দুর্ঘটনা বা রোগীকে মুমূর্ষু অবস্থায় অম্বুলেন্সে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া দেখে থাকবে। আগে যাওয়া গাড়িচালক এই ভিন্ন ঢঙের 'ƎƆИA⅃UBMA' লেখাকে 'AMBULANCE' রূপে নিজের দর্পণে দেখে। ফলে আম্বুলেন্স গাড়িকে আগে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

- সমতল দর্পণের প্রতিবিম্ব দর্পণের পেছন দিকে দেখা যায়।
- প্রতিবিম্ব বস্তুর মতো সোজা ও সমান উচ্চতাবিশিষ্ট।
- বস্তুর দুরত্ব প্রতিবিম্বর দুরতের সহিত সামান।
- প্রতিবিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন হয়ে থাকে।
- প্রতিবিম্ব অমদ, আভাসী।
- তোমার স্কুটার বা কারে যে দর্পণ লাগানো থাকে, তাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব ছোট দেখা যায়। এমন কেন দেখায়, কোনোদিন ভেবেছ কি? এসো সে বিষয়ে অধিক জানব।

১৪.৪ গোলাকার দর্পণ (Spenical Mirror)

তুমি একটা স্টিলের থালা মুখের সামনে ধরে সেখানে তোমার প্রতিবিম্বকে দেখো। এই প্রতিবিম্ব সমতল দর্পণে সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্বর মতন নয় কি? এটা বড় স্টিল চামচ নিয়ে তার ভেতর পার্শ্ব এবং বাইরের পার্শ্বে নিজের প্রতিবিম্ব দেখো। এখানে সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্বের ধর্মগুলি খাতায় লিখে রাখো। এ বিষয়ে পরীক্ষা করে অধিক জানব।

তোমাদের জন্যে কাজ:১৪.৭

একটা স্টিলের বড় চামচ নাও। তার বাইরের পার্শ্বকে তোমার মুখের কাছে রাখো এখানে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে, তা সমতল দর্পণে সৃষ্টি হয়ে থাকা প্রতিবিম্বর মতো কি?

চিত্র ১৪.১০স্টিল চামচের বাইরের পার্শ্বে প্রতিবিম্ব গঠন।

এই স্টিল চামচের ভেতরের পার্শ্বকে মুখের সামনে রেখে প্রতিবিম্ব দেখো। এখানে নিশ্চয়ই এক সোজা থেকে এবং তোমার আকার থেকে বড় আকারের প্রতিবিম্ব দেখবে।

১৪.১১ স্টিল চামচে ভেতর পার্শ্বের প্রতিবিম্ব গঠন

যদি তুমি তোমার মুখের থেকে চামচের দূরতা বাড়াবে, তাহলে তুমি দেখবে যে, এখানে একটা উলটো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে। তোমার এই পর্যবেক্ষণগুলিকে খাতায় একটা সারণী করে লেখো।

সারণী ১৪.১ সারণী ১৪.১ প্রতিবিম্ব প্রতিফলন

ক্র নং	প্রতিফলনের নাম	প্রতিবিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি
১	স্টিল প্লেট	সোজা, সমান উচ্চতাবিশিষ্ট অমদ ও পার্শ্ব পরিবর্তন হয়ে থাকে।
২	স্টিল চামচের বাহ্য পার্শ্ব	
৩	স্টিল চামচের ভেতর পার্শ্ব	

উভয় স্টিল চামচের বক্র মসৃণ অংশ একটা আয়নার মতন কাজ করল। এরকম আয়নাকে গোলাকার দর্পণ বলা হয়। এই গোলাকার দর্পণ দুপ্রকারের যথা: অবতল (Concave) দর্পণ ও উত্তল (Convex) দর্পণ।

যে প্রতিফলকের প্রতিফলন করতে থাকা পৃষ্ঠ অবতল, তাকে অবতল দর্পণ বলা হয়। ইহা সামনের দিক বক্র হয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। [চিত্র ১৪.১২(ক)]

সে রকম যে প্রতিফলকের প্রতিফলন করতে থাকা পৃষ্ঠ উত্তল, অর্থাৎ সম্মুখ পৃষ্ঠতল বক্র হয়ে ওপরে উঠে থাকে, তাকে উত্তল দর্পণ বলা হয়। [চিত্র ১৪.১২ (খ)]

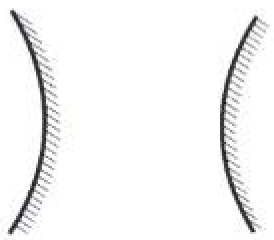

চিত্র ১৪.১২ উত্তল ও অবতল দর্পণের রেখাচিত্র

উত্তল ও অবতল দর্পণকে কেন বর্তুলাকার দর্পণ বলা হয়? এসো সে বিষয়ে জানব।

একটা ফাঁপা রবারের বল সংগ্রহ করো। একে ছুরির সাহায্যে দুভাগ করো। (চিত্র ১৪.১৩ (ক) ও (খ)) (বলকে কাটতে শিক্ষকের সাহায্য নাও।) ইহার ভেতরের পৃষ্ঠতল অবতল এবং বাইরের পৃষ্ঠতল উত্তল

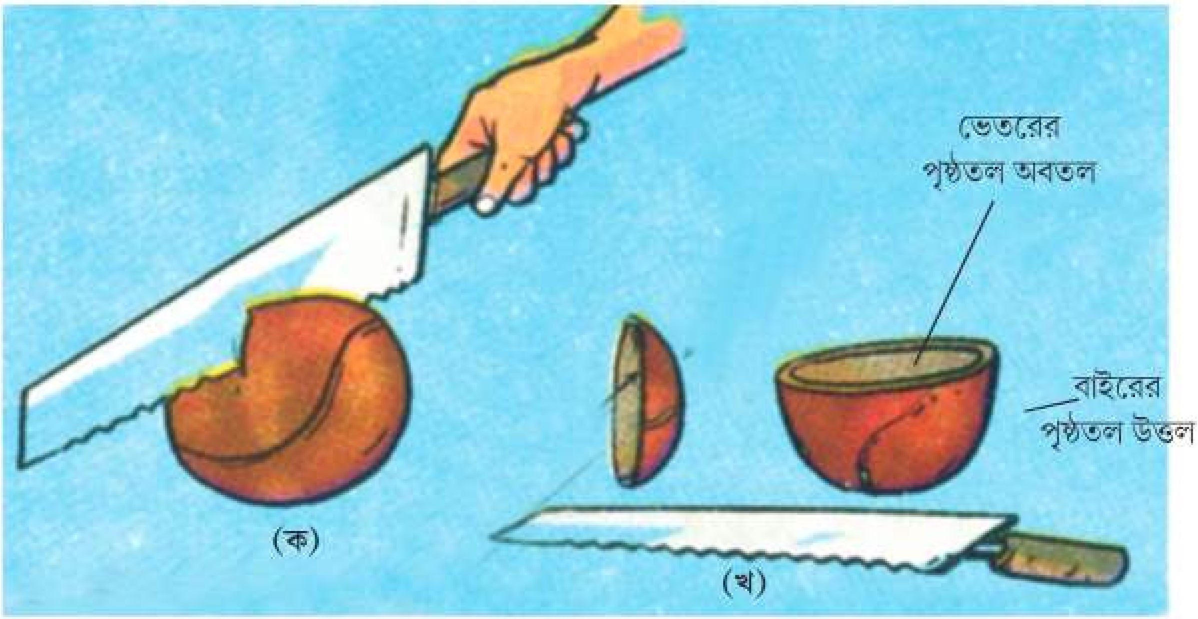

চিত্র ১৪.১৩ বর্তুলাকার দর্পণ এক ফাঁপা গোলাকার অংশবিশেষ।

তুমি জানো, সমতল দর্পণে সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্ব পরদায় ধরা যায় না। এসো আমরা এখানে অবতল দর্পণে কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে জানব।

তোমার জন্যে কাজ ১৪.৮

সতর্ক সূচনা: সূর্যকে খালি চোখে সোজা দেখো না। এমন করলে তোমার চক্ষু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি সূর্যের প্রতিবিম্বকে ঘরের দেওয়ালে বা পরদায় ফলে দেখতে পারবে।

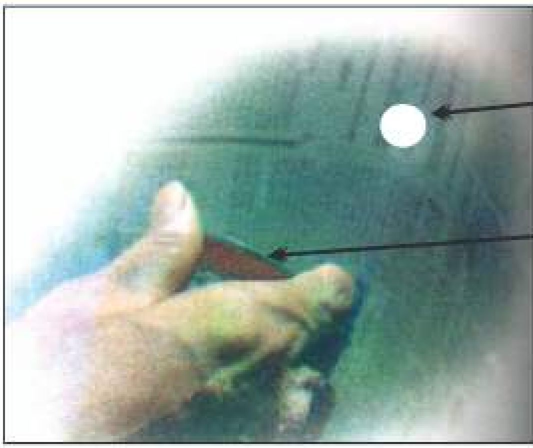

চিত্র ১৪.১৪ অবতল দর্পণে সূর্যের বাস্তব প্রতিবিম্ব।

একটা অবতল দর্পণ নাও। সূর্যের দিক এর মুখ রেখে সূর্যকিরণকে একটা পাতলা কাগজের ওপর ফেলতে চেষ্টা করো। কাগজের ওপর একটা উজ্জ্বল গোলাকার স্থান দেখবে।

এই উজ্জ্বল স্থানটি সূর্যের প্রতিবিম্ব, এখানে প্রতিবিম্বকে কাগজের ওপর ধরা হল। অবতল দর্পণের আগে একটা মোমবাতি জ্বেলে তার প্রতিবিম্ব পরদায় ধরতে চেষ্টা করো। চিত্র (১৪.৫) দেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৫.৯

(ক) নিকট প্রতিবিম্ব (খ) দূরের প্রতিবিম্ব

চিত্র ১৪.১৫ অবতল দর্পণের বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন

একটা অবতল দর্পণ নাও। ইহাকে একটা স্ট্যান্ডে ধরে রাখো। একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে তার ওপর একটা সাদা কাগজ লাগাও। এটা একটা পরদার মতন কাজ করবে। টেবিলের ওপরে দর্পণ থেকে ৫০ সে.মি দূরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখো। পরদার ওপর সেই মোমবাতির স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পরদার সৃষ্টি হওয়া দেখবে। এটা বাস্তব না অবাস্তব? ইহা মোমবাতির শিখার সঙ্গে সমান আকার কি?

বর্তমান মোমবাতিকে দর্পণের দিকে সরিয়ে এনে ভিন্ন ভিন্ন দূরতায় রাখো। প্রত্যেক অবস্থায় একটা করে প্রতিবিম্ব পেতে চেষ্টা করো। সিদ্ধান্তগুলিকে সারণী ১৪.২-তে লেখো।

সারণী ১৪.২ প্রতিবিম্ব গঠন:

ক্রঃ নং	দর্পণ থেকে মোমবাতির দূরত্ব সেমিতে	প্রতিবিম্ব বস্তুর থেকে বড় ছোট	প্রতিবিম্বর ধর্ম
১	৫০		
২	৪০		
৩	৩০		
৪	২০		
৫	১০		
৬	৫		

মোমবাতিকে অবতল দর্পণের একদম কাছাকাছি রেখে পরদাতে তার প্রতিবিম্ব দেখতে চেষ্টা করো। চিত্র ১৪.১৬ দেখো।

চিত্র ১৪.১৬ অবতল দর্পণে অবাস্তব প্রতিবিম্ব

ওপরের কার্যাবলী থেকে তুমি জানলে যে অবতল দর্পণে যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, তা বস্তুর আকার থেকে বড় বা ছোট হতে পারে। আরও এই প্রতিবিম্ব বাস্তব বা অমদও হতে পারে।

চিত্র ১৪.১৭

(একজন দন্ত চিকিৎসক একজন রোগীকে পরীক্ষা করছেন।)

চিত্র ১৪.১৮

টর্চের প্রতিফলন

অবতল দর্পণকে বিভিন্ন কার্যের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

- ডাক্তাররা চক্ষু, কান, নাক ও গলাকে পরীক্ষা করার সময়ে, এই প্রকার দর্পণ ব্যবহার করেন।
- দন্ত চিকিৎসকরা দাঁতের এক বৃহত্তর প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন। (চিত্র ১৪.১৭)
- তুমি ব্যবহার করা টর্চের প্রতিফলনকে (চিত্র ১৪.১৮) দেখো, ইহাও অবতল দর্পণ।
- কার, স্কুটারআদির সম্মুখভাগে আলোকের প্রতিফলক ও অবতল। ইহা কেন ভেবে দেখো।

তোমাদের মধ্যে কয়েক জনের নতুন সাইকেল কেনা হয়ে থাকবে। সেই সাইকেলের বেলকে দেখো। সেখানে তুমি তোমার একটা সোজা ও ছোট প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এই বেলের উপর ভাগ একটা গোলাকার দর্পণের মতন কাজ করছে। ইহা কোন প্রকার দর্পণ বলতে পারবে কি ? এই বেলের প্রতিফলকের পৃষ্ঠ উত্তল।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৪.১০:

চিত্র ১৪.১৯য়ে অবতল দর্পণের পরিবর্তে একটা উত্তল দর্পণ নিয়ে, পূর্ব পরীক্ষার মতো নিজের পর্যবেক্ষণগুলিকে সারণী ১৪.২-এর মতন একটা সারণী করে লেখো। এর থেকে কোনো স্থানে একটা বাস্তব প্রতিবিম্ব পেলে কি ? বস্তুর আকারের থেকে প্রতিবিম্বের আকার বড় হওয়া লক্ষ করলে কি ?

চিত্র ১৪.১৯ উত্তল দর্পণের প্রতিবিম্ব গঠন

এই প্রকার উত্তল দর্পণ মোটর সাইকেল, কার, আদি যানে লাগানো থাকে। ইহা কেন লাগানো থাকে। ভেবে দেখো। এই প্রকার উত্তল দর্পণের চালক পেছন থেকে আসা যানবাহনকে দূরের থেকে ও ছোট আকারে দেখে সতর্ক হয়ে যায়।

কি শিখলে:

- আলোক এক সরলরেখায় গতি করে।
- অস্বচ্ছ মসৃণ পৃষ্ঠদর্পণের মতো কাজ করে।
- যে প্রতিবিম্বকে পরদায় ধরে রাখা যেতে পারে তাকে বাস্তব প্রতিবিম্ব বলা হয়।
- যে প্রতিবিম্বকে পরদায় ধরে রাখতে পারা যায় না, তাকে অমদ প্রতিবিম্ব বলা হয়।

- সমতল দর্পণে গঠিত হওয়া প্রতিবিম্ব—সোজা, অমদ এবং বস্তুর উচ্চতার সহিত সমান। এ ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের দূরতা বস্তুর দূরতার সহিত সমান। এই প্রতিবিম্বে পার্শ্ব পরিবর্তন হয়।
- অবতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব বাস্তব। দর্পণের খুব নিকটে বস্তু রাখলে এক্ষেত্রে দর্পণ থেকে একটা সোজা, অমদ ও বস্তুর আকারের থেকে বড় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।
- উত্তল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব সোজা, অমদ এবং বস্তুর থেকে কম উচ্চতাবিশিষ্ট।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) এক বাস্তব প্রতিবিম্ব ——— দর্পণ গঠিত হয়।

(খ) সবক্ষেত্রে বস্তু অপেক্ষা ছোট প্রতিবিম্ব ——— দর্পণে গঠিত হয়।

(গ) বস্তুর উচ্চতার থেকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব ——— দর্পণে দেখা যায়।

(ঘ) পরদার ওপরে সৃষ্টি হতে থাকা প্রতিবিম্বকে ——— প্রতিবিম্ব বলা হয়।

২. নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে নিজের খাতায় লেখো। ঠিক বাক্যের কাছে টিক (✓) চিহ্ন এবং ভুল বাক্যর কাছে কাটা (×) চিহ্ন দাও।

(ক) সমতল দর্পণে উলটো প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

(খ) গাড়ি চালক পেছনের দৃশ্য দেখার জন্যে মোটর গাড়িতে উত্তল দর্পণ লাগানো থাকে।

(গ) উত্তল দর্পণের একটা সোজা ও বস্তুর থেকে বড় প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

(ঘ) অবতল দর্পণে এক বাস্তব, বড় এবং উলটো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

৩. 'ক' স্তম্ভের সহিত 'খ' স্তম্ভের থাকা সম্পর্ককে দেখে মেলাও।

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
অবতল দর্পণ	প্রতিবিম্ব সব সময় ক্ষুদ্র ও সোজা হয়ে থাকে।
উত্তল দর্পণ	প্রতিবিম্ব সব সময়ে সোজা ও বস্তুর উচ্চতার সঙ্গে সমান
সমতল দর্পণ	দন্ত চিকিৎসক রোগীর দাঁতের বর্ধিত প্রতিবিম্ব করে দেখে।
	বর্ধক কাচের রূপে ব্যবহৃত হয়।

৪. অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির সামনে উলটো নাম কেন লেখা হয়ে থাকে? এর ওপর নিজের মত দাও।

৫. সমতল. উত্তল এবং অবতল দর্পণের দুটি করে ব্যবহার লেখো।

৬. অবতল দর্পণ ও উত্তল দর্পণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৭. বাস্তব প্রতিবিম্ব ও অমদ প্রতিবিম্বের মধ্যে থাকা দুটি পার্থক্য লেখো।

৮. একটা বড় সমতল দর্পণ থেকে তিন মিটার দূরে একটা বস্তু আছে। যদি বস্তুটি দর্পণ থেকে আরও দুমিটার দূরে সরিয়ে দাও, তবে প্রতিবিম্ব কতদূরে সৃষ্টি হবে?

৯. বিজ্ঞানসম্মত কারণ লেখো:

(ক) সমতল দর্পণের বাম হাত দক্ষিণ হাতের মতো দেখা যায়।

(খ) ক্ষৌরকর্ম হওয়ার সময়ে সামান্য অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়।

(গ) গাড়ি চালকের কাছে উত্তল দর্পণ লাগানো থাকে।

১০. নিম্নোক্ত প্রত্যেক প্রশ্নের জন্যে দেওয়া চারটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে লেখ।

(ক) কোন দর্পণের অমদ প্রতিবিম্ব বস্তুর থেকে বড়।

(১) সমতল (২) উত্তল (৩) অবতল (৪) এদের মধ্যে কেউ না।

(খ) ধরাশ্রী সমতল দর্পণের কাছ থেকে দুমিটার দূরত্বে থেকে তার প্রতিবিম্ব দেখছিল। সে দর্পণ থেকে ১ মিটর পেরিয়ে গেলে প্রতিবিম্বর থেকে তার দূরতা কত হবে?

(১) ৪ মি (২) ৫ মি (৩) ৬ মি (৪) ৭ মি

(গ) কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিফলন?

(১) স্টেনলেস্ স্টিল থালা (২) জানালায় লেগে থাকা কাচ (৩) মসৃণ মার্বেল মেজে (৪)সমতল দর্পণ।

১১. নিম্নে দেওয়া কোন্ কোন্ বস্তুগুলিতে আলো পড়লে আলো প্রতিফলিত হয় না।

ইট্, তোমার নোট খাতা, আকাশে ভাসতে থাকা মেঘ, দূর পাহাড়, চাঁদ, তোমার ক্লাসের ব্যাকবোর্ড, জেট প্লেন, রান্নার জন্যে ব্যবহৃত ডেকচি।

১২. সকালে উঠে মুখ ধোঁয়ার সময় তোমার দর্পণে তোমার যে প্রতিবিম্ব দেখো, তা বাস্তব না অমদ? ক্যামেরা ব্যবহার করে সেই প্রতিবিম্বর ফটো ওঠানো যাবে কি?

ঘরে করার জন্যে কাজ:

১. তোমাদের অঞ্চলে থাকা বিজ্ঞান কেন্দ্র কিংবা বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন প্রকার দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাও সে সব দর্পণ কোন্ প্রকারের বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করে নিজের খাতায় লেখো।

২. তোমার ঘরের কাছে থাকা একজন কান, নাক ও গলার চিকিৎসকে দিয়ে সেখান তারা পরীক্ষার জন্যে ব্যবহার করতে থাকা বিভিন্ন প্রকার দর্পণগুলি দেখো, সেগুলি মধ্যে কোন্‌টি কোন্ প্রকার দর্পণ ডাক্তারের সহিত আলোচনা করো।

৩. দুটি সমতল দর্পণ নিয়ে তাকে বিভিন্ন কোণ করে সাজিয়ে তাদের সামনে একটা বস্তু রাখো। কয়টি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে। তা খাতায় লিখে রাখো এবং শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করো।

৪. নিজের হাতের তালু ব্যবহার করে অবতল ও উত্তলের ধারণা দাও। এ পৃষ্ঠাগুলি প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারছে কি? এ পৃষ্ঠগুলির দ্বারা আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে কি? কীভাবে জানবে? তোমার পর্যবেক্ষণ খাতায় লিখে নাও এবং শিক্ষকের সহিত আলোচনা করো।

●●●

পঞ্চদশ অধ্যায়

জল - অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ

১৫.১ জলই জীবন:

পৃথিবীর প্রথমে জীবনের অণু জলেই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেক জীবকোষের মুখ্যভাগ হলো জল। উদ্ভিদের জন্যে আলোক বিশ্লেষণে জল আবশ্যক। সেই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত খাদ্যের ওপরে সমগ্র জীবজগৎ নির্ভর করে। আমাদের সুষম খাদ্যের একটা আবশ্যক অংশ জল, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা জানতে পারব যে জল একটা অমূল্য সম্পদ। তাই জলকে জীবন বলা হয়। প্রত্যেক বছর মার্চ ২২ তারিখ 'বিশ্ব জলদিবস' রূপে পালন করা হয়।

চিত্র ১৫.১ জল সম্পর্কিত পোস্টার

এই পোস্টারগুলি দেখে তুমি কি প্রকার বার্তা পাচ্ছ আলোচনা কর। জলাভাব তোমার জীবনে কোন দিন অনুভব করেছ কি? গুরুজনেরা তোমাকে অযথা জল অপচয় না করতে উপদেশ দেন। এসো আমরা এ উপদেশের গুরুত্ব বিষয়ে অনুধ্যান করব।

১৫.২ জলের অবশ্যকতা

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমার পরিবারের জন্যে কত জল দৈনিক আবশ্যক তা তুমি অনুমানিক হিসেব করেছিলে। মিলিত জাতিসংঘের সূচনা অনুয়ায়ী একজন ব্যক্তি খাওয়া, ধোয়া, তথা রান্নাকরা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দৈনিক মোট ৫০ লিটার জল ব্যবহার করে থাকে। যদি একটা বালতিতে ১০ লিটার জল থাকে তবে তুমি ৫ বালতি জল ব্যবহার করে থাকো। তুমি নিজে দৈনিক অন্তত দু বালতি জল পেতে পারছ কি?

হয়তো তোমাদের জলের অভাব নেই, তাই তোমরা ভাগ্যবান। কিন্তু কিছু স্থানে জল সংগ্রহ করতে অনেক দূর (যথা: নদী, ঝর্ণা) যেতে লোকেরা বাধ্য হয়। শহরে নলকূপের কাছে লম্বা লাইনে লোকেদের অপেক্ষা করা তোমরা দেখে থাকবে। মাঝে মাঝে এর জন্য ঝগড়া হয়, কিছু অঞ্চলে এর জন্য প্রতিবাদ করে শোভাযাত্রা ও বেরোতে থাকা সংবাদ পৃষ্ঠায় দেখে থাকো।

তোমাদের জন্য কাজ: ১৫.১

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে জলাভাব সম্বন্ধে লেখা ও ছবি সংগ্রহ করে তুমি খাতায় সাজিয়ে লাগাও। অন্যদের সহিত আলোচনা করে তার একটা তালিকা করতে চেষ্টা করো।

তোমার জেলায় জলাভাবের বিবরণী সংগ্রহ করে, আমাদের প্রদেশে জলাভাব বিবরণীর সঙ্গে তুলনা করো।

১৫.৩ পৃথিবীপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ:

সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ জলাবৃত। পৃথিবীর সাতভাগ থেকে পাঁচভাগ কেবল সমুদ্র। তাই আমাদের পৃথিবীকে 'জলগ্রহ' বলে। এত পরিমাণে জলের উপস্থিতির জন্যে আমাদের পৃথিবী মহাশূন্য থেকে 'নীলগ্রহ' ভাবে দৃশ্যমান হয়। চিত্র ১৫.২ দেখো।

চিত্র ১৫.২ জলগ্রহ পৃথিবী

আনুমানিক হিসেবে পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট জলের আয়তন ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। মোট জলের ৯৭.৫ ভাগ কেবল নোনা সমুদ্রের জল ও অবশিষ্ট ২.৫ ভাগ মধুর জল। মধুর জলরাশির অধিকাংশ মেরু অঞ্চলের বরফ হয়ে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত জলসম্পদকে ২.২ লিটার ধরলে মাত্র আধ চামচ হচ্ছে মধুর জল। পৃথিবীর সমস্ত জলসম্পদ সীমিত এবং এর বৃদ্ধি ঘটছে না। তাই আমরা জলের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে একে একদম নষ্ট করা উচিত নয়।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১৫.২

(ক) একটা মধ্যম ধরনের বালতি নাও। যেন এতে প্রায় ২০ লিটার জল ধরবে। মনে করো এই ২০ লিটার জল আমাদের পৃথিবীর সব মোট জলের পরিমাণ প্রতিপাদিত করছে।

(খ) বালতির থেকে আধ লিটার জল বের করে একটা মগে ভর্তি করে রাখো। উপর পরিপ্রেক্ষিতে এটা পৃথিবীর মধুর জলের পরিমাণ প্রতিপাদন করবে।

(গ) একটা ৫ মিলিলিটার চামচে মগ থেকে ৩০ চামচ জল বের করে একটা কাচের গ্লাসে রাখো। তাহলে এটা আমাদের ভূতল জলের পরিমাণ প্রতিপাদন করবে।

(ঘ) এই চামচে এক চতুর্থাংশ জল নাও। এই পরিমাণের আনুপাতিক জল নদী, হ্রদে থাকে।

চিত্র ১৫.৩: মধুর জলের পরিমাণ অনুমান

- ওপরে 'খ' পর্যায়ের জন্য আধ লিটার জল বালতি থেকে নেওয়ার পরে, বালতিতে থাকা অবশিষ্ট জল মহাসাগর ও মহাসমুদ্রে থাকা নোনা জল সমষ্টিকে প্রতিপাদন করছে। যেটা পানীয় জলরূপে মানুষের ব্যবহারোপযোগী নয়।
- মগে থাকা অবশিষ্ট জল মুখ্যত বরফের রূপে হিমবাহতে থাকে। তাই তাও পানীয় জলরূপে ব্যবহার হতে পারছে না।

আমরা ভেবে থাকি জল এক অশেষ সম্বল। কিন্তু এই হিসেবের পরে আমরা জানলাম যে, মানুষের ব্যবহারোপযোগী জলের পরিমাণ কত সীমিত।

এই জলের থেকে ভূতল জল অনেক কারণেই বিষাক্ত হওয়ার কথা জানা গেছে। ভারী ধাতু, খনিজ পদার্থ, বিষাক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশক পদার্থ ইত্যাদির উপস্থিতির জন্য এই ভূতল জল অনেক সময় পানীয়র জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জলও বিষাক্ত বাষ্পের সঙ্গে মিশে অম্লযুক্ত হওয়ায় গাছের রোগ সৃষ্টি করছে। পুকুর ও নদীতে ময়লা, নর্দমার জল ছেড়ে অনেকে বিশুদ্ধ জলের গুণগতমান নষ্ট করে দেয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য জলের এখন অপব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি হতে লেগেছে। তাই নিকট ভবিষ্যতে জলসংকট একটা মুখ্য বিপদ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২০০৩ সালকে বিশ্বজল বছররূপে পালন করে লোকেদের মধুর জল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত 'বিশ্বজল' দশক ভাবে পালন করা হয়েছে।

১৫.৪: জলের বিভিন্ন অবস্থা:

ষষ্ঠ শ্রেণীতে জলচক্র সম্বন্ধে তোমরা পড়েছ। বলো দেখি, সেই বিষয়ে তোমরা কী মনে রেখেছ এবং বুঝেছ? তোমরা জানো পৃথিবীতে জল বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। মেরু অঞ্চলে ঠান্ডা হয়ে বরফরূপে থাকে। হিমালয়ের মতন পাহাড় খুব উঁচু হওয়ার দরুন তার শীর্ষাঞ্চলে বরফ জমাট বেঁধে থাকে। মেঘরূপে থাকা জলীয় বাষ্প বর্ষা হয়ে আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। ঝরনা, হ্রদ, নদী পুকুরের জল তরল অবস্থায় থাকে। নদীর জল সমুদ্রে মিশে, সমুদ্রের লবণাক্ত জলরূপে তরল অবস্থায় থাকে। সূর্যের তাপের প্রভাবে জল বাষ্প হয়ে আবার আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে।

রন্ধনকার্য করার সময় জল বাষ্প হওয়া তুমি দেখেছ। তা জলের বাষ্পীয় অবস্থা। এই জলীয় বাষ্প তথা অন্যান্য উপায়ে সৃষ্টি হওয়া জলীয় বাষ্প বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১: কোন্ কোন্ উপায়ে জল বাষ্প হয়ে বায়ুর সঙ্গে মেশে লেখো।
এই বিষয়ে তোমার সহপাঠী তথা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

১৫.৫ ওড়িশার জল সম্পদ:

মহানদী, সুবর্ণরেখা, বুড়িগঙ্গা, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, ঋষিকুল্যা, বংশধারা, নাগাবলী, ইন্দ্রাবতী ইত্যাদি নদী এবং তাদের শাখানদীই ওড়িশার ব্যবহার উপযোগী মুখ্য জল সম্পদ। এই নদীগুলি বৃষ্টিপুষ্ট। এ ছাড়া পুকুর, কুঁয়ো এবং ভূতল জল ও জলসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তবে পানীয় জল, চাষের জন্য জল, কলকারখানার জন্য জল ইত্যাদির পরিসীমার বাইরে নোনাজলের ভাঁড়ার ঘর হিসাবে চিল্কা এবং সুদীর্ঘ সমুদ্র সম্ভার ও ওড়িশার জল সম্পদরূপে গ্রহণীয়।

কারণ এই জলসম্পদকে প্রধানত মাছচাষ এবং নৌবাণিজ্যের জন্য ওড়িশার অধিবাসীরা ব্যবহার করে থাকেন।

প্রশ্ন ২: ওড়িশার সুদীর্ঘ সমুদ্রের জলরাশির নাম বলো।

প্রশ্ন ৩: চিল্কার জলসম্পদের অন্য কী ব্যবহার জানো লেখো।

প্রশ্ন ৪: চান্দিপুরের কাছে সমুদ্রের জলরাশি কেমন গবেষণামূলক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হচ্ছে লেখো।

বর্ষা না থাকার সময় এই জল সম্পদকে সঞ্চয় করে রেখে নিয়ন্ত্রিয়ভাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের ওড়িশাতেও বিভিন্ন প্রকল্প করা হচ্ছে। সম্বলপুরের নিকটে মহানদীর ওপরে নির্মিত হীরাকুঁদ নদীবন্ধ এই প্রকল্পদের ভেতরে সর্বোত্তম বিখ্যাত।

মনে রেখো: হীরাকুঁদ নদীবন্ধের দৈর্ঘ্য ২৫.৮ কিলোমিটার (মুখ্যভাগ ৪.৮ কিমি) এবং ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীবাঁধ।

হীরাকুঁদের গচ্ছিত জল উভয় জলসেচন তথা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। হীরাকুঁদ ব্যতীত অনেক ছোট ছোট নদীবন্ধ ও ক্ষুদ্র জলসেচন যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে।

পানীয় জলরূপে এই জল সম্পদের ব্যবহার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উপায়ে করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের কাছের নদী কিংবা ভূতল জলসম্পদ থেকে জল সংগ্রহ করে পাইপের সাহায্যে জুগিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই জল জোগানের পূর্বে, তার বিভিন্ন উপায়ে বিশোধিত করা হয়।

গ্রামাঞ্চলে থাকা লোকেরা নিজের ব্যবহারের জন্য মুখ্যত পুকুর, নদীনালা ও কুয়োর জলের উপরে নির্ভর করে থাকে। এখন অবশ্য অনেক গ্রামে ভূতল জলকে ব্যবহার করার জন্য নলকূপ বসানো হয়েছে। তবে ওড়িশার কতক পার্বত্য অঞ্চলে বর্ষার জলকে অমল করে লোকেরা তাদের আবশ্যকতা মেটাচ্ছে।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১৫.৩

তোমাদের অঞ্চলে পানীয় জল জোগান কোন্ উপায়ে হয়ে থাকে? তা জানার চেষ্টা করো। এবং সে বিষয়ে একটা পরিচ্ছেদ লেখো।

১৫.৬ ভূতল জল:

জলের এক মুখ্য উৎস ভূতল জল। মাটির গভীরে একটা গর্ত খোঁড়ার সময়ে মাঝে মাঝে সেখান থেকে ভেজা মাটি বেরোনো আমরা দেখে থাকি। এই ভেজা মাটি ভূমির নীচে থাকা জলের সূচনা দিয়ে থাকে। কূপ, নলকূপ করার জন্য কোনো স্থানে খননকার্য চলার সময়ে, কিছুটা গভীরতায় জলের সন্ধান পাওয়া যায়। জলের সেই স্তরটিই সেই স্থানের ভূতল জলের উপরের স্তর বলে বলা হয়। এই স্তরের নীচে যে জল জমা হয়ে থাকে তাকেই ভূতল জল বলা হয়।

প্রশ্ন ৫: ভূতল জল কোন্ কোন্ সূত্রের থেকে এসে জমা হয়ে থাকে, তা একটা তালিকা করো এবং এ বিষয়ে তোমার সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

ভূতলে জল গচ্ছিত হয়ে থাকার প্রক্রিয়া খুব সোজা ও সাধারণ। বর্ষার জল, নদী, পুকুরের জল, পরিত্যক্ত জল (Waste Water) ইত্যাদি মৃত্তিকায় থাকা ছিদ্র দিয়ে মাধ্যাকর্ষণের জন্য তলায় তলায় প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়াকে অন্তঃপরিস্রবণ (Infilteration) বলা হয় এবং এরদ্বারা ভূতলে গচ্ছিত জলের পুনঃভরণ হয়ে থাকে। এই ভূতল জল যদি দুটি প্রস্তর স্তরের মধ্যে থাকে তাহলে তাকে অ্যাকুইফার (Aquifer) বলা হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভূতলে গচ্ছিত জলের পরিমাণও সীমিত। ভূতল জলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য এখন ভুবনেশ্বরের মতন শহরে এই জলের উপর স্তর তীব্রভাবে নিম্নগামী হচ্ছে। সেই জন্য জলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অপরিহার্য।

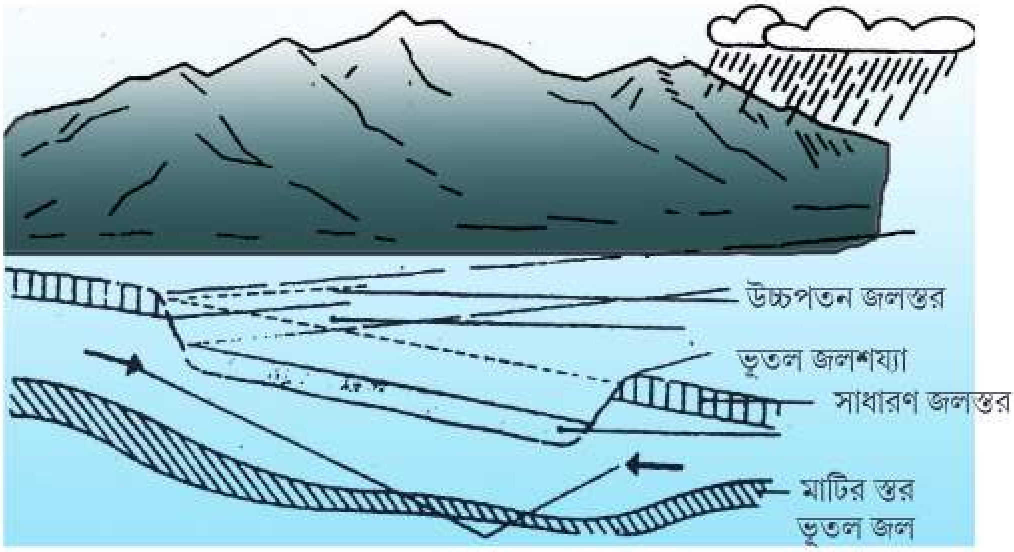

চিত্র ১৫.৫ (ক) ভূতল জল প্রবাহের দিক

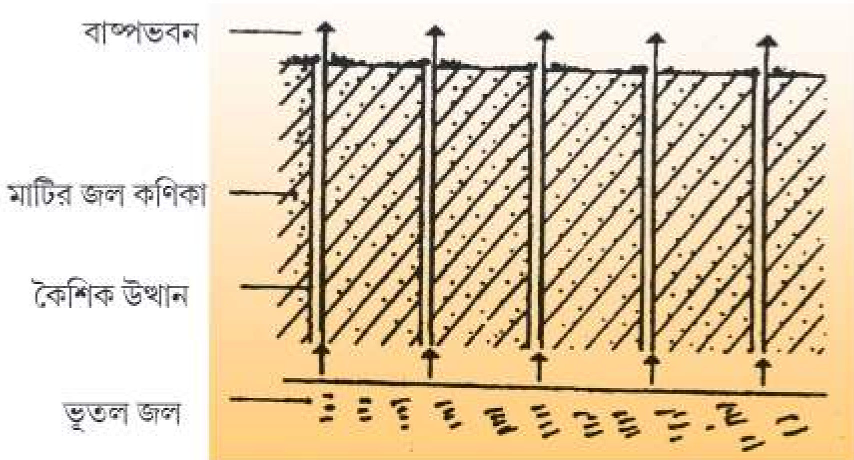

চিত্র: ১৫.৫ (খ) শুষ্ক অঞ্চলে ভূতল জল

তোমাদের জন্যে কাজ ১৫.৪

যেখানে কূপ ও নলকূপের খননকার্য হতে থাকবে, সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করো। তোমার গ্রামে বা অঞ্চলে লোকেরা কূপের জল কত গভীরে সাধারণত দেখে থাকে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করো।

তোমাদের অঞ্চলে প্রত্যেক পাড়ায় কীভাবে জল সংগ্রহ করা হয় তা পর্যবেক্ষণ করো। ব্যবহৃত করা কূপ, নলকূপ, পুকুর, নদীর সূচনার জন্যে একটা সারণী প্রস্তুত করো।

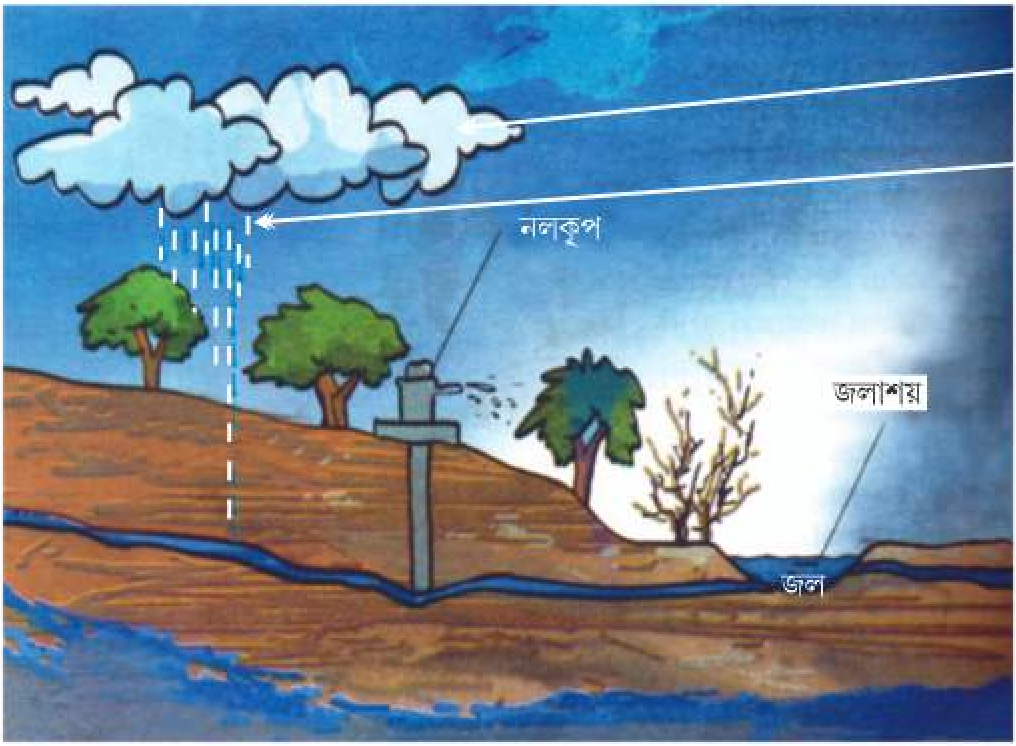

চিত্র ১৫.৬ ভূতলের জলস্তর

গ্রামের নাম:—————————　　　　　　　　লোকসংখ্যা:—————————

ব্লকের নাম:—————————

সারণী ১৫.১

পাড়া/বস্তি	কূপসংখ্যা	কূপের গভীরতা	নলকূপের সংখ্যা	নলকূপের গভীরতা	লোকসংখ্যা
মুখ্য পাড়া	৪	৮	২	৫০ মি	৫০০

১৫.৭ জলস্তর নিম্নীকরণ:

এই অধ্যায়ে আমরা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি যে, ভুবেনশ্বরের মতন শহরে ভূতল জলের উপস্তর নিম্নগামী হচ্ছে। এই স্তর, মুখ্যকারণ চারটি হল—

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি

(খ) শিল্প ও কারখানা বৃদ্ধি

(গ) কৃষিকার্য

(ঘ) স্বল্প বৃষ্টি ও জঙ্গলক্ষয়

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে বাসগৃহ, রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার, কার্যালয়াদি নির্মাণে অনেক জমি ব্যবহার করা হয়। ফলে খেলার মাঠ, পার্ক, চারণভূমিও কমে আসছে।

বৃষ্টির জল পড়লে রাস্তার ওপর পিচ কিংবা ঘরের কংক্রিট ছাত দিয়ে জল মাটি ভেদ করে ভূতলে যাওয়ার সুযোগ না পাওয়ার কারণে কিংবা পাকা মেঝে জলের জন্যে বাধক হওয়া হেতু ভূতল জলের পুনঃভরণ প্রক্রিয়া কমে যাচ্ছে।

ঘাসের মাঠ, খোলা জায়গায় জমির জলের অন্তঃপরিস্রবণের ক্ষমতা বেশি। আবার গৃহ নির্মাণ আদিকাজে ভূতল জলের অনিয়ন্ত্রিত বহুল ব্যবহার করা হয়। ভূতল জলের বহুল উপযোগের সঙ্গে জলভেদী মাঠের জমির অভাবের জন্যে জলস্তর কমে যায়। অনেক শহরাঞ্চলে এই জলস্তর অধিক কমে নিম্নগামী হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে জলাভাব সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

(খ) **শিল্প ও কারখানা বৃদ্ধি:** ক্রমবর্ধিষ্ণু মানুষের আবশ্যকতা পূরণ করার জন্যে তথা সামাজের আর্থিক উন্নতির জন্যে শিল্প কারখানাও অধিক স্থাপন করা হচ্ছে। কারখানায় জলের অত্যধিক ব্যবহারের জন্যেও সেই পরিমাণে জল পুনঃভরণ প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল হতে না থাকায় জলস্তর কমে কমে যাচ্ছে। কয়েকস্থানে জল বিষাক্তও হয়ে যাচ্ছে।

(গ) **কৃষিকার্য:** কৃষিকার্যের জন্যে বৃষ্টির জলের উপযোগ অধিক হলেও, জলভাণ্ডার নির্মাণ করে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হয়ে কৃষিকার্যের বিকাশ সাধন হচ্ছে। তবু সারা বছর জমির উপযোগ করার উদ্দেশ্যে আমরা ক্যানেলের জলের সঙ্গে ভূতল জলও ব্যবহার করি। ভূতল জলের জন্যে ওঠা জলসেচন যোজনা আরম্ভ হওয়ার ফলে ভূতল জলের স্তরের ওপর অধিক প্রভাব পড়ে জলস্তর কমতে লেগেছে।

(ঘ) **স্বল্প বৃষ্টি ও জঙ্গলক্ষয়:** দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুদ্বারা বছরের মধ্যে কেবল চারমাস বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু অঞ্চলে অধিক বৃষ্টি হওয়ার সময় অন্য কতক অঞ্চলে কম বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী শীঘ্রই আরম্ভ হয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো বছর বিলম্বে আরম্ভ হয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কখনও কখনও জুলাই আগস্ট মাসে খুব কম বৃষ্টি হয়। মৌসুমীর অসমান ও অনিশ্চয়তার জন্যে স্বল্প বৃষ্টি হয়। জঙ্গলক্ষয় অনেক স্থানে স্বল্প বৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৮: জঙ্গলক্ষয় কেন অনাবৃষ্টির কারণ তা লেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৫.৩

তোমাদের অঞ্চলের জলাভাবের কারণ অনুধ্যানের জন্যে নিম্নমতে এক পর্যবেক্ষণ করব এসো।

(ক) তোমাদের অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি জানার জন্যে প্রত্যেক পাড়ার গতবছর ও এবছরের লোকসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করো। নিম্ন সারণীটি তুমি খাতায় এঁকে তথ্যসব সারণীতে পূরণ করো।

তোমার গ্রামাঞ্চলের বিগত বছরের লোকসংখ্যা	
পাড়ার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা

তোমাদের গ্রামস্থঅঞ্চলে চলতি বছর লোকসংখ্যা	
পাড়ার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা

(খ) তোমাদের অঞ্চলে কারখানা স্থাপন হয়েছে কি? তার জন্যে জল ব্যবহারের পরিমাণের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো। নিম্ন সারণীটি তোমার খাতায় এঁকে সেই তথ্য সারণীতে পূরণ করো।

কারখানা	দৈনিক ব্যবহৃত জলের পরিমাণ
বিস্কুট / পাঁউরুটি	
ধানকল	

(গ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণে অসমতা:

বিভিন্ন বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের এই অসমতা চাষ, জলসেচন, জলবিদ্যুৎ, উৎপাদনকে তীব্রভাবে প্রবাহিত করে থাকে। তোমার অঞ্চলে গত বছর ও চলতি বছর হয়ে থাকা বর্ষার তথ্য সংগ্রহ করো। নিম্নে দেওয়া সারণীটি তোমার খাতায় এঁকে তুমি সংগ্রহ করা তথ্য সে সারণী পূর্ণ করো।

মাস	গত বছরে বর্ষার পরিমাণ	চলতি বছর বর্ষার পরিমাণ
জুন জুলাই আগস্ট		

তোমাদের জন্যে কাজ ১৫.৬:

তোমার অঞ্চলে নকশা করে, সে স্থানে বৃষ্টিপাতের অসমতা নির্ণয় করে চিহ্নিত করো। দেশের বৃষ্টিপাত ও বিদেশের বৃষ্টিপাতের এক হারাহারি তুলনা ও মক সারণী করো।

১৫.৮ জলের আবণ্টন:

পৃথিবীপৃষ্ঠে জলের আবণ্টন অনেক কারণের জন্যে অসমান। কতক স্থানে বর্ষা অধিক হয়ে জলের প্রাচুর্য উপলব্ধ আবার কতক স্থানে স্বল্প বর্ষার জন্যে জলাভাব অনুভূত হয়।

আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও বৃষ্টিপাতের প্রভেদ দেখা যায়। জল বহুলতার কারণে প্রত্যেক বছর বন্যা নির্দিষ্ট কতক অঞ্চলে হয়ে থাকে। কিন্তু কতক স্থানে সেই একই সময়ে লোকে জলাভাব জনিত খরা, অবস্থারও সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

চিত্র নং ১৫.৭ ভারতের মানচিত্র

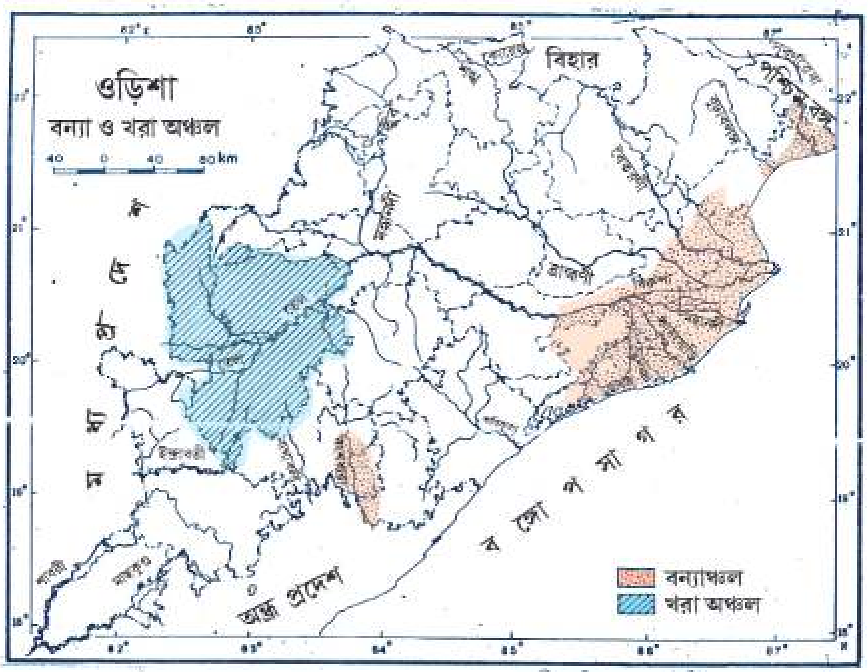

চিত্র ১৫.৮ ওড়িশার মানচিত্র

চিত্র ১৫.৭-এ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত চিহ্নিত করা হয়েছে।

তুমি ওড়িশা প্রদেশে আছ তা চিহ্নিত করো। ওড়িশার বৃষ্টিপাতের তারতম্যজনিত বন্যা ও খরা অঞ্চলের মানচিত্র (চিত্র ১৫.৮) দেখো।

- বছরভর তোমার অঞ্চলে নিয়মিত বর্ষা হয় কি?
- এমন হতে পারে যে তোমার অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত অধিক কিন্তু জলাভাবও অনুভুত হয়। এখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া কোনোদিন লক্ষ করেছ কি? জল পরিচালনা সম্পর্কে তুমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েছ। সেই সম্বন্ধে কতক সাধারণ সতর্কতা পালন করা উচিত। ব্যক্তিগত স্তরে যেহেতু আমরাই জল ব্যবহার করি, তাই জল অপচয়ের জন্যে আমরাই দায়ী। জলের অপচয় কমানোর জন্যে অন্তত দাঁত মাজার সময়ে, স্নান করার সময় ও কাপড় কাচার সময়ে ব্যবহার করতে থাকা ট্যাপ দরকার অনুযায়ী খোলা দরকার। সেরকম জলের প্রদূষণ কমানোর জন্যে তুমি ব্যবহার করতে থাকা কূপ ও নলকূপের চতুর্দিকে আবর্জনার গর্ত রাখা উচিত নয়।

আমরা বিভিন্ন নদী বাঁধ যোজনা দ্বারা জলভাণ্ডার সৃষ্টি করে থাকা জানি। হীরাকুঁদ, কোলাব, বালিমেলা, ইন্দ্রাবতী যোজনার জলভাণ্ডার দ্বারা বর্ষাজলকে জলসেচন করার জন্যে সম্বলপুর, কোরাপুট, নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি জেলায় খাল কাটা হয়ে চাষ জমির নিকটে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছোট বড় পাহাড়ি অঞ্চল থেকে অযথা জলবাহিত হয়ে ভূগর্বে চলে যায়। আমরা কতক স্থানে যদি জলসেচনের জন্যে 'ছোটয়াড়ি বাঁধ' নির্মাণ করে দিই, তবে তার দ্বারা 'ভূতলজল' স্তর জল অমল প্রকল্পের প্রভাবে নিম্নে যায় না। তাই নলকূপ দ্বারা ওঠা জল সেচনে জলাভাব হয় না।

জলাভাব সমস্যার সমাধানের জন্যে 'বিন্দু জলসেচন' বা বিন্দু জলসেচন প্রণালীকে চাষিরা ব্যবহার করে কম জলে কৃষিকার্য করতে পারে। সিঞ্চন প্রণালীতে কেবল গাছের গোড়ায় জল জুগিয়ে দেওয়া হয় তাই জলাভাব অঞ্চলে এই প্রণালীর বহুল ব্যবহার করা উচিত।

- বর্ষাজল অমল করার কৌশল ও কলা বিষয়ে সাময়িক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগ দরকার।

তোমাদের জন্য কাজ ১৫.৭:

বাগানে থাকা গাছগুলিকে জল জোগানোর জন্যে একটা নকশা প্রস্তুত করব এসো। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে থাকা 'জল অমল প্রকল্প' কাজের মতন আমরা 'বিদ্যালয় জল যোজনা' প্রস্তুত করব। এর জন্যে প্রাথমিক স্তরে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

চিত্র ১৫.৯

- গাছ লাগানোর জন্যে স্থান নির্বাচন।
- নলকূপের কাছে সিমেন্টের চাতাল ও চৌবাচ্চা।
- কূপের নিকট ছাউনি প্রস্তুতি।
- জল নিষ্কাশনের জন্যে নালা।
- স্থানের জল, জলের চৌবাচ্চায় জমা করার পর জলজ উদ্ভিদ ও মাছ ছেড়ে শোধন করা।
- নর্দমার জল থেকে শুদ্ধ জল পাওয়া ও বাগানে গাছের জন্যে ব্যবহার করা।
- কখন কেমন বাগানে জলাভাব হেতু গাছের উপর তার প্রভাব লক্ষ করে লিখে রাখো।
- ফুলের টবে থাকা গাছ ঝিমিয়ে যাওয়া অবস্থাকে লক্ষ করা।
- ক্যাকটাস গাছের জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে। তাই জলাভাব অঞ্চলে ঝাউ, ক্যাকটাস ও কাঁটাগাছের বেড়া ব্যবহার করা দরকার।

কী শিখলে ?

- জীবের জন্যে জল আবশ্যক। পৃথিবীর জলের পরিমাণ সীমিত।
- পৃথিবীর জলের পরিমাণের মধ্যে লবণাক্ত জল বেশি। মধুর জল ও পানীয় জলের পরিমাণ খুব কম।
- জলের তিনটি অবস্থা; যথা: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়।
- পৃথিবীতে জলচক্রদ্বারা জলের পরিচালনা সত্বেও কতক জায়গায় উৎকট জলাভাব দেখা যায়।
- মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা জলের আবণ্টন অসমতা রয়েছে।
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কলকারখানা বৃদ্ধি, স্বল্প বৃষ্টি, জঙ্গলক্ষয় ও জলের কুপরিচালনা জলাভাবের কারণ।
- পরিত্যক্ত জল ভূতল জলরূপে সঞ্চিত থাকে।
- ভূতল জলের স্তরের নিম্নীকরণের জন্যেও জলাভাব সৃষ্টি হয়।
- উদ্ভিদের জন্যে জলের আবশ্যকতা রয়েছে।
- ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক জল সচেতনতা তথা যত্ন নিলে জল সংরক্ষণ হতে পারবে।

অভ্যাস

১. নিম্নে প্রদত্ত উক্তির মধ্যে থেকে ঠিক ও ভুল উক্তিকে যথাক্রমে T ও F লেখো।

(ক) পৃথিবীর হ্রদ ও নদীজলের পরিমাণ থেকে ভূতল জলের পরিমাণ বেশি।

(খ) গ্রামাঞ্চলে থাকা মানুষেরা জলের অভাব ভোগ করে থাকে।

(গ) জলসেচনের জন্যে নদীই একমাত্র উৎস।

(ঘ) বৃষ্টিপাতে বর্ষার জলই সেচ উৎস।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) একজন ব্যক্তি মিলিত জাতিসংঘের সূচনা অনুযায়ী ——— লিটার জল প্রত্যেক দিন ব্যবহার করে।

(খ) আনুমানিক হিসেবে পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বমোট জল ——— ঘন মিটার।

(গ) পৃথীর জল ২০ লিটার হলে, আমাদের নদী, হ্রদের জলের পরিমাণ ——— চামচ।

(ঘ) মেঘে জল ——— অবস্থায় থাকে।

(ঙ) হীরাকুঁদ নদীবাঁধ ——— নদীর ওপর নির্মিত হয়েছে।

(চ) নলকূপ থেকে পাওয়া জলকে ——— জল বলতে পারব।

৩. ভূতলের জল কেমনভাবে পুনঃভরণ হয়, বর্ণনা করো।

৪. তোমাদের পাড়ায় ৫০টি ঘর আছে, ১০টি নলকূপ আছে। জলস্তরের ওপরে কেমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে লেখো।

৫. জলস্তর নিম্নীকরণের বিভিন্ন কারণগুলি লেখো।

৬. তুমি বাগানে জলের পরিচালনার জন্যে কেমন যত্নবান হবে লেখো।

৭. নিম্নোক্ত বাক্য থেকে কোন্‌টি জলাভাবের জন্যে 'দায়ী' নয়।

(ক) শিল্পের দ্রুতবৃদ্ধি

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি

(গ) অধিক বৃষ্টিপাত

(ঘ) জলের উৎসের পরিচালনা

৮. কোন্‌টি পৃথিবীর সমুদায় জলের জন্যে উদ্দিষ্ট?

(ক) নদী ও হ্রদের জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট।

(খ) ভূতল জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট।

(গ) সমুদ্র ও মহাসাগরের জলের পরিমাণ স্থির।

(ঘ) পৃথিবীর জলের পরিমাণ স্থির।

৯. ভূতল জল ও জলস্তরের নামাঙ্কিত নকশা অঙ্কন করে রঙের দ্বারা দর্শাও।

১০. তোমাদের ঘরে জল অপচয় হওয়ার দৃষ্টান্ত দাও।

১১. লাগাতার দুবছর অনাবৃষ্টি হলে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে যা যা অসুবিধা হবে তার থেকে তিনটি করে লেখো।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

- তুমি বিদ্যালয়ে জল অডিটর (AuditorV। তোমার সঙ্গে পাঁচজন সভ্য আছেন। বিদ্যালয়ের পরিসরে জল সম্বন্ধীয় সার্ভে করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর টিপ্পনী দাও।

  (ক) মোট কূপ, নলকূপের সংখ্যা

  (খ) ট্যাপের সংখ্যা, কটা ট্যাপে লিকেজ আছে।

  (গ) লিকেজ হেতু অপচয় হওয়া জলের পরিমাণ।

  (ঘ) লিকেজের কারণ কী

  (ঙ) লিক বন্ধ করার জন্যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

- জল সংরক্ষণ: তোমার ঘরে বা বিদ্যালয়ে জল সংরক্ষণ অভিযানের জন্যে অন্তত একটা পোস্টার ডিজাইন করে প্রস্তুত করো।

- 'লোগো প্রস্তুতি' জলাভাবের এক আলোচনাচক্র আয়োজনের জন্যে একটা লোগো প্রস্তুত করো। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে তোমার গ্রামে বা অঞ্চলের জল অপচয়ের বিষয়ে এক তর্ক সভার আয়োজন করে অধিবাসীদের জল সচেতনতা বাড়াও।

- রাজস্থানে কীভাবে বৃষ্টির জল ব্যবহার ও সঞ্চয় করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করো। বর্ষাজল অমলের জন্যে যে প্রণালীর বিষয়ে জানলে তাকে ব্যবহার করে তোমার অঞ্চলের বর্ষাজলের সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করো।

●●●

ষোড়শ অধ্যায়

জঙ্গল সম্পদ

১৬.১ জঙ্গলকে প্রাকৃতিক সম্পদ কেন বলব ?

আমরা চাষের জমিতে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন করে থাকি। সেখানে মানুষ নিজের খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকতা মেটানোর জন্যে ধান, গম, কার্পাস, পাট, মুগ, কলাই, চিনেবাদাম ইত্যাদি এক একটা জাতের উদ্ভিদ চাষ করে থাকে।

কিন্তু তুমি গ্রামের মাথায়, পাহাড়ের ওপর বা নদীর পারে এমন অনেক জায়গা দেখতে পাবে যেখানে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ আপনাআপনি উঠে সেখানে ঘন নিবিড় সবুজ আস্তরণ সৃষ্টি করে থাকে। কখনো কখনো এমন প্রাকৃতিক উপায়ে বাড়তে থাকা গাছপালা, একর একর ব্যাপী থাকে। এভাবে সৃষ্টি হওয়া সংগঠনকে আমরা বন বা জঙ্গল বলি।

জল, বাতাস, আলোর মতো জঙ্গল মানুষের সমাজের জন্যে এক অমূল্য সম্পদ। কারণ জঙ্গল থেকে আমরা কাঠ, পাতা, বিভিন্ন ফল, ঝুনো ওষুধ, গালা ইত্যাদি পেয়ে থাকি। এসব জিনিস জোগানোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল আমাদের আরও অনেক উপকার করে থাকে। জঙ্গলকেই জীবজগতের অম্লজান জোগানোর 'প্রাকৃতিক কারখানা' বলা হয়। সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে অঙ্গারকাম্ল ও মাটির থেকে জল সংগ্রহ করে সূর্যালোকের থেকে শক্তি আহরণ করে শ্বেতসার খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ায় অম্লজান নির্গত হয়ে বায়ুতে মেশে। জীবজগৎ শ্বাসক্রিয়ার জন্যে এই অম্লজানকেই গ্রহণ করে থাকে। প্রক্রিয়াটিতে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারকাম্ল ও সংগ্রহ করে বিনিয়োগ করতে থাকায় ইহার মাত্রা বাড়তে পারে না। অঙ্গারকাম্লের মাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে।

একবার ভাব তো বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারকাম্ল মোটে ব্যবহার না হলে কী হত ?

প্রশ্ন ১: আজকাল শীতঋতুতেও গরম লাগার পেছনে কী সব কারণ আছে ? এ বিষয়ে তোমার শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

উদ্ভিদ থেকে জাত পদার্থ সমগ্র জীবজগৎকে খাদ্য জোগায়। তাছাড়া বৃষ্টি হওয়া, ভূগর্ভের জল স্তর বজায় রাখা, মৃত্তিকাক্ষয় বন্ধ করা, অনেক পশুপাখি, কীটপতঙ্গকে আশ্রয় দেওয়ার মতন অনেক উপকার জঙ্গল করে থাকে। জঙ্গল আমাদের এতগুলো উপকার করার জন্যে তা আমাদের এক বড় সম্পদ।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১৬.১

এখানে দেওয়া সারণীর মতন দুটি সারণী নিজের খাতায় করো ও কম জঙ্গল হলে কোন্ ক্ষেত্রে কম ও কোন্ বেশি হবে খালি জায়গাতে লেখো।

সারণী ১৬.১ জঙ্গলের প্রভাব

	কমবে	বাড়বে		বাড়বে	কমবে
বর্ষা খাদ্য অঙ্গারকাম্ল পশুপাখি			তাপমাত্রা কাঠ ভূগর্ভস্থ জলস্তর পশুপাখির আশ্রয় (বাসস্থান)		

জঙ্গলের সঙ্গে অন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি হল—মাটি, জল, বায়ু, খনিজ পদার্থ, সূর্যালোক ও বিভিন্ন প্রাণী ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে থেকে যেগুলো শেষ হয়ে গেলে বা ব্যবহার হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না অথবা যথা সময়ের মধ্যে ভরণ করতে পারা যাবে না, তাদের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ খনির থেকে পাওয়া কয়লা ও খনিজ তৈল ওগুলি সৃষ্টি হয়ে সঞ্চিত হওয়ার জন্যে হাজার হাজার বছর লেগে যায়। তাই এগুলি শেষ হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। সেরকম পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে লোপ পেয়ে যাওয়া বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরও নবীকরণ অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। সম্পদের ব্যবহার করার পরও আর একবার সৃষ্টি করা যায় বা ভরণ করা যেতে পারে তাকে অশেষ (অফুরন্ত) প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। জঙ্গল, বায়ু ও জল 'অশেষ' (অফুরন্ত) প্রাকৃতিক সম্পদ।

১৬.৬ জঙ্গলে কারা সব থাকে/কে কেমনভাবে থাকে ?

চিত্র ১৬.১ বিভিন্ন পশুপাখি যথা বাঘ, হরিণ, বানর, শেয়াল, কপোত, টিয়াপাখি, সিংহ, হাতি, জিরাফ, জেব্রা

তুমি জানো যে জঙ্গলে নানা রকমের গাছপালা ও পশুপাখি থাকে। জঙ্গলে শাল, পিয়াশাল, কেন্দু, মহুল, তেঁতুল, শাগুয়ানের মতো বড় গাছ অনেক রকমের ঝোপঝাড়ের গাছ বিভিন্ন প্রকার লতা ও ঘাস দেখা যায়। কিছু জঙ্গলে বাঁশও থাকে। বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, হরিণ, খরগোশ, শেয়ালের মতো পশু ও কপোত, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, কাঠঠোকরা, কুচলাখাই-এর মতো পাখিও জঙ্গলে বাস করে। জঙ্গলে সাপ, নেউল (বেজি) টিকটিকি এদের মতো সরীসৃপও থাকে। অনেক জাতের পিঁপড়ে, পোকা, কীটপতঙ্গ, বিছে, কেঁচো, মাকড়সাদের বাসস্থান হচ্ছে জঙ্গল।

একটা জঙ্গলে এ সমস্ত প্রকার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষলতা দেখা যায় কি? তুমি হয়তো কোনো জঙ্গলে বাঘ ও অন্য কোনো জঙ্গলে হাতি থাকা কথা শুনেছ। সত্যি কথা হচ্ছে পরিবেশ ও জলবায়ু অনুসারে জঙ্গলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও পশুপাখি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ গুজরাতের গীর জঙ্গলে সিংহ থাকার সময়ে হিমালয়ের বিভিন্ন জঙ্গলে চমরি গোরু দেখা যায়। ঘন জঙ্গলে বাঘ থাকার সময় তৃণভূমি অঞ্চল হরিণ, খরগোশ-এর মতো পশু বাস করে।

সমুদ্র তীরের জঙ্গলে ঝাউ, হোদল, নারিকেল গাছ থাকার সময়ে মাল অঞ্চলে শাল, পিয়াশাল ও মহুল গাছ দেখা যায়। পুরীর সমুদ্রকূলে কোন্ গাছ অধিক পরিমাণে দেখে থাকো লেখো।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৬.৬

তোমার গ্রাম বা শহরের নিকটে থাকা জঙ্গলে শিক্ষক / বাবা / মা-এর সঙ্গে ঘুরতে যাও। সে জঙ্গলে কোনো কোনো সব গাছ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ দেখলে তার তালিকা করো।

তুমি জানবে বানর ও পাখিরা গাছের ডালে থাকে। সাপ, ইঁদুরের মতন প্রাণী গর্তে থাকে।

জঙ্গলে গেলে তোমরা দেখবে যে জঙ্গলের সীমারেখায় কম উচ্চতার গাছ থাকার সময়ে মাঝখানের অঞ্চলে খুব লম্বা গাছ থাকে। জঙ্গলের মাঝখান অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখায়। এমন কেন হয় চিন্তা করো।

১৬.২ ঘন জঙ্গলের চিত্র:

জঙ্গলের মধ্যভাগে বড় বড় গাছ থাকে। গাছগুলির শাখাপ্রশাখা ডালপাতা এত লাগালাগি হয়ে থাকে যে গাছের অগ্র সব মিশে একটা চাদরের মতো ঢেকে রেখে থাকে। এই কারণে ঘন জঙ্গলের মাঝখানে সূর্যকিরণ মাটিতে পড়তে পারে না ও সেখানে দিনের বেলাও অন্ধকার লাগে।

জঙ্গলে বিভিন্ন রকমের গাছ, পশু ও পাখি থাকলে জানলে। এদের ছাড়াও জঙ্গলে আর কী থাকে? গাছ থেকে ঝরে মাটিতে পড়া পাতা, ফুল, ফল, ডাল ও বিভিন্ন পশুপাখির মৃত শরীর কোথায় যায়? এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটা সরল পরীক্ষা করো।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১৬.৩

তোমার ঘর বা বিদ্যালয়ের বাগানে মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত করো। সেই গর্তে আজেবাজে গাছ ও ঘাস পড়ে থাকা পাতা, আনাজ, ফলের খোসা ফেলো ও তার ওপর মাটি চাপা দাও। চার-পাঁচ দিন পর মাটি বের করে দেখো, গর্তের ভিতর থেকে কেমন দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। গর্তের ভেতরটা গরম লাগছে কি? তুমি ফেলে থাকা ঘাস, ডালপালা ও খোসা ইত্যাদির অবস্থা কী হয়েছে? এমন কেন হল? বাবা-মা-শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে খাতায় লিখে রাখো।

সেইভাবে জঙ্গলেও পাতা, ডাল ও মৃতপ্রাণীদের শরীর কিছুদিন পর পচে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়। এটা কীভাবে ও কেন হয়? তুমি গর্ত খুঁড়ে করে থাকা পরীক্ষায় যে কারণে ও যেভাবে ঘাস, আনাজের খোসা ইত্যাদি পচে গিয়েছিল ঠিক সেই কারণে জীবের মৃত শরীর জঙ্গলে পচে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়। খালি চোখে দেখতে না পাওয়া অনেক অণুবীজ মাটি, জল ও বায়ুতে থাকে। এই শ্রেণীর কিছু অণুবীজ পরজীবী ও কিছু মৃতোপজীবী এটা তুমি আগে পড়েছ। এদের মধ্যে মৃতোপজীবী অণুজীবরা মৃতজীব শরীরকে পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে অপঘটন (Decomposition) ও ইহা করতে থাকা মৃতোপজীবীদের অপঘটক বলে (Decomposer) কিছু বীজাণু ও কবক এই শ্রেণীর অপঘটক ও তারা আমাদের বন্ধু।

বলো দেখি? এ পৃথিবীতে বীজাণু ও কবকের মতো অপঘটক আদৌ না থাকলে কী সব সুবিধে বা অসুবিধে হত?

১৬.৩ জঙ্গল ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য

কয়েকবছর হল জঙ্গল থেকে হাতির দল গ্রাম ও শহরে এসে ধনজীবন নষ্ট করতে থাকার খবর তোমরা পড়ে থাকবে বা টেলিভিশনে দেখে থাকবে। কয়েক প্রজাতির পশু ও পাখি আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে ও বছরভর গরম লাগছে। আগের মতো ছয় ঋতু আর অনুভূত হচ্ছে না। অনিয়মিত বর্ষা হওয়া, কম সময়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে বন্যা হওয়া, খুব কম বৃষ্টি হয়ে খরা হওয়া, মহাবাত্যা, সুনামির মতন ভয়ংকর প্রাকৃতির বিপর্যয় অধিক ঘটতে থাকা লক্ষ করা যাচ্ছে। এমন সব বিপর্যয় এখন কেন অধিক ঘটছে। আগে কেন এমন বিপর্যয় এত বেশি ঘটত না? এই প্রশ্নগুলো এখন পৃথিবীর সব দেশের লোকেদের চিন্তা বাড়িয়ে ফেলেছেন। বৈজ্ঞানিকদের মতে 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য' ব্যাহত হওয়ার জন্যেই এমন ঘটেছে। এই প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অর্থ কী? জঙ্গলের সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কী সম্পর্ক আছে? তুমি নিজের চারপাশে থাকা পরিবেশকে লক্ষ করে চিন্তা করলে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবে।

আমাদের বাস করা পৃথিবী অজৈব ও জৈব দুপ্রকার উপাদানে গঠিত। অঙ্গারকাম্ল, উদযান, অম্লজানের মতন সমস্ত গ্যাস, লৌহ, ক্যালশিয়ামের মতন সমস্ত ধাতু সালফার, ফসফরাসের মতন সমস্ত অধাতু, জল, বায়ু, মাটি, তাপ ও আলোকশক্তি আর্দ্রতা ইত্যাদি অজৈব পদার্থ পৃথিবীর উপাদান। সমস্ত প্রকারের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব, জৈবিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

এই অজৈব ও জৈব উপাদান পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল। কত পরিমাণে অজৈব উপাদান কোনরূপে থাকলে জীবজগৎ সুস্থভাবে থাকবে, তা প্রকৃতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে। সেই জৈব উপাদানগুলির অনুপাত প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এই আনুপাতিক সংখ্যা বা পরিমাণের ভারসাম্যকেই 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য' বলা হয়। এই ভারসাম্য কোনো কারণে ব্যাহত হলে, (কোনো এক উপাদানের পরিমাণ অতিমাত্রায় কম বা বেশি হয়ে গেলে), তার কুপ্রভাব পরিবেশে ও সমগ্র জীবজগতের ওপর পড়ে। এর ফলস্বরূপ অনেক অস্বাভাবিক বা অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারকাম্লের পরিমাণ নিতে পারি। আমরা আগের থেকে জানিয়ে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ হল ০.০৪ শতাংশ। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জঙ্গলক্ষয়, অধিকগাড়ি, মোটর ও কলকারখানার জন্যে অঙ্গারকাম্লের মাত্রা বাড়ছে। এর পরিমাণ বাড়ায় তাপমাত্রা বাড়ছে ও শীতঋতুতেও শীত না লেগে গরম লাগছে।

হাতির দল গ্রামের থেকে শহরে চলে আসা, শীতের দিনে গরমলাগা, অনিয়মিত বর্ষা হওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি অস্বাভাবিক ঘটনার উদাহরণ। সবের মুখ্য কারণ হল ''প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়ে যাওয়া।''

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করায় জঙ্গলের এক মহত্ত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে। জঙ্গল কম হলে, কার পরিমাণ কমে যায় ও কার বেড়ে যায় তোমরা আগে থেকেই জানো। যে হারে জঙ্গলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, এরকম আর কিছু বছর হলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে ও সময়ক্রমে এ পৃথিবী, আমাদের জন্যে আর বাসযোগ্য হয়ে থাকতে পারবে না।

চিন্তা করো: যেসব কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে, তার থেকে চারটি লেখো। এর জন্যে মুখ্যত কে দায়ী ও কীভাবে দায়ী যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

জঙ্গল কীভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চিত্রে দেওয়া কিছু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে লক্ষ করলে বুঝতে পারবে।

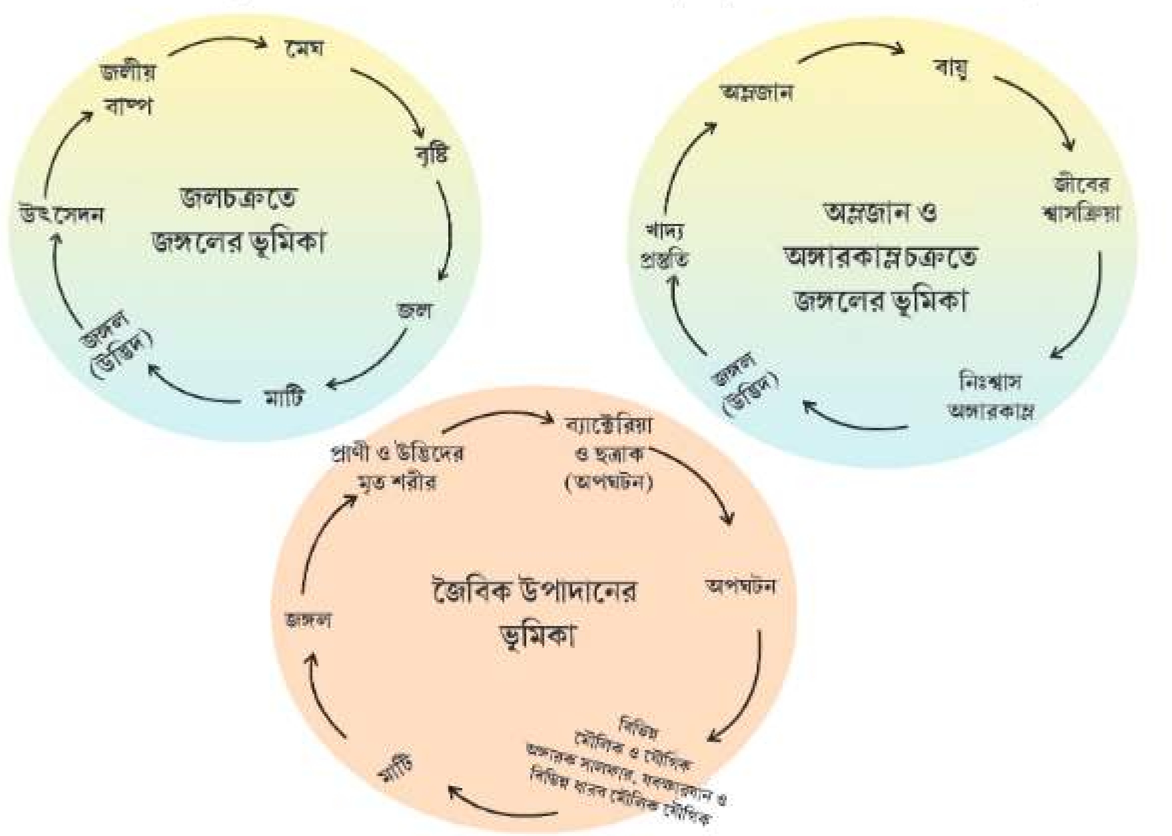

এসব চক্রকে পরিবেশীয় চক্র বলা হয়। সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার চক্র থেকে জল, বায়ু, মাটিতে থাকা পোষকের পরিমাণ ও রূপ ঠিক রাখতে জঙ্গল কীভাবে সক্রিয় সাহায্য করে তোমরা জানলে।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১৬.৪

জঙ্গল কীভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে দেখানোর জন্যে পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া চক্রের মতো আর কয়েকটা চক্র বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি করো ও তোমার শ্রেণীর দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখো।

১৬.৪ আমাদের রাজ্য ও দেশের জঙ্গল সম্পদ

আমাদের দেশ ভাতরবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার সময়ে এর প্রায় ৪৫ শতাংশ ভূমি জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। ক্রমান্বয়ে তা হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশ হয়েছে। এক সর্বেক্ষণ অনুযায়ী প্রত্যেকদিন আমাদের দেশে মোটামুটি ৩৭৫ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে।

সেরকম আমাদের ওড়িশায় ২০০৫ সালের প্রায় ৫৮,১৩৬,২৩ বর্গকিলোমিটার বা প্রায় ৩৭.৭৪ শতাংশ ভূমিতে জঙ্গল থাকার কালে এটা হ্রাস পেয়ে ২০০৮ সালে প্রায় ৪৮,৩৭৪ বর্গকিমি বা প্রায় ৩১.০৭ শতাংশ ভাগে কমে এসেছে। এখন (ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সাল অবধি) ৪৮, ৮৫৫ বর্গকিমি বা প্রায় ৩১.৩৮ শতাংশ।

পৃথিবীতে আদিম কাল থেকে যত জঙ্গল ছিল তার প্রায় ৮০ শতাংশ জঙ্গল নষ্ট হয়ে গেছে।

এক হিসেব থেকে জানা যায় যে, আমাদের দেশে জঙ্গল থেকে বার্ষিক প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের জ্বালানি কাঠ, কাঠের গুঁড়ি ওষধির বৃক্ষ ঝুনো, মহুল, বাঁশ, কেন্দুপাতা ও গালা ইত্যাদি জিনিস পাওয়া যায়। এছাড়া জঙ্গল থেকে পাওয়া অম্লজান, অঙ্গারকাম্ল বিনিয়োগ, সমগ্র জীবজগতের জন্যে খাদ্য, বর্ষা, মৃত্তিকা সংরক্ষণে সহায়তার মতো উপকারের মূল্য কল্পনা করলে তা ৪০ হাজার কোটি টাকার থেকেও অধিক হবে। জঙ্গল আমাদের কতটা ও কেমনভাবে উপকার করে এর থেকে তুমি অনুমান করে কল্পনা করো।

যে জঙ্গল আমাদের এত উপকার করছে তাকে আমরা নিজেই ধ্বংস করে চলেছি। জঙ্গলক্ষয় হবার জন্যে আমাদের দেশে বাঘ, বুনো গাধা, কাশ্মীরি সম্বর, কস্তুরীমৃগ, বালিহরিণ, ঘর চড়ুই, বিষাক্ত সাপ, শঙ্খচিল, শকুনের মতো অনেক প্রাণীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পেতে চলেছে।

১৬.৪.১ জঙ্গল ক্ষয়ের কারণ:

চাষ জমি, কলকারখানা স্থাপন, বাসগৃহ, রাস্তাঘাট, মানুষের জঙ্গলজাত সামগ্রীর আবশ্যকতায় বৃদ্ধি ও অর্থ উপার্জনের জন্য জঙ্গল ধ্বংস হতে লেগেছে। জনসংখ্যা বাড়ার জন্যে আমাদের উপরোক্ত আবশ্যকতাগুলো বেড়ে বেড়ে চলেছে ও এর জন্যে আমরা অবারিতভাবে জঙ্গল সম্পর্কে ধ্বংস করতে লেগেছে। এছাড়া জঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়া ও জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার অন্য এক কারণ।

তোমাদের জন্যে কাজ: ১৬.৫

তোমাদের গ্রামে বা শহরের কাছে আগে কত জঙ্গল ছিল, জঙ্গলে কোন জাতের উদ্ভিদ ও পশুপাখি ছিল তালিকা করো। বর্তমান কোন সব উদ্ভিদ ও পশুপাখি আছে ও জঙ্গল (উদ্ভিদ ও পশুপাখি) ক্ষয় হওয়ার প্রভৃতি কারণগুলিকে বয়স্কদের সঙ্গে আলাচনা করে লেখো।

১৬.৫ জঙ্গল সম্পদের সুরক্ষা

আমাদের দেশের জঙ্গল সুরক্ষার জন্যে 'জঙ্গল নিয়ম' ও 'জাতীয় জঙ্গলনীতি' ফলিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৭২ সালে 'বন্যজীবন সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করা হয়, ১৯৯১-এ ইহার সংশোধন করা হয়েছে। এখানে বন্যজন্তু শিকার, বন্যজীবদের চামড়া, হাড়, দাঁত প্রভৃতির ব্যবসা ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জঙ্গল সুরক্ষার জন্যে আমাদের দেশে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ৮০-র থেকে অধিক জাতীয় উদ্যান, ৫১৫টি অভয়ারণ্য ও ১৮টি জীবমণ্ডল সংরক্ষিত সংস্থা রয়েছে। এই সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লেগেছে। আমাদের রাজ্য ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার শিমলিশালকে এক সংরক্ষিত জীবমণ্ডল কেন্দ্রাপাড়া জেলার ভিতর কণিকাকে এক জাতীয় উদ্যান ও চিল্কা হ্রদকে বিদেশ থেকে আসা পাখিদের জন্যে এক অভয়ারণ্য রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গল সম্পদের সুরক্ষার জন্যে কেবল সরকারি নীতি, আইন ও কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। এই আইন ও কার্যক্রমগুলি সফল ও ফলপ্রদভাবে কার্যকারী হওয়ার জন্যে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া ও আমরা সকলে এর জন্যে পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

তোমাদের জন্যে কাজ ১৬.৬

তোমরা একজন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিরূপে জঙ্গল সম্পদের সুরক্ষার জন্যে কীসব পদক্ষেপ নিতে পারবে, শিক্ষক, পিতা, মাতা, সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধব ও জঙ্গল বিভাগের কর্মচারী ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো। সেই পদক্ষেপগুলির মধ্যে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করো। যেমন প্রত্যেক বছর তুমি কিছু আম, কাঁঠাল, নিম, জামরুল ইত্যাদি গাছ লাগাও এবং সেই গাছগুলো বড় হওয়া পর্যন্ত তার যত্ন নাও। জঙ্গলক্ষয় বন্ধ করার সঙ্গে নতুন জঙ্গল সৃষ্টি করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই জন্যে সামাজিক বনীকরণ প্রকল্পকে অধিক সক্রিয় করতে হবে।

কী শিখলে ?

- জঙ্গল থেকে আমরা কাঠ, পাতা, ফুল, ফল, গালা, ঝুনো ইত্যাদি পেয়ে থাকি।
- জঙ্গলে থাকা উদ্ভিদ সমগ্র জীবজগতের জন্যে খাদ্য ও অম্লজান জোগায়।
- অঙ্গারকাম্ল ব্যবহার করে বায়ুপ্রদূষিত ও গরম হওয়া থেকে জঙ্গল রক্ষা করে।
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে জঙ্গলের ভূমিকা মহত্ত্বপূর্ণ।
- জঙ্গলে বিভিন্ন প্রকার গাছ, পশুপাখি বাস করে।
- আমাদের এত উপকার করা জঙ্গলকে আমরাই ধ্বংস করে চলেছি।
- সুস্থ পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা ও আমাদের অনেক দরকারি জিনিস পাওয়ার জন্যে জঙ্গলের সুরক্ষা করা প্রায়োজন।
- জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত জীবমণ্ডল ইত্যাদি প্রকল্প সরকারের দ্বারা কার্যকরী হচ্ছে।
- কেবল সরকার নয়, আমরা সকলে ও তোমরা সুরক্ষার জন্যে পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক ও সামাজিক বনীকরণ প্রকল্পের সক্রিয় সভ্য হওয়া দরকার।

অভ্যাস

১. নিম্নে দেওয়া প্রত্যেক ব্যবহার্য জিনিসের জন্যে জঙ্গলে থাকা তিনটি উদ্ভিদের নাম লেখো:

(ক) কাঠ

(খ) ফল

(গ) পাতা

২. জঙ্গলকে কেন প্রাকৃতিক সম্পদ বলব উদাহরণের সঙ্গে দর্শাও।

৩. নিম্নে দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অশেষ ও সীমিত সম্পদরূপে বর্গীকরণ করো।

কয়লা, বাঘ, কুমির, হত্তুকি গাছ, চিল, হাতি, খনিজ তেল, সূর্যালোক, মাটি, বাতাস।

৪. 'শীতের দিনে গরম লাগা' বা 'হাতির দল গ্রামে বা শহরে এসে জনজীবন নষ্ট করা'র মতন পরিস্থিতি 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য' ব্যাহত হওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণে আর কোন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখো।

৫. 'জঙ্গল সম্পদের সুরক্ষা' আমাদের তিষ্টে থাকার জন্য আবশ্যক। তুমি কারণ দিয়ে দর্শাও।

৬. জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার পিছনে পাঁচটি কারণ লেখো। (প্রত্যেক কারণ একটি বাক্যে লেখো)

(ক) আমাদের কোনো পশুর চামড়ায় তৈরি জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়।

কারণ:

(খ) পৃথিবীপৃষ্ঠে বিলুপ্ত ডাইনোসরের মতন 'বাঘ' প্রজাতির পশু লোপ পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কারণ:

(গ) 'প্রকৃতিক ভারসাম্য' পুনঃস্থাপিত করে মানুষ ভবিষ্যতে এক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

কারণ:

(ঘ) তুমি পরিবেশ অবক্ষয় ও প্রদূষণ বন্ধ করার জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারবে বলে শিক্ষক বিশ্বাস করেন।

কারণ:

ঘরে করার জন্যে কাজ:

বর্তমান রাস্তা চওড়া হওয়ার জন্যে রাস্তার পাশে থাকা গাছগুলিকে কেটে দেওয়া হচ্ছে। কোন্ সময়ে ও কোন্ প্রকার গাছ লাগালে আমরা আবার পরিবেশকে সবুজ ও সুন্দর করতে পারব?

●●●

সপ্তদশ অধ্যায়

আবর্জনার পরিচালনা

তোমরা বিভিন্ন আবর্জনা বিষয়ে পূর্বে পড়েছ। আবর্জনা সাধারণত তিন প্রকার: গ্যাসীয়, কঠিন ও তরল। গ্যাসীয় আবর্জনা গাড়ি, মোটর, কলকারখানা ইত্যাদির থেকে বেরিয়ে থাকে। ইহা বায়ু প্রদূষণ করে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের গৃহোপকরণ যথা: হাঁড়ি, কলসি, কাচ, প্লাস্টিক থেকে তৈরি জিনিসপত্র বিভিন্ন অব্যবহৃত যন্ত্রাংশ, পাকাঘর নির্মাণের পদার্থ বিভিন্ন স্থানে ফেলে দিয়ে থাকি। ইহা কঠিন আবর্জনা সৃষ্টি করে থাকে। আমরা কঠিন আবর্জনা ও গ্যাসীয় আবর্জনার বিষয়ে আগের থেকে জানি।

তোমাদের জন্য কাজ ১৭.১

তুমি পাঁচটি সাদা কাচের শিশি নাও। (ইঞ্জেকশনের শিশি কিংবা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি) স্নানের জল, বাসনধোয়া জল, নালার জল, ঘরধোয়া জলের থেকে কিছু কিছু এনে সাদা কাচের শিশিতে রাখো। কোন্ শিশিতে কোন্ জল রাখলে, জানার জন্য ছোট ছোট কাগজে লিখে শিশিতে লাগাও।

কিছু সময় রাখার পর শিশিতে থাকা জলকে লক্ষ করো। কী দেখছ?

- প্রত্যেক শিশিতে থাকা জলের রং এক রকম আছে কি?
- এই জল গন্ধ হচ্ছে কি?
- শিশির তলায় কিছু বসে গেছে কি? এই পদার্থে কী সব থাকতে পারে?
- এসব প্রকারের জলকে আমরা বিশুদ্ধ জল বলতে পারব কি? এই জলকে আমরা দূষিত জল বলব।

তুমি কোনোদিন চিন্তা করেছ, এই অপরিষ্কার জল সব কোথায় যায়? কী হয়? এই জলকে আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়। এই জলে মিশে থাকা বর্জ্যবস্তুকে নিষ্কাশন করে পরিষ্কার করার পর ব্যবহার করা উচিত।

১৭.১ বিশুদ্ধ জল:

আমরা সবাই বিশুদ্ধ জলকে পানীয়রূপে ব্যবহার করি।

তোমাদের জন্য কাজ ১৭.২

বিশুদ্ধ জলের অন্য তিনটি ব্যবহার লেখো।

গবেষণা থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীর কোটি কোটি লোক পানীয়যোগ্য বিশুদ্ধ জল একটু পান করতে পায় না। দূষিত জল ব্যবহার করে লোকেরা জলবাহিত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। তুমি আগের পড়েছ, মেয়ে ও স্ত্রীলোকরা পানীয় জল আনার জন্যে অনেক দূর হেঁটে হেঁটে যায়। সত্যি এটা বড়ই চিন্তার বিষয়।

বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতাকে অনুভব করার দিকে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে ২০০৫ সালের ২২ মার্চ তারিখকে আমরা 'বিশ্ব জলদিবস' রূপে পালন করে আসছি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে

ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দশক ২০০৫-২০১৫-কে আন্তর্জাতিক স্তরে 'জীবনের জন্যে জল' এর ওপরে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা হবে। সকলকে বিশুদ্ধ পানীয় জল জুগিয়ে দেওয়া এহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

তরল আবর্জনার কারকগুলি জলের সঙ্গে মিশে একে দূষিত করে থাকে। বিভিন্ন কারণ থেকে জল প্রদূষিত হয়ে থাকে। যথা: শিল্পজনিত, কৃষি সম্পর্কিত, গৃহকার্য জনিত।

জলকে বিশুদ্ধ করার অর্থ, জল ব্যবহার করার পূর্বে তাতে মিশে থাকা সমস্ত আবর্জনা নিষ্কাশন করা। অপচয়িত জলের এই প্রক্রিয়াকে জল আবর্জনার উপচার বলা হয়। এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে।

১৭.২ আবর্জনা মিশ্রিত জল:

ঘরের নালা থেকে বয়ে যাওয়া জল, শহরের পায়খানা ও স্নানের ঘর থেকে বেরোনো ময়লা জল, ডাক্তারখানার নালা থেকে বেরোতে থাকা ময়লা জল, তোমাদের বিদ্যালয়ে নালার থেকে বেরোতে থাকা ময়লা জল, রাস্তার দু'পাশে থাকা নালার জল, বৃষ্টির দ্বারা ধুয়ে যাওয়া জল, বর্ষা হওয়ার পর ছাদের থেকে বয়ে আসা জলকে লক্ষ করেছ কি? এসব জলে প্রচুর আবর্জনা মিশে থাকে। এই আবর্জনা মেশা জলকে অপচয়িত জল বলা হয়।

তোমাদের জন্য কাজ: ১৭.৩

অপচয়িত জলে কী কী আবর্জনা সব ভাসতে থাকবে, তোমার বন্ধু ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তর লেখো।

অপচয়িত জলে কিছু দূষিত পদার্থ ঘনীভূত হয়ে থাকে ও কিছু ভাসতে থাকে। সেখানে কিছু হানিকারক জৈবিক ও অজৈবিক পদার্থ থাকে। রোগ সৃষ্টি করা কিছু জীবাণু ও অন্যান্য কিছু অণুবীজও সেখানে থাকে। অপচয়িত জলে থাকা, কতক পদার্থের উদাহরণ নীচে দেওয়া হয়েছে।

- **জৈবিক পদার্থ:** মানুষের মল, পশুপাখির ময়লা, অপরিষ্কার তৈল জাতীয় পদার্থ, পলিথিন, পোকামারা ওষুধ, আনাজের খোসা ইত্যাদি।
- অজৈবিক পদার্থ: মাটি, গুঁড়ি, ছাই, ভাঙা কাচ ইত্যাদি।
- পোষক: নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি ধাতুর যৌগিক থেকে প্রস্তুত সার।
- বীজাণু: কলেরা ও আন্ত্রিক জ্বর সৃষ্টি করা বীজাণু।

সারণী ১৭.১ অপচয়িত জলের আবর্জনা

প্রদূষণকারী উপাদান সর্বেক্ষণ		
আবর্জনার প্রকার	আবর্জনার উৎস	প্রদূষণকারী উপাদান

তোমাদের জন্যে কাজ ১৭.৪

তোমার ঘরে, বিদ্যালয়ে ও আশেপাশে থাকা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখো। জল কীভাবে ঘরের ব্যবহারের জন্য যাচ্ছে এবং ঘরের অপরিষ্কার জল কোন্ রাস্তা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লক্ষ করো।

- একটা খোলা নালাকে লক্ষ করো। দেখো সেখানে কী কী সব জীব আছে?
- ঘর থেকে অপরিষ্কার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে লক্ষ করো। যদি তোমার পাড়ায় বা কলোনিতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকে তবে দেখো প্রত্যেক ঘর থেকে বেরোতে থাকা অপরিষ্কার জল কোন্খানে জমা হচ্ছে?
- জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করার জন্যে ঘরের লোক ও প্রতিবেশীদের সাহায্য নাও।
- বাগানে বা সোকপিটে যাওয়া নালাকে পরিষ্কার রাখতে বলো।
- আবর্জনাগুলি পুঁতে ফেলতে লোকেদের সাহায্য করো।
- বিদ্যালয়ের চারপাশে কোনো নিচু জমি থাকলে জল জমার স্ভাবনা থাকে। সে জায়গায় মাটি বা বালি ফেলে সমতল করো ও পরিষ্কার রাখো।
- বিদ্যালয়ে তোমার শ্রেণী ও উপরের শ্রেণীর বাচ্চারা, শিক্ষকের সহায়তায় মিশে সোকপিট তৈরি করো।
- বিদ্যালয়ের ছাতের থেকে পড়া বর্ষার জলকে বয়ে যাওয়া নষ্ট হতে না দিয়ে সঞ্চয় করে রাখো। প্রদত্ত চিত্র দেখো।

চিত্র ১৭.১ বৃষ্টির জলের সংরক্ষণ

- বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গাছ লাগাও। সেখানে জমতে থাকা জল ব্যবহার করো।

১৭.৩ দূষিত জলের উপচার:

দূষিত জল ব্যবহারযোগ্য করার জন্য কী কী সব করা হয়, সে বিষয়ে শিক্ষক বাচ্চাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে সূচনা দেবে। বাচ্চারা সূচনা অনুযায়ী কাজ করবে ও পর্যবেক্ষণ করবে তাকে খাতায় লিখে রাখবে।

(চিত্র ১৭.২)

তোমাদের জন্যে কাজ ১৭.৪

একটা বড় কাচের জারে অর্ধেক থেকে অধিক জল নাও। সেখানে কিছু ঘাস, কমলার খোসা, সার্ফের গুঁড়ো, কালি বা আলতা দুফোঁটা মেশাও। জারের মুখ বন্ধ করে জোরে নাড়িয়ে দাও। এই জারকে রোদে দুদিনের জন্যে রেখে দাও। দুদিন পরে পুনর্বার জারকে নাড়িয়ে, সেখানে কিছু মিশ্রণ এনে কাচের নালি (Test Tube)-তে রাখো। তার গন্ধ কেমন শুঁকে খাতায় লেখো। এই কাচের নালির নাম 'ক' দাও। (কাগজে 'ক' লিখে তার ওপর লাগাও)

এই মিশ্রণকে বারবার ঘাঁটার জন্যে কাচের পাত্রে একটা পাতলা সরু কাচের বড় বা সরু কাঠির সাহায্যে বারবার ঘাঁটো। এই ভাবে একরাত রেখে দাও।

তার পরের দিন সেখানে কিছু মিশ্রণ এনে দ্বিতীয় কাচের নালীতে রাখো। এর নামকরণ করো 'খ'।

একটা ফানেল নিয়ে তার ভেতরে পরিস্রবণ (ফিল্টার যেমন) কাগজকে ভাঁজ করে ফানেলে লাগাও। একে কাচের বিকারে রেখে দাও। চিত্র ১৭.২-তে দর্শানোর মতো ফানেলের ভেতর সরু বালি, ছোট কাঁকর ও ওপরে বড় বড় কাঁকর রাখো।

কাচের নালী 'খ'-এ রেখে দেওয়ার পর যে মিশ্রণ বেশি হল সেই মিশ্রণকে ফানেলের ভেতরে ঢালো। ঢালার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করবে যেন পরিস্রবণ কাগজের ওপরে দ্রবণ উঠে না যায়।

পরিষ্কার জল পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াকে দু-তিনবার করো।

এই উপায়ে ছাঁকা হওয়া পরিষ্কার জলকে আর দুটি কাচের নালীতে রেখে তার নাম 'গ' ও 'ঘ' বলে কাগজে লিখে কাচনালীতে লাগাও।

'ঘ' কাচনালীতে নিয়ে থাকা জলের ভেতরে একটা ক্লোরিন বটিকা ফেলো। ভালো করে মেশানো পর্যন্ত নাড়ো।

চারটি কাচের নালী (ক, খ, গ, ঘ)-তে থাকা জলকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো। শুঁকে দেখো। তারপর নীচে লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর খাতায় লেখো।

প্রশ্ন ১: 'ক' ও 'খ' কাচনালীতে থাকা জলে কী পরিবর্তন দেখছ।

প্রশ্ন ২: 'ক' ও 'খ' কাচনালীতে থাকা জলের গন্ধে কিছু পরিবর্তন অনুভব করছ কি?

প্রশ্ন ৩: পরিস্রবণ কাগজে কী কী সব থেকে গেল?

প্রশ্ন ৪: ক্লোরিন বটিকা ফেলার দরুন দ্রবণের রঙের কোনো পরিবর্তন হল কি?

প্রশ্ন ৫: ক্লোরিনের কোনো গন্ধ আছে কি? ইহার গন্ধ ও অপরিষ্কার জলের গন্ধের মধ্যে কোন্‌টি বিরক্তিকর?

১৭.৪ পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য:

সাধারণত মানুষদের দ্বারাই অধিক আবর্জনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে আমাদের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন প্রকারের আবর্জনার পরিমাণকে কম করতে পারব। নালা থেকে বেরোনো দুর্গন্ধ অত্যন্ত বিরক্তিকর। বর্ষাকালে খোলা থাকা নালায় অধিক জল ঢোকার জন্যে নালার আবর্জনা সব রাস্তার ওপরে উঠে এসে জমা হয়ে যায়। (তাই রাস্তায় হাঁটা কষ্টকর হয়ে ওঠে। পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়।) কারণ মশা, মাছি এবং অন্যান্য জীবাণু এখানে বংশবিস্তার আরম্ভ করে। একজন সচেতন ও উত্তম নাগরিক হিসেবে, তোমাদের পৌর পরিষদ কর্মচারীকে খবর দিয়ে নালা, রাস্তা ও সম্পূর্ণ পরিবেশকে পরিষ্কার ও বিশোধন করার ব্যবস্থা করানো উচিত। গ্রাম পঞ্চায়েত, সরপঞ্চকে অনুরোধ করে খোলা থাকা নালাগুলিকে ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা আবশ্যক। তোমার প্রতিবেশীর কারো যদি নালা ভর্তি হয়ে যায়, দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে, তবে তাদের সচেতন করানো উচিত।

তুমি জানো কি?

ইউক্যালিপ্টাস গাছ নালা, নর্দমার কাছে লাগানো উচিত। কারণ ইহা সব থেকে অধিক পরিমাণে অপরিষ্কার জল খুব তাড়াতাড়ি শোষণ করতে পারে এবং পরিষ্কার বাষ্প বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে থাকে।

১৭.৪ আবর্জনা নিষ্কাশনের উত্তম মার্গ (উপায়):

- নালীতে অদরকারি তৈলজাতীয় পদার্থ তেল, ঘি ইত্যাদি ফেলবে না। ইহা মাটিতে জল শোষণে বাধা সৃষ্টি করে। মাটির উপর স্তরে লেগে থাকে।
- গাড়ির তেল, পোকামারা ওষুধ, বিভিন্ন রকমের রং ইত্যাদিকে নালায় ফেলা উচিত নয়। ইহা অনেক অণুবীজকে মেরে ফেলে, যারা জল পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।
- ঘরে ব্যবহার হওয়া পলিথিন, ছেঁড়া কাপড়, তুলো, ভাঙা পুতুল ইত্যাদিকে নালায় না ফেলে ডাস্টাবিনে ফেলবে। নালায় ফেললে নালার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
- সহজেই মাটিতে মিশে যাওয়া পদার্থের জন্যে 'সবুজ' রংও মাটিতে না মেশা পদার্থের জন্যে 'লাল' রঙের ডাস্টবিন উভয় ঘরে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার করবে।

১৭.৫ পায়খানার ব্যবহার:

পরিমল ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে সকলে স্বচ্ছ পায়খানায় মলত্যাগ করা উচিত। এর জন্যে সকলকে সচেতন করা আবশ্যক। যথাসম্ভব গ্রামাঞ্চলেও সকলের পায়খানা ব্যবহার করা উচিত। ঘরে পায়খানা না থাকলে খোলা জায়গায় মলত্যাগের পরে বালি কিংবা মাটির দ্বারা ঢেকে দেওয়া উচিত। বাগানে গর্ত খুঁড়ে ঘর কুয়োর থেকে দূরে বরপালি পায়খানা তৈরি করবে। এবং তার চারদিকে বেড়া দিয়ে দেবে। গর্তটি ভর্তি হয়ে গেলে বরপালি তুলে অন্য জায়গায় বসাবে। আজকাল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি প্রত্যেক গ্রামে ময়লা নিরাপদ নিষ্কাশনের জন্যে সেফটিক ট্যাঙ্ক করে পায়খানা তৈরি করে দিচ্ছে। নিষ্কাশন মলকে পাইপের সাহায্যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের সহিত সংযুক্ত করে সেখান থেকে বিদ্যুৎ শক্তি, তাপশক্তি উৎপন্ন করে ব্যবহার করছেন।

বলো দেখি, উড়োজাহাজে যাওয়া লোকেরা কোথায় ও কীভাবে মলত্যাগ করে?

১৭.৫.১ সর্বসাধারণ স্থানে পরিমল ব্যবস্থা:

আমাদের অঞ্চলে, আমরা কতকগুলো পার্বণ, মেলা, মহোৎসব পালন করে থাকি। সেখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়। সেরকম হাটবাজার, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ডাক্তারখানা ও বিমানঘাঁটিতে অনেক লোক ভিড়

জমায়। এসব জায়গায় প্রত্যেকদিন হাজার হাজার লোক যাতায়াত করেন। তাই এখানে অধিক পরিমাণে আবর্জনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসবের উপযুক্ত নিষ্কাশন ও বিশোধন একান্ত আবশ্যক। এরকম না করলে চতুর্দিকে মহামারি রোগ ছড়িয়ে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে।

সরকারের তরফ থেকে পরিমল ব্যবস্থার জন্যে অনেক নিয়ম থাকলেও লোকেরা মানেন না। আমাদের সকলে এর দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। নিজে সচেতন হয়ে অন্যদের সচেতন করা উচিত। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্যে আলাদা আলাদা পায়খানা ও প্রস্রাবাগার থাকা উচিত। আজকাল বড় বড় শহরে ভ্রাম্যমাণ পায়খানা তৈরি হয়েছে। তাতে চাকা লাগানো থাকে। বাজারহাট, মেলা, মহোৎসব হওয়ার স্থানে ভ্রাম্যমাণ পায়খানা ও প্রস্রাবাগার রাখা হওয়ার দ্বারা লোকেরা এদিক-ওদিক মলমূত্র ত্যাগ না করে একে ব্যবহার করলে পরিবেশ পরিষ্কার থাকবে। ভর্তি হয়ে গেলে গাড়ি উপযুক্ত স্থানে ময়লা নিষ্কাশন করে দেয়।

আমাদের পরিবেশকে সুস্থ ও পরিষ্কার রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য। জলের উপযুক্ত ব্যবহার ও নিষ্কাশনের জন্যে আমাদের অভ্যাস করা দরকার। পরিবেশ পরিবর্তনে তোমার কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করলে নিজের পরিবেশকে প্রদূষণমুক্ত করতে পারবে।

মনে রাখো:

- চপ্পল পরে পায়খানায় যাবে।
- মলত্যাগ করার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোবে।
- পায়খানায় মলত্যাগ করার পূর্বে ও পরে জল ঢালবে।
- পায়খানায় বালতি, মগ, সাবান ও জল রাখবে।
- নিয়মিত ব্যবধানে পায়খানা পরিষ্কার করবে।

১৭.৬ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রোগ:

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষিত জল সমস্ত রোগের প্রধান কারণ। আমাদের দেশেও আজকাল অনেক জায়গায় মলত্যাগের জন্যে সুব্যবস্থা করা যেতে পারছে না। অধিকাংশ লোক মাঠে, নদীর কূলে, রেল লাইনে ওপর, রাস্তার ধারে এমনকি সোজাসাপটা জলের মধ্যে মলত্যাগ করেন। এর দ্বারা বায়ু, উভয় মাটির তল ও ওপরে থাকা জল দূষিত হয়ে থাকে। ফলে জলবাহিত রোগ যথা: কলেরা, আন্ত্রিক জ্বর (টাইফয়েড), কামল জন্ডিস (ন্যাবা) ও চর্মরোগ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

আবার খালিপায়ে পায়খানা গেলে মলে থাকা কৃমি পায়ের চামড়া দিয়ে শরীরের ভেতর প্রবেশ করে নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে।

মনে রাখো:

- খোলা জায়গায় বা মাঠে মলত্যাগ করলে তা বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদী, পুকুর ও ক্যানেলের জলে মেশে। সেখানে থাকা নানা প্রকার রোগ জীবাণু কৃমির ডিম ও নানা বিষাক্ত পদার্থ জলকে দূষিত করে।
- দূষিত জল পান করলে এবং সেখানে স্নান করলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, চুলকানি ও দাদ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি।

১৭.৭ ব্যবহৃত জলের নিষ্কাশন ও পুনর্ব্যবহার:

- ব্যবহৃত জলকে একটা জায়গায় জমতে না দিয়ে দূরে সোকপিটে দেওয়া বা গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত।

- কুয়ো ও নলকূপের কাছে মাটি ফেলে বা সিমেন্ট চাতাল করে উঁচু করা।
- রান্নার ঘর, স্নানের ঘর থেকে আসা জলকে অন্য দিকে না ছেড়ে সোকপিটে নির্দিষ্ট জায়গায় ছাড়া।
- শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত জলকে এদিক-ওদিক না ছেড়ে মুখ্য নালায় ছাড়া।
- ঘরের ব্যবহৃত জলকে নালা কেটে বাগানে থাকা ফলমূল গাছের গোড়ায় ছেড়ে দাও। ইহা করার দ্বারা তোমার ঘরে নিষ্কাশিত দূষিত জলের সদুপযোগ্য হতে পারবে।

১৭.৮ অপচয়িত জলের উপচার (Treatment of Waste Water):

বর্জ্যবস্তুর পুনরুদ্ধারের পরে এখানে যদি কোনো অনিষ্টকারী পদার্থ থাকা জানা যায়, তবে কিছু উপচার দ্বারা সেগুলিকে নষ্ট করা হয়ে থাকে। এই উপচারের কৌশলগুলিকে কতকগুলো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা: ভৌতিক উপচার (Physical Treatment), রাসায়নিক উপচার (Chemical Treatment), জৈবিক উপচার (Biological Treatment) ঘনীকরণ (Solidification) এবং ভস্মীকরণ (Incineration) ইত্যাদি।

- দিল্লি শহরে আবর্জনা উপচার কারখানায় (Sweage Treatment Plant) জৈবিক গ্যাস (Biogas) উৎপন্ন করে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- গোরুর গোবর, মানুষের মলমূত্র, নালা নর্দমার জল, অদরকারি জলজ উদ্ভিদ, (যথা: পানা) ইত্যাদির থেকে জৈবিক গ্যাস উৎপন্ন করা হয়।

১৭.৯ অপচয়িত জলের পুনঃচক্রন (Waste Recycling) এবং পুনঃবিনিযোগ (Waste Re-Uses)

কলকারখানা থেকে নির্গত জল বা যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত হওয়া জলকে বর্জ্যবস্তু হিসেবে নালা নর্দমার মাধ্যমে সোজা নদী বা সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর দ্বারা অশোধিত জল ও এখানে থাকা মারাত্মক পদার্থ নদী ও সমুদ্র জলের জীবেদের ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে। আজকাল এই অপচয়িত জলকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করা যেতে পারছে। যেমন: ভুবনেশ্বরে বি.ডি.এ, নিকোপার্কে বিভিন্ন নালায় আসা আবর্জনাপূর্ণ নর্দমার জলকে পরিষ্কার করে কৃত্রিম হ্রদ করা হয়েছে। এই হ্রদে নৌকাবিহার ও অন্যান্য জলক্রীড়া করা যেতে পারছে।

১৭.১০ শহরের দূষিত জলের উপচার (Waste Water Treatment Plant):

জৈবিক, ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দূষিত জলকে বিভিন্ন উপচার করা গিয়ে সেখানে থাকা অদরকারি ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থগুলির পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। নিম্নে এমন একটা প্ল্যান্টের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ১৭.৩

১. চিত্র ১৭.৩-এ দেখো, প্রথমে দূষিত জল বারস্ক্রিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে সেখানে থাকা কাঠি, কুটো, প্লাস্টিকের জার, তুলো, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি ছাঁকা হয়ে যায়।

২. তারপর জল আর একটা ট্যাঙ্কে যায়। যেখানে জলে থাকা বালি, গুঁড়ি, সব তলায় চলে যায়।

৩. তারপর জল একটা বড় ট্যাঙ্কিতে থাকে। (চিত্র ১৭.৪ দেখো)। সেখানে বালি ও গুঁড়ি তলায় থেকে যায় ও একটা কুরণী (Scrapper) দ্বারা বেরিয়ে যায়। এখানে মসৃণ আঠা আঠা পাঙ্ক পদার্থকে পাঁক (Sludge)

বলা হয়। জলে ভাসা কঠিন পদার্থ, গাড়ির থেকে বেরিয়ে থাকা তেল ইত্যাদিকে আলাদা করে ব্যবহার করে দেয়। এরপর জল পরিষ্কার দেখা যায়।

তেল মেশা কাদাকে অন্য একটা ট্যাঙ্কিতে নেওয়া হয়। সেখানে থাকা বীজাণুদের দ্বারা ইহা অপঘটিত হয়ে থাকে। অপঘটনের ফলে বেরোতে থাকা গ্যাসকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১৭.৪

এখানে বায়ু প্রবেশ করিয়ে বীজাণুগুলিকে বাড়াতে সাহায্য করা হয়। বীজাণুগুলি পরিষ্কার জলে রয়ে যাওয়া মল, পচাফল, সাবান ও অন্যান্য অদরকারি জৈবিক পদার্থগুলিকে অপঘটন করে দেয়। কিছুক্ষণ এমন করার দ্বারা জলে ভাসতে থাকা এই জিনিসগুলো তলায় বসে যায়। ওপর থেকে জল বের করে দেওয়া হয়।

তলায় বসা মাটি, কাদাকে সাররূপে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার জলকে জীবাণুমুক্ত করার জন্যে সেখানে ক্লোরিন কিংবা ওজোন দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করা হয়।

কী শিখলে ?

- ঘর থেকে, কারখানা থেকে, চাষজমি থেকে, নির্গত ও মানুষের বিভিন্ন ব্যবহার থেকে নির্গত বা নিষ্কাশিত জলকে আমরা অপচয় করে থাকি।
- অপচয়িত একপ্রকার তরল দূষিত পদার্থ যা মাটি জল এবং জমিকে প্রদূষিত করে থাকে।
- দূষিত জলকে বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ায় উপচার করা হয়।
- দূষিত জলে থাকা বিভিন্ন দূষিতকারী উপাদানগুলিকে নিষ্কাশন করে তাকে ব্যবহারযোগ্য করা হয়।
- যেখানে ভূতল নিষ্কাশন সুবিধা নেই, সেখানে কম খরচে সুলভ পরিমল ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।
- দূষিত জলের উপচারের ফলে পটুমাটি ও জৈবিক গ্যাস উপলব্ধ হয়ে থাকে।
- খোলা নালায় মাছি, মশা এবং বিভিন্ন অণুবীজ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেগুলির বিভিন্ন রোগের কারণ।
- খোলা মাঠে পায়খানা না গিয়ে পাকা পায়খানা বা বরপালি পায়খানা ব্যবহার করা আবশ্যক।
- প্রত্যেক আবর্জনার পুনঃচক্রন করে ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারবে।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) জলে দূষিত পদার্থ মিশে থাকলে তাকে — জল বলা হয়।

(খ) দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করার জন্যে — এবং — রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

(গ) কলেরা — ও — কে জলবাহিত রোগ বলা হয়।

(ঘ) দূষিত জলের উপচারের ফলে — ও — বেরোয়।

(ঙ) নালাগুলি — ও — জন্যে জাম হয়ে যায়।

(চ) ঘর থেকে বেরোনো দূষিত জলকে — বলা হয়।

(ছ) দূষিত জলের উপচার — এ করা হয়।

২. কারণ লেখো।

(ক) নালায় রান্নার তেল কিংবা পোড়া মোবিল ইত্যাদি ফেলা উচিত নয়।

(খ) কঠিন আবর্জনা যথা: তুলো, পুতুল, প্লাস্টিক, জরি ইত্যাদি নালায় না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলা উচিত।

(গ) দূষিত জল প্রবাহের স্থানে ইউক্যালিপ্টাস গাছ লাগানো আবশ্যক।

(ঘ) দূষিত জলের উপচারের সময়ে প্রথমে বারস্ক্রিন দিয়ে ছাড়া হয়।

(ঙ) খোলামাঠে মলমূত্র ত্যাগ করা মহামারির কারণ।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রোগের মধ্যে সম্পর্ক কী?

(খ) একজন নাগরিক হিসেবে পরিমল ব্যবস্থার জন্যে তোমার কর্তব্য কী?

(গ) দূষিত জলের পুনর্ব্যবহারের জন্যে তুমি বিদ্যালয়ে কী কী করতে পারবে?

(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশে শ্রেণীগৃহের থেকে বেরোনো আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্যে কী করবে?

(ঙ) তোমাদের বিদ্যালয়ে শৌচালয় বা পায়খানার সদুপযোগের জনে কীসব করবে?

৪. টিপ্পনী লেখো।

- দূষিত জল
- জৈবিক গ্যাস
- জলের উপচার
- খোলা নালার অপকারিতা

৫. অপচয়িত জলে থাকা বিভিন্ন উপাদান থেকে দুটো করে উদাহরণ লেখো।

- জৈবিক পদার্থ ---------- ----------
- পোষক ---------- ----------

- অজৈবিক পদার্থ --------- ---------
- রাসায়নিক পদার্থ --------- ---------
- অণুবীজ --------- ---------

৬. পলিথিন ও প্লাস্টিক নির্মিত পদার্থ ব্যবহারের পরে এদিক-ওদিক না ফেলে পুড়িয়ে দিলে পরিবেশের কী ক্ষতি হয়?

৭. আজকাল দেখতে পাওয়া 'রাস্তা রোকো'র বেলায় রাস্তার মাঝখানে টায়ার জ্বালানো হয়। এর দ্বারা বায়ুমণ্ডলের ওপর কী প্রভাব পড়ে?

৮. পুরোনো ব্যবহার হওয়া টায়ারগুলিকে সাধারণত আমরা অব্যবহৃত জায়গায় পেলে দিই। এর জন্য যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় লেখো।

৯. অণুবীজরা শুকনো পাতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে কী সৃষ্টি করে?

(ক) বালি (খ) ধাতু (গ) হ্যমস (ঘ) কাঠ

১০. কটক ভুবনেশ্বরের মতন বড় বড় শহরে থেকে নির্গত বহু পরিমাণে বাহিত মলকে সদুপযোগ করার জন্য দুটি উপায় লেখো।

ঘরে করার জন্যে কাজ:

প্রত্যেকদিন তোমার পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি:

- দাঁত মাজা
- হাতমুখ ধোয়া
- দাড়ি কাটা
- স্নান করা
- কাপর কাচা
- পায়খানা ব্যবহার করা
- রান্না করা
- অন্যান্য কাজের জন্য কত জল খরচ করেন তা নির্ণয় করো।

এই হিসেবের জন্য নিম্নোক্ত তথ্য ব্যবহার করো।

(এক মগ জল = ৪২৫ মিলিলিটার

এক বালতি জল = ২০ লিটার)

তাই প্রত্যেক ব্যক্তি দৈনিক কত জল খরচ করেন নির্ণয় করো।

এই প্রকল্প গণনায় তোমার পরিবার দৈনিক কত জল খরচ করেন তা তোমার খাতায় লিখে আনো।

●●●

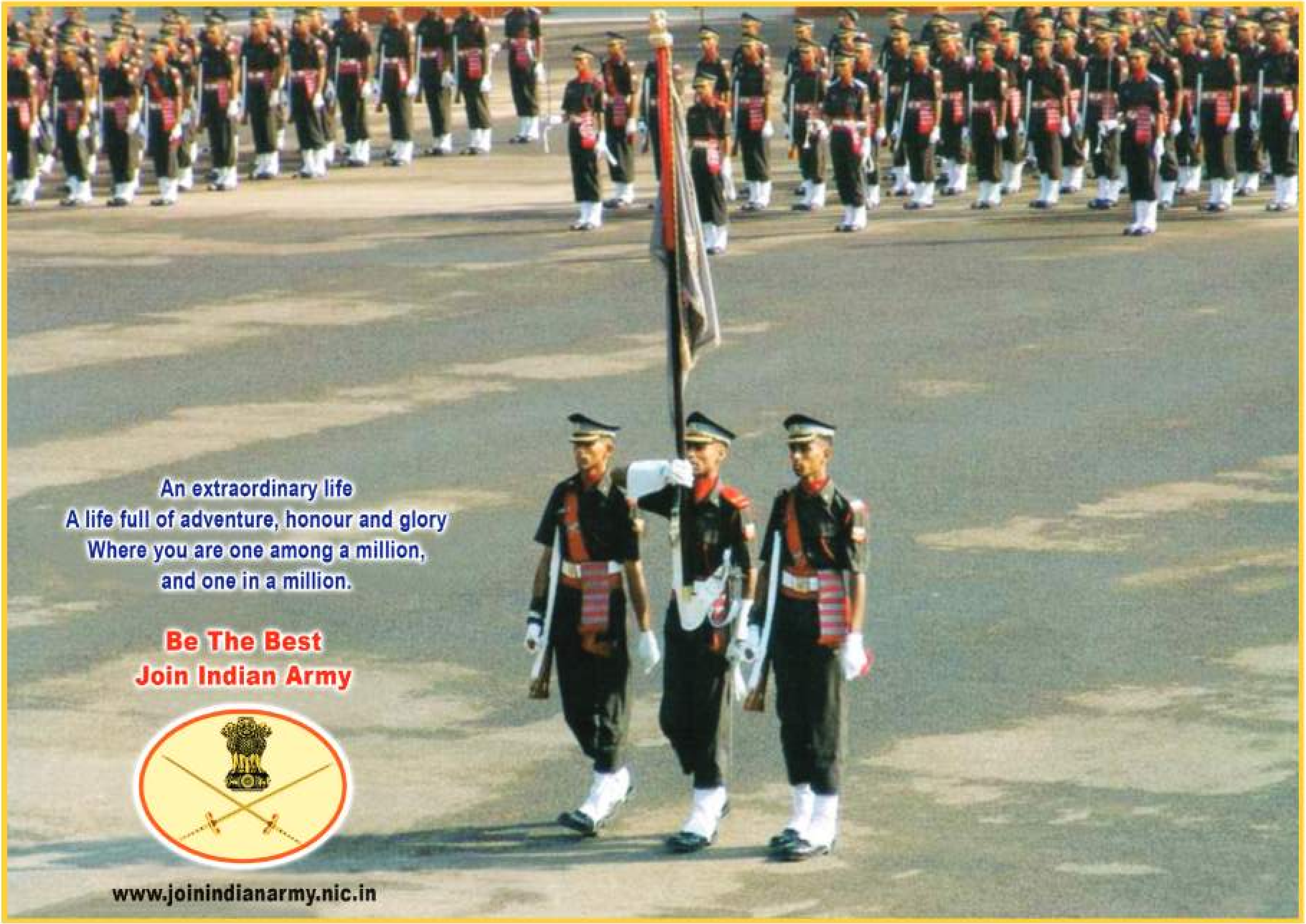

An extraordinary life
A life full of adventure, honour and glory
Where you are one among a million,
and one in a million.
Be The Best
Join Indian Army
www.joinindianarmy.nic.in

ARMS YOU FOR LIFE AND A CAREER......

INDIAN ARMY

CATEGORY	EDUCATION	AGE
(1) Soldier (General Duty) (All Arms)	SSLC/Matric 45% marks in aggregate and 32% in each subject. No % required if Higher Qualification, then only pass in matric ie. 10+2 and above.	17 1/2 - 21Yrs
(2) Soldier (Technical) (Technical Arms, Artillery)	10+2/Intermediate exam. pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English.	17 1/2 - 23 Yrs
(3) Soldier Clerk/Store Keeper Technical (All Arms)	10+2/Intermediate examination pass in any stream (Arts, Commerce, Science) with 50% marks in aggregate and min. 40% in each subject. No stipulation of marks for higher qualification.	17 1/2 - 23 Yrs
(4) Soldier Nursing Assistant (Army Medical Corps)	10+2/Intermediate exam pass in Science with Physics, Chemistry, Biology and English with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject.	17 1/2 - 23 Yrs
(5) Soldier Tradesman (All Arms)	Non Matric	17 1/2-23 Yrs
(6) Soldier (General Duty) Non Matric (All Arms)	Non Matric	17 1/2-21 Yrs
(7) Surveyor Auto Cartographer (Engineers)	BA/BSc with Maths having passed Matric & 12th (10+2) with Maths & Science	20-25 Yrs
(8) JCO (Religious Teacher) (All Arms)	Graduate in any discipline. In addition, qualification in his own religious denomination.	27-34 Yrs
(9) JCO (Catering) (Army Service Corps)	10+2, Diploma/Certificate course of a duration of one year or more in Cookery/Hotel Management and Catering technology from recognized University. AICTE recognition is not mandatory.	21-27Yrs
(10) Havildar Education	GP "X" - M.A./M.Sc. Or B.A., B.Ed/B.Sc., B.Ed. GP "Y" - B.A./B.Sc. Without B.Ed.	20-25 Yrs

Note: Dispensation in Education for enrolment as Sol (GD) is permissible to some selected States/Region/Class & Community by the Govt.
Details may be obtained from nearest ARO/ZRO.

(This data is only of informative value and subject to change.) For Details contact Recruiting staff.
Visit us at www.joinindianarmy.nic.in E-mail: recruitingdirectorate@vsnl.net

INDIAN ARMY

An extraordinary life
A life full of adventure, honour and glory
Where you are one among a million,
and one in a million.

Be The Best
Join Indian Army

www.joinindianarmy.nic.in